ISSN 2319 - 8591

পূর্ব ভারত

মানুষ ও সংস্কৃতি

PURVA BHARAT

(MANUS O SAMSKRITI)

গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ দ্বারা শংসায়িত যাণ্মাষিক পত্রিকা

বর্ষ-৬ :::: সংখ্যা-১
জুলাই, ২০২৩

প্রকাশক
ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

পূর্ব ভারত
(PURVA BHARAT)
মানুষ ও সংস্কৃতি

ISSN 2319-8591

বর্ষ : ৬ সংখ্যা : ১ জুলাই, ২০২৩

প্রকাশক

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

গভ. রেজিঃ নং - S/1L/79269(2011)

শোভাগঞ্জ, পোঃ আলিপুরদুয়ার, জেলা - আলিপুরদুয়ার

যোগাযোগের ঠিকানা

ডঃ সুলেখা পন্ডিত, পূর্বাচল, ২য় বাই লেন, কোর্ট কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড নং ১,
পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২২

ইমেল- eastindiansocietyapd@gmail.com

Website : https:\\eastindiansociety.org

দূরভাষ: - 9434630784 (সভাপতি), 7407018862 (সম্পাদক),
9434494655 (সহ সম্পাদক), 9733134588 (কর্মসমিতি সদস্য)

Copyright 2023 ©
All Rights Reserved by
East Indian Society for the Studies of Social Sciences.

The "East Indian Society for the Studies of Social Sciences" was established more than a decade ago; and its official journey was flagged off on the 5th of April, 2011, when it was registered under the societies Registration Act (West Bengal XXVI, 1961) with the Reg. No. S/1L/ 79269 (2011-2012) of the Government of West Bengal. It is a Non-Government and nonprofit organization pledged to carry on the mission of research in social sciences with India in general and Eastern-India in particular as the main theme in its objective of interdisciplinary explorations. As a part of multi-faceted social activities of the society, two biannual peer reviewed Journals namely "East Indian Journal of Social Sciences" (in English language) & "Purva Bharat" (Manus O Sanskriti) in Bengali Language with ISSN are being published regularly. Seminars and debates on significant topics are held as many times as financially possible in a year.

পূর্ব ভারত

(PURVA BHARAT)

মানুষ ও সংস্কৃতি

(ISSN 2319-8591)

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গবেষণা পত্রিকার কোন প্রবন্ধ কিংবা প্রবন্ধের কোন অংশের কোনরূপ পুনঃপ্রকাশ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রকাশক

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

গভ. রেজিঃ নং - S/1L/79269(2011)

শোভাগঞ্জ, পোঃ আলিপুরদুয়ার, জেলা - আলিপুরদুয়ার

প্রকাশ কাল ডিসেম্বর, ২০২২

©ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

প্রচ্ছদ

স্বাধীন ঝা

মূদ্রণ

বিয়ন্ড হরাইজন পাবলিকেশন

৯৪৩৪৬৩৩০০৫

সংগ্রহ মূল্য

ব্যক্তিগত (বার্ষিক) ৫০০ টাকা(ভারতীয় টাকা)

প্রতিষ্ঠান (বার্ষিক) ৮০০ টাকা(ভারতীয় টাকা)

প্রাপ্তিস্থানঃ ডঃ সুলেখা পন্ডিত, পূর্বাচল, ২য় বাই লেন, কোর্ট কমপ্লেক্স, ওয়ার্ড নং ১,
পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২২

দূরভাষ: - 9434630784(সভাপতি),7407018862(সম্পাদক),
9434494655(সহ সম্পাদক), 9733134588(কর্মসমিতি সদস্য)

ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

কার্য নির্বাহী সমিতি

সভাপতি
ডঃ সুলেখা পন্ডিত

সহ-সভাপতি
পুষ্পজিৎ সরকার

সম্পাদক
সুজয় দেবনাথ

সহকারী সম্পাদক
জয়দীপ সিং

কোষাধ্যক্ষ
অনুপ রঞ্জন দে
কৌশিক চক্রবর্তী

মুখ্য সম্পাদক
ডঃ সুলেখা পন্ডিত
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

সহযোগী সম্পাদক

স্বাধীন ঝা
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

ডঃ অখিল সরকার,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, নবদ্বীপ , নদীয়া

ডঃ সুভাষ সিং হ রায়
অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ,
চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

পরীক্ষক মণ্ডলী

প্রফেসর (ডঃ) দীপক কুমার রায়
উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ
পূর্বতন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় , পঃ বঃ

প্রফেসর (ডঃ) রূপ কুমার বর্মণ
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ডঃ) মাধবচন্দ্র অধিকারী
পূর্বতন ডিন কলা অনুষদ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ডঃ) কার্তিক চন্দ্র সুত্রধর
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ডঃ) মনোশান্ত বিশ্বাস
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সিধু কানু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ডঃ) পলাশ মণ্ডল
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সিধু কানু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ডঃ) সোমদত্তা ভট্টাচার্য
অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

প্রফেসর (ডঃ) শ্রাবণী ঘোষ
অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পঃ বঃ

সম্পাদকীয়

জুলাই-আগস্টের মেঘলা আকাশের নীচে, বৃষ্টিভেজা দিনে, সবুজ প্রকৃতির কোলে এই গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হবার কথা থাকলেও, সে বিষয়ে তৎপরতার সদিচ্ছা সাফল্য লাভ করেনি। সম্পাদনার কাজ সহজ সরল থাকে না বিভিন্ন কারণে। উপযুক্ত প্রবন্ধের প্রাপ্তি ও নির্বাচন কঠিন। যাইহোক, সবকিছুর উত্তরণ ঘটিয়ে আবার 'পূর্ব ভারত', ৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পাঠকদের হাতে। সে কারণে সম্পাদকমন্ডলীর মাননীয় সদস্যদের সাধুবাদ জানাই। বিশেষ করে স্বাধীন ঝাঁ সর্বতোভাবে সমেধাশ্রম নিয়োজিত করে পত্রিকার শেষ পান্ডুলিপি চূড়ান্ত করেছেন।

আবারও সকল আগ্রহী গবেষকদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ রইল এই পত্রিকায় লেখার বিষয়বস্তু যথাসম্ভব পূর্ব-ভারত এবং ন্যূনকল্পে ভারতকেন্দ্রিক রাখার জন্যে। আমাদের লক্ষ্য এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, মানুষ, নৃতাত্ত্বিক বিভিন্নতা, বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরা। পূর্ব ভারতের মানুষ হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের আদি ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা-কেন্দ্রিক প্রবন্ধ বেশি গুরুত্ব পাবে আগামী সংখ্যায়। অরুণাচল থেকে মেঘালয় এবং ডুয়ার্স -এই বিশাল অঞ্চল বহু জনজাতির বাসভূমি। পরবর্তী সংখ্যায় সে বিষয়ে উপযুক্ত রচনা সমাদৃত হবে। অজানিত ইতিহাস সকল সময় আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। প্রত্নপ্রমাণিত কিংবা প্রাচীন গ্রন্থ-প্রমাণিত রচনা পরিগৃহিতির পরশ পাবে। এই অঞ্চলের মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনী-কেন্দ্রিক সাহিত্য পর্যালোচনা অনুবন্ধনে থাকবে। লেখকদের স্মৃতিগর্ভে এই বিষয়গুলি সৃজনশীলতায় গতিপ্রাপ্ত হলে সমৃদ্ধ হবে পূর্ব ভারতের পরবর্তী সংখ্যা। সেই আলো বিকশিত হবার আশায় থাকবো।

সুলেখা পন্ডিত

আলিপুরদুয়ার।
১২ নভেম্বর ২০২৩

সূচীপত্র

১১
কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর
বাংলার পাল যুগ ইতিহাসে উপেক্ষিত
১৭
অভিজিৎ রায়
প্রাচীন উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক ইতিহাস
(মৌর্য যুগ থেকে পালও সেন যুগ)
৩০
রাজীব সরকার
সপ্তদশ - অষ্টাদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে
প্রকৃতি বিষয়ক চিন্তা ও চেতনার ইতিহাস
৪৮
মহুয়া বাউল
বাউল দর্শন ও তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত
৫৬
প্রশান্ত কুমার পাল
মানবতাবাদী রামমোহন ও তাঁর শিক্ষা চেতনা :
একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন
৬৮
মনোশান্ত বিশ্বাস
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়ার নারীদের অবদান
৮২
মেঘমিত্রা বিশ্বাস
বাংলার সীমানা নির্ধারণ: র‍্যাডক্লিফ কমিশন
৯৩
অহিন রায়চৌধুরী
ব্রিটিশ ভারতে বিপ্লবী জাতীয় চেতনায় বিস্মৃত এক বাঙালি বিজ্ঞানী
১০৫
কৃষ্ণ কুমার সরকার
কাকমারা জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি

১২৪
সোমদত্তা ভট্টাচার্য
লিঙ্গগত উন্নয়ন: একটি অলীক ভাবনা?
১৩২
সুদর্শনা সেন
ভারতের নারীর ওপর হিংস্রতা - মধ্যস্থতার কৌশল ও চ্যালেঞ্জ
১৪১
ইন্দ্রানী রুজ
জয়া মিত্রের 'দ্রৌপদী' : পৌরাণিক রূপকল্পের নবনির্মাণ?
১৪৯
অনিন্দ্য ভট্টাচার্য
নিজস্বী - একটি সাংস্কৃতিক নির্মাণ ও পরিবর্তনের চালিকাশক্তি
১৫৬
ঈপ্সিতা অধিকারী
সংস্কৃতি ও সিনেমা একটি লিঙ্গ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
১৬৮
সংহিতা সেন
মুর্শিদাবাদে নবাবী স্থাপত্যের গোড়াপত্তন
১৭৬
ঋতপ্রতিম মুখার্জী
পুস্তক পর্যালোচনা

বাংলার পাল যুগ ইতিহাসে উপেক্ষিত

কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একদা আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।' একজন ইতিহাসের সামান্য ছাত্র হিসেবে এবং প্রায় পঁচিশ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় আজ বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। ছাত্র জীবন থেকে শিক্ষক জীবন - দীর্ঘদিনের এই পথযাত্রায় দেখেছি অনেক চড়াই-উৎরাই, দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম, মেরুদন্ডহীন মানুষের তল্পিবাহকতা। মাঝে মাঝে এসব দেখে হতাশ হয়, কষ্ট পাই, আবার নিজেকে জাগিয়ে তুলি। জানিনা এ'পথের শেষ কোথায়। এই অন্ধকার মুছে গিয়ে কবে দেখা দেবে আলোর দিশা?

আজ আমরা অর্থাৎ বাঙালী সমাজ স্বজন-পোষণ ও দুর্নীতির জালে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছি যে, আমরা নিজেদের চিনতেই ভুলে গেছি। বাংলা তথা বাঙালীর যে একটা উজ্জ্বল অতীত ও গৌরবান্বিত ইতিহাস আছে সেটাও মনে করতে পারছি না। আর পারবোই বা কেন, বাংলার ও বাঙালীর সেই ইতিহাস ও তার গৌরবান্বিত কাহিনী নিয়েও তো সেভাবে চর্চা হয় নি। এ'জন্যই বহু আগে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন - "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখনও মানুষ হইবে না।"[১] বাংলার ইতিহাস চর্চার করুণ পরিণতি সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ঢাকার সরকারি চিত্রশালা এবং বাঙলার ও বাঙলার বাহিরের অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সাধারণত ব্যক্তিগত প্রত্নবস্তু, সংগ্রহের সহায়তায় প্রাচীন বাঙলার ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও শিল্প সম্বন্ধে আজ আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টি অনেকটা সুস্পষ্ট। ইহারা এবং এইসব প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের পথ সুগম করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও একথা সত্য ছিল যে, কি বাংলা কি ইংরাজি, কি অপর কোন ভাষায়, প্রাচীন বাঙলার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ একটা রূপ কেহ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতাম তাহার অধিকাংশই বর্ণ-ধর্মের কথা - সে বৌদ্ধই হউক বা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মই হউক - সভা শিল্প বা নগর সমাজের অভিজাত শিল্পের কথা, সংস্কৃত সভা-সাহিত্যের কথা। যে ধর্ম বর্ণাশ্রমিদের, যে শিল্প বা সাহিত্য রাজসভার বা বিত্তশালী বণিক অথবা গৃহস্থের পোষকতায় পুষ্ট ও লালিত, যে শিল্প বা সাহিত্য বর্ণাশ্রম ধর্মের, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসন, সাধন পদ্ধতি এবং লক্ষণ দ্বারা শাসিত, সেই ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের কথাই এযাবৎ আমরা পড়িয়া আসিয়াছি। লোকধর্ম, লোকশিল্প, লোক সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা বহুদিন একেবারে সজাগই ছিলাম না।"[২]

শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায়ের উপরোক্ত মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার যে প্রাচীন বাংলার

প্রকৃত ইতিহাস সঠিকভাবে চর্চা হয়নি। আর একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না, তা হলো কি প্রাচীন, কি মধ্য ও আধুনিক যুগ ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলার ইতিহাসকে অনেকটাই অবজ্ঞা করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রাচীন ও প্রাক-মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস সেভাবে তুলে ধরা হয়নি। রামশরণ শর্মার মতো ঐতিহাসিকরা প্রাক-মধ্যযুগের ইতিহাসকে অবক্ষয়ের যুগ হিসেবেই দেখিয়েছেন, যদিও অনেকেই এর বিরোধিতা করেছেন, অথচ প্রাক-মধ্যযুগেই বাংলার পাল বংশ প্রায় চারশো বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে শাসন করেছিল। পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাস শুধুমাত্র বাংলার ইতিহাস বা আঞ্চলিক ইতিহাস হিসেবেই দেখানো হয়, অথচ পাল সাম্রাজ্য ও তার সাফল্যের ইতিহাস বাংলার সীমা অতিক্রম করে উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত এমনকি দক্ষিণ ভারতেও পৌঁছে গিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পাল রাজারা বিশাল অংশ জুড়ে শাসন করেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে ঊনিশ জন পাল রাজা শাসন করেছিল।[৩] কথিত আছে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর উপযুক্ত উত্তরসূরী না থাকায় বাংলায় এক অরাজক অবস্থা দেখা দেয় যাকে ইতিহাসে 'ম্যাৎসন্যায়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই অবস্থায় গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে বসানো হয় এবং বাংলার শাসনভার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে খালিমপুর তাম্রফলকে উল্লেখ করা হয়েছে -

"ম্যাৎসেন্যায়ম অপাকিতুম প্রকৃতিবীর লকসমিয়করম
গ্রহিতা শ্রী গোপাল ইতিক্ষিতিসাসিরসম
চদামনি তৎসুভ।"[৪]

গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে বসেছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহার এবং সোমপুর মহাবিহার প্রভৃতি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন। ধর্মপাল শুধু যে বৌদ্ধধর্মেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তা নয় তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিও কোন অবহেলা করেন নি। তিনি মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের ভূমিদানও করেছিলেন। খালিমপুর তাম্রলিপিতে উল্লেখ আছে - ধর্মপাল সুভাস্থলিতে ভগবান নারায়ণের মন্দির প্রতিস্থাপনার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ধর্মপালের বোধগয়া লিপিতে ব্রাহ্মণ্য মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে -

"In the pleasant Campasiatana (Campasa temple?) a four faced Mahadeva was consecrated by the son of the sculptor Ujjvala Kesava by name, for the (spiritual) benefit of the chief Mallas dwelling at Mahabodhi. A very deep tank, sacred as the Gabges (born of the feet of Vishnu) was also excavated by him at a cost of three thousand drammas. In the 26th year of the reign of Dharmapala, the day of the son of the creator of light (Saturday), the 5th day of the waning moon of Bhadra."[৫]

আসলে পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও কোন ধর্মের প্রতি বিরাগভাজন হন নি। কোন কোন লেখক বা ঐতিহাসিক দেখানোর চেষ্টা করেছেন পাল রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের

বিরোধী ছিলেন, এর ফলে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৌদ্ধদের এক বিরোধ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন বাংলার ইতিহাসে এ ধরণের বিরোধ বা বিদ্রোহের সে রকম জোরালো কোন প্রমান পাওয়া যায় না। তাছাড়া এটা ঐতিহাসিক সত্য যে পাল যুগ পর্যন্ত, পাল সাম্রাজ্যভুক্ত প্রধান অঞ্চল বাংলার উত্তর, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অংশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সেভাবে গড়ে ওঠেনি। বাংলার ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য, জাত-পাত সৃষ্টি ও বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কারের প্রকোপ মূলত গড়ে উঠতে থাকে সেন আমল থেকেই। কাজেই একথা মানা যায় না যে পালদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে বৌদ্ধদের বা পাল রাজাদের সাথে কোন সংঘাত বা বিদ্বেষ তৈরী হয়েছিল। বরং পালরা ব্রাহ্মণদের যথাযোগ্য সম্মান করতেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি সম্মান রেখেই তারা অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছিলেন। এ বিষয়ে রমেশ চন্দ্র মজুমদার-এর গ্রন্থে উল্লেখ আছে - "Even though the influence of Buddhism steadily grew during the Pala period, development of Vaishnavism is also proved by epigraphic records. A temple (devakula) of the God Nanna Narayana is reflected to in a record of Dharmapala (B.2) while the Garuda pillar inscription at Badal (B.20) shows its contained importance during the reign of Narayanpala."[৬] "Like the Avatars in Brahmanical religion several Avatars are found in the inscriptions of the Pala period like Varaha, Narashimha, Vamana and Parsurama."[৭]

পাল রাজারা শৈব ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন অর্থাৎ তাদের রাজত্বকালে শৈব ধর্মের বিস্তার ও প্রভাব সমাজে লক্ষ্য করা যায়। ধর্মপালের রাজত্বের ২৬-তম বছরে বোধগয়ায় চতুর্মুখি শৈব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পাল রাজা নারায়ণ পালের দ্বারা ভগবান শিবের মূর্তি সহ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করার নিদর্শন রয়েছে। এই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করা হয়েছিল এবং নিত্য পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই মন্দির শৈব ধর্মের পশুপত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮] পাল রাজত্বকালে শৈব ধর্মের পাশাপাশি শাক্ত ধর্মেরও প্রভাব রয়েছিল বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে।

সমস্ত ধর্মের মধ্যে সব চাইতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পড়েছিল বেশি। শুধু বাংলা নয়, সমগ্র পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল যার অনেক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান, যদিও পরবর্তীকালের মুসলিম আক্রমণের ফলে এবং কিছুটা প্রাকৃতিক কারণে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক নিদর্শন নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে ডুয়ার্সের পাহাড়ি এলাকায় ও বক্সা পাহাড়ের সন্নিহিত অঞ্চলে, পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে, আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্মের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। গোয়ালপাড়া জেলার সূর্য পাহাড়ে ছোট ছোট স্তুপ লক্ষ্য করা যায়। এগুলো বৌদ্ধধর্মেরই নিদর্শন।[৯]

বক্সা পাহাড়ের উপর ভুটান পাহাড়ের লাগোয়া ল্যাপচাখা গ্রাম রয়েছে এবং তার সন্নিহিত আরও অনেকগুলো গ্রাম রয়েছে। এসব গ্রামের অধিকাংশ মানুষই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তারা প্রকৃতপক্ষে বহুকাল ধরে এই দুর্গম পাহাড়ে বসবাস করে আসছে। তারা ড্রুকপা সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা ভুটান বা ভারত বলে কিছু জানতো না। তারা এই

পাহাড়ি অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্রপূর্ণ অঞ্চলে যুগ থেকে যুগান্তর ধরে বসবাস করে আসছে। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে তাদের সঙ্গে ভুটানিদের হুবুহু মিল রয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় বর্তমানে রাজনৈতিক কারণে ভারত ভুটান সীমারেখা দ্বারা আলাদা করা হলেও তাদের মধ্যে মানসিক, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভুটান বা ভারতীয় বলে কোন প্রভেদ নেই।[১০] ল্যাপচাখার সন্নিহিত আর একটি গ্রাম টাসিগাঁ - এখানকার বেশিরভাগ মানুষও ড্রুকপা সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এখানে একটি বৌদ্ধ মঠ রয়েছে।[১১] এখানকার মানুষ খুব সহজ সরল। তারা বৌদ্ধ ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং অন্তর থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে শ্রদ্ধা করেন। বর্তমান লাভাতেও একটি বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ রয়েছে। নিয়মিত বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা হয়। একটি বৌদ্ধ স্কুল এবং আবাসিক রয়েছে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মের নীতি ও আদর্শ সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

এসব নিদর্শন থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে এই অঞ্চলে বহুকাল আগে থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটেছিলো। পাল রাজত্বেরও বহু আগে অশোকের সময়ে এসব অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিলো, কারণ একথা সুবিদিত যে, মৌর্য যুগে উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। মৌর্যদের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে পালদের হাত ধরে বৌদ্ধ ধর্মের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ইতিহাসে পাল যুগ এক ঐতিহ্যমন্ডিত। কারণ পালদের দীর্ঘ চারশো বছরের শাসনে যেমন ধর্মীয় সমন্বয় ও সংহতি তৈরী হয়েছিল, তেমনি বৌদ্ধধর্মের অহিংসা নীতির ফলে সমাজে শান্তি বিরাজমান ছিল যার ঐতিহ্য আমরা এখনও উত্তরবঙ্গের মাটিতে লক্ষ্য করি। পালরা ভারতের নানা প্রান্তে বহু বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন রেখে গেছেন। তার মধ্যে রয়েছে বহু শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, বিহার, স্তুপ এবং বৌদ্ধ মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়, যা ছিল জ্ঞান চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। পাল সম্রাট ধর্মপাল মগধে বিক্রমশীলা মঠ তৈরী করেছিলেন, যা বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় নামেও পরিচিত। তিনি এধরণের প্রায় পঞ্চাশটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এন. কে. সেনগুপ্ত লিখেছেন -

"Devapala was an ardent Buddhist. The temple of Sri Traikutaka, which latter on came to be known as the new Sompuri Vihara of which the ruins have been found at Paharpur was restored by Devapala. According to Taranatha, a lot of Buddhist monks were after Devapala. According to an inscription in Nalanda University, King Balaputradeva of Sailendra dynasty ruling in present day Indonesia and Malaysia, sent an ambassador to the court of Devapala with a request of granting five villages for the maintenance of a monastery built by him at Nalanda. Emperor Devapala appointed Veeradeva, an established and learned Brahman and Buddhist as the head of the Nalanda University, and was a patron and preserver of the famous Nalanda University, according to the Ghosravan inscription.[১২]

শুধু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনই নয়, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত মানের পঠন-পাঠন,

গবেষণা ও বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য ছাড়াও দর্শন শাস্ত্রে বিখ্যাত ছিল এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। যার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গবেষক, ছাত্র, পর্যটক ও জ্ঞান পিপাসু মানুষ এখানে ছুটে আসতো জ্ঞান লাভ করার জন্য। অতীশ দীপঙ্কর ও শিলভদ্রের মতো মহা জ্ঞানী পন্ডিত গণ, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তারা সারা পৃথিবীতে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। তিব্বতের রাজা অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে পাঠানোর জন্য বাংলার রাজার কাছে বিনীত নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু প্রথমে এই নিবেদন গ্রাহ্য না হলেও পরবর্তীকালে অতীশ দীপঙ্করকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এই মহান পন্ডিত তিব্বতে যান এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের কাজে সহায়তা করেন। আজ তিব্বতে যে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়, তার অনেকটা জুড়েই রয়েছে অতীশ দীপঙ্করের অবদান।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, যদিও পাল যুগকে শুধুমাত্র বাংলার ইতিহাস বলে চিহ্নিত করা হয়, কিন্তু পাল রাজাদের ইতিহাস শুধুমাত্র বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাল যুগের খ্যাতি ও অবদান সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ছিল। এমনকি অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তাদের অবদান বাইরের দেশেও পড়েছিল। বাংলা ও বাঙালীর এ এক গর্বের অধ্যায়, যা ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অনেকটাই উপেক্ষিত।

সূত্র নির্দেশ:

১. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪।

২. নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃ. ৪।

৩. Khalimpur Plate inscription was issued by Dharmapala I, successor of Gopala I found in Bengal.

৪. Saksham Jain, The Pala Empire**:** An Imperial Dynasty, A History and Analysis of Empire, International Journal of Integrated Studies and Research, Vol-I, Issue-4, p. 36.

৫. Nilmani Chakravatti, Pala Inscription in the Indian Museum, Journal and the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. IV, 1908, p. 102.

৬. Ramesh Chandra Majumdar (Ed.), History of Ancient Bengal, 1st Published in 1971 by G. K. Mukherjee for G. K. Bharadwaj, and Co., Calcutta, p. 511.

৭. ঐ।

৮. ঐ।

৯. ক্ষেত্র সমীক্ষা, সূর্য পাহাড়, গোয়ালপাড়া, আসাম।

১০. ক্ষেত্র সমীক্ষা, ল্যাপচা খা, বক্সা, আলিপুরদুয়ার।

১১. ক্ষেত্র সমীক্ষা, টাসিগাঁও, বক্সা, আলিপুরদুয়ার।

১২. N. K. Sengupta, Land of Two Rivers: A History of Bengal from the Mahabharata to Mujib, New Delhi, Penguin Books, 2011.

প্রাচীন উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক ইতিহাস (মৌর্য যুগ থেকে পালও সেন যুগ)

অভিজিৎ রায়
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সার সংক্ষেপ

ভারতবর্ষ একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। আর এই বৈচিত্র্যময় দেশের সকল বৈশিষ্ট্য গুলির অধিকারী প্রাচীন উত্তরবঙ্গ। এই বৈশিষ্ট্য গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল তার অর্থনৈতিক অবস্থা। অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করতে গেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শহর, নগর, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা। কারন এগুলির মিলিত রূপই পূর্ণতা দেয় সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে , গতিশীল হয় অর্থনীতি, সম্প্রসারিত হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং এর প্রভাব অবশ্যই এসে পড়ে সমাজ তথা সর্বস্তরের মানব জীবনের ওপর। ইতিহাসের সূচনাকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে, সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি তথা সভ্যতার বিকাশ ও সম্প্রসারনে মূল মেরুদন্ড হিসেবে কাজ করেছিল সেই সভ্যতার অর্থনীতি। সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত লক্ষ্য করলে খুব সহজেই অনুমেয় সভ্যতার বিকাশ বা মানব জীবনের সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক কতটা নিবিড়। বর্তমান বা আধুনিক কালে এই অর্থনৈতিক সম্পর্কটি হয়তো আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে- তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাস আলোচনা করার ক্ষেত্রে যেহেতু স্থান, কাল, পাত্র এর ভিত্তিতে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক, তাই এই প্রবন্ধ রচনা বা ক্ষুদ্র আকারে গবেষণা পত্রে স্থান হিসেবে উত্তরবঙ্গ ও কাল হিসেবে প্রাচীন যুগ কে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আর বিষয় বস্তু হিসেবে প্রাচীন উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা কে তুলে আনার সামান্য প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১

প্রাচীন কালে যে উত্তরবঙ্গ তথা বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা জানা যায় তা সর্বজনবিদিত। প্রাচীন কালে অর্থনীতির প্রধান দুই মেরুদন্ড ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাঙলার ঐতিহ্য আজ গল্প কথার মতো মনে হয়। একসময় কৃষি প্রধান বাংলার কৃষি, কারু ও ক্ষুদ্র শিল্প ছিল গৌরবময়। বাঙলায় পর্যাপ্ত কৃষি উদ্বৃত্ত ও অভ্যন্তরীণ বানিজ্যই গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছিল বিদেশের সাথে ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পিছনে বাংলার বনিক শ্রেণীর প্রচেষ্টা ও প্রয়াস ছিল উল্লেখ যোগ্য। কাব্য ও কাহিনীতে ময়ূরপঙ্খী, সপ্তডিঙ্গা প্রভৃতির উল্লেখ বাংলার বনিক শ্রেণীর উপস্থিতি প্রমান করে। প্রাচীন কালে নানা ধরনের শিলালিপি ও লেখমালা এবং মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্য গুলো থেকে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলার ব্যাপক ব্যবসা বাণিজ্য ও বনিক শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অবিভক্ত বাংলার উত্তরাঞ্চলেও এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও বনিক

শ্রেণীর যে ব্যবসায়ী উদ্যোগ ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[১] এর থেকে একটা বিষয় পরিস্কার যে, প্রাচীন কালে বাংলা তথা উত্তরবঙ্গ বলে বর্তমানে কথিত যে অঞ্চল তা কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল বলেই পরিচিত ছিল। আর বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বলে পরিচিত অঞ্চলটি প্রাচীন কালে পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, গৌড় ইত্যাদি অঞ্চল গুলিকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল। আরো পরিস্কার করে বললে বলতে হয় এই অঞ্চল গুলি বাংলারই অংশ বিশেষ। এই অঞ্চল গুলি প্রাচীন কালে বাংলার উৎকৃষ্ট শহর নগর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এবং বাংলার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করেছিল।

প্রাচীন উত্তরবঙ্গের প্রধান নগর শহর হিসেবে পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী, গৌড় ইত্যাদির খ্যাতি সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন উত্তরবঙ্গের এই শহর নগর গুলির গুরুত্ব বা অর্থনীতিতে এদের অবদান আলোচনার পূর্বে এই নগর গুলির অবস্থান সম্পর্কেও ধারণা নেওয়া প্রয়োজন। পুন্ড্র জনদের সর্ব প্রাচীন উল্লেখ ঐতেরেয় ব্রাহ্মনে এবং তারপরে বোধায়ন "ধর্ম সূত্রে"। ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুন্ড্র পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পুন্ড্র বর্ধনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং গুপ্ত রাষ্ট্রের একটি প্রধান ভুক্তিতে পরিনত হয়েছে। কোটিবর্ষ পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগর। তদানীন্তন পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি অন্তত বগুড়া- দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি সমস্ত উত্তরবঙ্গই বোধহয় ছিল পুন্ড্রবর্ধনের অধীন, একেবারে রাজমহল- গঙ্গা-ভাগীরথী তীর থেকে আরম্ভ করে করতোয়া পর্যন্ত। পুন্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র বা হৃদয় স্থানের একটি নতুন নাম পাওয়া যায় দশম শতক থেকে, এর নাম বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী । কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রীকে পাল রাজাদের জনকভু অর্থাৎ পিতৃভূমি বলে ইঙ্গিত করেছেন এবং গঙ্গা- করতোয়ার মধ্যে এর অবস্থান নির্দেশ করেছেন। সেন রাজাদের পট্টলীগুলিতে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত স্থান গুলির অবস্থিতি থেকে এ অনুমান নিঃসংশয়ে করা যায় যে, বর্তমান বগুড়া জেলা- দিনাজপুর জেলা ও রাজশাহী জেলা এবং হয়তো পাবনাও প্রাচীন বরেন্দ্রীর বর্তমান প্রতিনিধি। বরেন্দ্রীর অবস্থান ছিল উত্তরবঙ্গের কেন্দ্র স্থলে।[২] গৌড়পুর নামক একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় পানিনি সূত্রে, কিন্তু এই গৌড়পুর বর্তমান বঙ্গদেশের কোন স্থান কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। এ নিয়ে বিতর্ক আছে। প্রাচীন সাহিত্যে গৌড়ের উল্লেখ সুপ্রচুর। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের কোন কোন জৈন গ্রন্থে জানা যায়, বর্তমান মালদহ জেলার প্রাচীন লক্ষণাবতী গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের ইঙ্গিতেও তাই, বস্তুত লক্ষনাবতী নগরকেই তারা বলেছেন গৌড় এবং এই গৌড় রাঢ় দেশ । প্রাচীন ও মধ্য যুগের নানা উল্লেখ ও বিবরণের মধ্যে গৌড় জনপদের সঠিক অবস্থিতি সুস্পষ্ট জানা যায় না, শুধু এটুকুই বোঝা যায় মুর্শিদাবাদ- বীরভূমই এই জনপদের আদি কেন্দ্র ; পরে মালদহ এবং বোধহয় বর্ধমান ও এই জনপদের সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানের এই কয়টি জেলা নিয়ে প্রাচীন গৌড়।[৩]

বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে শহর নগরের সৃষ্টি হয়েছে, ইতিহাসে তা প্রমাণিত। উদাহরন হিসেবে সিন্ধু সভ্যতার কথাই বলা যায়। ঠিক তেমনি প্রাচীন কালে সমৃদ্ধ বাণিজ্য, শিল্প বা কৃষিকে কেন্দ্র করেও বাংলা তথা উত্তরবঙ্গের পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র বা গৌড় এর মতো নগরগুলির বিকাশ ঘটেছিল। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রাচীন নগর গুলির

অবদান অনস্বীকার্য। প্রাচীন কালে পুন্ড্রবর্ধন -এর সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রমান পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত পুন্ড্রবর্ধনের সঙ্গে বিদেশের বিশেষ করে রোম, পারস্য, আরব ও সিংহল দেশের বাণিজ্যের কথা জানা যায়, একই সঙ্গে পুন্ড্র দেশে সেই সময় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেরও যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটেছিল।[৪] অজ্ঞাত গ্রীক নাবিকের লেখা পেরিপ্লাস অব দি এ্যরিথারিয়ন সি গ্রন্থে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং হয়ে সিকিম ও চুম্বি উপত্যকার মধ্য দিয়ে তিব্বত ও চীন পর্যন্ত বাণিজ্যিক পথের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] তবে কোনো একটি কারণের জন্য প্রাচীন বাংলার নগর গুলি গড়ে ওঠেনি। প্রাচীন বাংলার নগর গুলি গড়ে উঠেছিল নানা প্রয়োজনে, কোথাও একটি মাত্র প্রয়োজনের তাড়নায়, কোথাও একাধিক প্রয়োজনে। ঠিক একই ভাবে বলা যায়, পুন্ড্রবর্ধনের মত নগর একটি মাত্র প্রয়োজনে গড়ে উঠেনি। বিভিন্ন সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে করতোয়া তীরবর্তী এই নগর প্রখ্যাত একটি তীর্থ ছিল। দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই নগর বৃহৎ এক রাজ্য ও জনপদ বিভাগের রাজধানী ও প্রধান শাসন কেন্দ্র ছিল। তৃতীয়ত, এই নগর সর্বভারতীয় এবং আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, একাধিক স্থল পথ এবং প্রশস্ত করতোয়ার জলপথ এই কেন্দ্রে মিলিত হয়।[৬]

প্রাচীন উত্তরবঙ্গের পুন্ড্রবর্ধনের ন্যায় উত্তরবঙ্গের দক্ষিণতম প্রান্তের উল্লেখযোগ্য নগর ছিল গৌড়। শুধু তাই নয় উত্তরবঙ্গের দক্ষিণতম প্রান্ত গৌড়ীয় অঞ্চল প্রাকৃতিক কারণেই একটি নগর রাষ্ট্রের রাজধানী হয়ে ওঠার উপযুক্ত ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে এখানে গড়ে ওঠা উন্নত নগরের। কিন্তু সে নগর বাণিজ্যিক কারণে বা স্থানীয় রাজধানী রূপে গড়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে নির্ভর যোগ্য অনুমান করাই কঠিন।[৭] উত্তর বৈদিক ও পৌরানিক যুগে গৌড় যথেষ্ট পরিচিত নগর। প্রাক মৌর্য যুগে স্বখ্যাত অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হয়- কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই নগর রাজধানীর উল্লেখ থেকে। পানিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এই নগরের উল্লেখ আছে। বাৎসায়নও একে একটি পরিশীলিত নাগরিকদের নগর রূপে সুখ্যাতি করেছেন।[৮] অর্থাৎ একথা ইতিহাসে প্রমাণিত যে, প্রাচীন কালে বর্তমান উত্তরবঙ্গে গৌড় নগরের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে এই গৌড় নগরের এতো সুনাম বা ঐতিহ্যের পশ্চাতে বিশেষ কি কারন ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কোন একটি নির্দিষ্ট কারনে কোন নগরের সৃষ্টি হয় না। গৌড় এর ক্ষেত্রেও একথা একই ভাবে প্রযোজ্য। গৌড় এর প্রাকৃতিক সুবিধা গুলি ও তার অবস্থান গত দিকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১. নদীপথে উন্নত ও দীর্ঘ প্রসারী যোগাযোগ ব্যাবস্থা, ২. বাণিজ্যিক সুবিধা- নদীবন্দর ও জলপথের সুযোগ, ৩. পশ্চিমে বিশাল নদী ও রাজমহল পর্বত মালার প্রকৃতিদত্ত প্রতিরক্ষা ব্যুহ, যে দিক থেকেই শুধু রাজনৈতিক ও সামরিক বিপদের আশঙ্কা ছিল সেকালে, ৪. সমগ্র বঙ্গ তথা উৎকল ও মগধাদিসহ মূল ভূখণ্ডের মধ্য বিন্দু রূপে- রাষ্ট্র শক্তির যোগ্য শাসন কেন্দ্র হতে গৌড়ের অগ্রাধিকার।[৯] আলোচনার বিষয় বস্তু যেহেতু প্রাচীন উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা, অর্থাৎ বাণিজ্যগত কারণের জন্য প্রাচীন নগরী গৌড় এর উৎপত্তি একথা ইতিহাস সত্য। স্থল ও জলপথে এখান থেকে নানা বাণিজ্যপণ্য বাংলার অন্যান্য স্থানে বিশেষত তাম্রলিপ্ত বন্দর ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানি করা হতো। অর্থাৎ বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে নগরের উত্থান ঘটেছিল এবং

সেই নগরকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য আরো বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল - উভয়ই উভয়ের কাছে ঋণী।

২

প্রাচীন উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করতে হলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কৃষি বা কৃষি কাজ সম্পর্কীত বিভিন্ন বিষয় গুলি চলে আসে। কারন কোন নগর রাষ্ট্র বা দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডের স্তম্ভ সরূপ শিল্প- বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তার সূচনা কিন্তু কৃষিকে কেন্দ্র করেই হয়। কৃষিজাত পণ্য বা অর্থকারী ফসল গুলিকে নিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে এবং শিল্পের যাবতীয় কাঁচামাল এর যোগান দেয় কৃষাকরাই। প্রাচীন কালেও অর্থনীতির এই বিস্তৃতির কোন ব্যাতিক্রম ঘটেনি। আর বর্তমান কালেও না। ভারতীয় উপমহাদেশে ধান চাষের প্রাচীনতম প্রত্নসাক্ষ্য পাওয়া গেছে উত্তর প্রদেশের পূর্ব প্রান্তস্ত কোলডিহা নামক স্থান থেকে। রেডিও কার্বন নিরূপিত তার সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে খৃ: পূর্ব ৪৮০০ সাল। পূর্ব ভারত থেকেই ধানের চাষ ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১০] অর্থাৎ একথা প্রমাণিত যে, সুদূর প্রাচীন কালেই ধান চাষের সূচনা ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষি কাজের সূচনা ঘটিয়েছিল। আর সেই সাক্ষ্য দ্বারা প্রমান করা যায় যে, প্রাচীন বঙ্গদেশে অর্থাৎ প্রাচীন উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কৃষিকাজের সূচনা ঘটেছিল প্রাচীন কালেই। আরো স্পষ্ট করে বললে বলা যায় যে, প্রাচীন উত্তরবঙ্গে যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছিল তা উন্নত কৃষি ব্যাবস্থা ছাড়া কি কখনো সম্ভব ছিল? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষি বা কৃষিজ পণ্য গুলিকে অবলম্বন করেই বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। আর প্রাচীন উত্তরবঙ্গেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বঙ্গদেশ চিরকালই কৃষি প্রধান দেশ। এখানকার বেশির ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে এবং চাষবাসের মাধ্যমেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। বঙ্গদেশ তথা প্রাচীন উত্তরবঙ্গের প্রধান শস্য হল ধান। প্রাচীন উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই প্রায় ভালো ধানের চাষ হতো। তাছাড়া এখানে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হত। ফলে চিনি বিদেশে রপ্তানি হতো। কেউ কেউ মনে করেন অধিক পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হতো বলে এদেশের নাম গৌড় হয়েছে। অন্যান্য শষ্যের মধ্যে সরিষা, আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।[১১] প্রাচীন উত্তরবঙ্গ এই অগ্রণী কৃষি কাজের জন্যই অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশ সচ্ছল ছিল বলা যায়। কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত কৃষি জমি পরিমাপ করার বিষয়টিও প্রাচীন উত্তরবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে চিহ্নিত। প্রাচীন কালে জমি মাপ করার জন্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের নল ব্যবহার করা হতো। গুপ্ত যুগের জমির পরিমাপ সূচক কূল্যবাপ ও দ্রোনবাপ এই দুইটি সংজ্ঞা ব্যবহার করা হতো। কূল্যবাপ শব্দটি কুলা অর্থাৎ কুল্য হতে উৎপন্ন এবং এক কুলা বীজ দ্বারা যতটুকু জমি বপন করা যায় সম্ভবত তাকে কূল্যবাপ বলা হতো। এই মাপের আট ভাগের এক ভাগকে দ্রোনবাপ বলা হতো। কিন্তু এদের কোনটির মাপ কি তা সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়। এটা ছাড়াও " সমতটিয় নল" এবং " বৃষভ শঙ্কর" নলের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমটি সম্ভবত সমতট প্রদেশ এবং দ্বিতীয়টি সম্ভবত বৃষভ শঙ্কর উপাধিকারী সেন সম্রাট বিজয় সেনের নাম থেকে উদ্ভুত। কিন্তু এদের কোনটি কি পরিমানের মাপ ছিল তা জানা যায় না।[১২] তবে প্রাচীন উত্তরবঙ্গে জমি

পরিমাপ করার যে প্রথা প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

"বরেন্দ্র" থেকেই "বারিন্দ" কথাটি এসেছে। প্রাচীন উত্তরবঙ্গের এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে এই বরেন্দ্র অঞ্চলের অবস্থান ছিল। প্রধানত দিনাজপুর, মালদা, রাজশাহী ও বগুড়ার বিস্তৃত জায়গা জুড়ে এর পরিধি ছিল। প্রাচীন কাল থেকেই এই বরেন্দ্র বা বারিন্দ অঞ্চল উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে এক ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চল কৃষি ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নত ছিল, কারন এখানকার মাটি ছিল উর্বর। অবশ্য কোথাও কোথাও অনুর্বর জমিও ছিল। যেমন মালদা জেলার মহানন্দা নদীর পূর্বে অবস্থিত, যেটি বারিন্দ অঞ্চল বলে পরিচিত সেখানকার লাল মাটি ছিল কৃষি কাজের পক্ষে অনুপযোগী।[১৩] তার মানে এই নয় যে, সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলটি কৃষি কাজের পক্ষে অনুপযোগী ছিল। কিছু ক্ষেত্র বাদ দিলে পরে বাকি সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলটি ছিল যথেষ্ট উর্বর, কৃষি কাজের জন্য উপযুক্ত। এছাড়া কৃষি কাজের জন্য যে উপযুক্ত সেচ বা জলের প্রয়োজন ছিল তার চাহিদা মিটিয়ে ছিল প্রাচীন উত্তরবঙ্গের নদী গুলি। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রাজা রামপাল বরেন্দ্র অঞ্চলে এক বিশাল দীঘি খনন করে জল সেচের বন্দোবস্ত করেছিলেন।[১৪] অর্থাৎ একথাও বলা যায় , প্রাচীন কালে কৃষির উন্নতির জন্য রাজা নানা কল্যাণকর ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যা কৃষকদের কৃষি কাজে ব্যাপকভাবে উৎসাহ জুগিয়েছিল। স্থল ও জলপথ দ্বারা কৃষি পণ্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরবরাহ করা এমনকি কৃষি বাণিজ্যের জন্য উপযুক্ত মাধ্যমও কৃষকদের কৃষিকাজে উৎসাহ প্রদান করেছিল।

৩

বঙ্গদেশ তথা প্রাচীন উত্তরবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থা যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাপক কৃষি উৎপাদন কৃষি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করেছিল। এই উদ্বৃত্ত কৃষিকে অবলম্বন করে ব্যবসা- বাণিজ্যের সূচনা ঘটেছিল, সৃষ্টি হয়েছিল ধনী ব্যাবসায়ী শ্রেণীর, বনিক শ্রেণীর, মহাজন শ্রেণী প্রমুখের। বাংলার পর্যাপ্ত কৃষি উদ্বৃত্ত ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যই গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছিল বিদেশের সাথে ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। প্রাচীন কালে পুন্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) - এর সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রমান পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত পুন্ড্রবর্ধনের সঙ্গে বিদেশের বিশেষ করে রোম, পারস্য, আরব ও সিংহল দেশের বাণিজ্যের কথা জানা যায়, একই সঙ্গে পুন্ড্র দেশে সেই সময়ে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেরও যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটেছিল। অজ্ঞাত গ্রীক নাবিকের লেখা পেরিপ্লাস- অব- দি- এ্যরিথারিয়ান সি গ্রন্থে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং হয়ে সিকিম ও চুম্বি উপত্যকার মধ্য দিয়ে তিব্বত ও চিন পর্যন্ত বাণিজ্যিক পথের উল্লেখ আছে। অভ্যন্তরীণ এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুন্ড্র দেশ তথা উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য স্থানীয় ছোট ছোট হাট- বন্দর ও গঞ্জ। উত্তরবঙ্গের বহু অঞ্চলের সাথে গঞ্জ শব্দটি যুক্ত আছে। নামের সঙ্গে গঞ্জ উপসর্গ থেকে এ কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের এই স্থান গুলির একসময় ব্যাপক বাণিজ্যিক প্রসিদ্ধি ছিল।[১৫]

প্রাচীন উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধশালী নগর শহর (পুন্ড্রবর্ধন, গৌড়, বরেন্দ্র) গুলির ভৌগোলিক অবস্থান পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। একটু সুক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে খুব

সহজেই বোঝা যাবে যে, উত্তরবঙ্গের এই প্রাচীন নগর গুলি সৃষ্টির পশ্চাতে বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সমৃদ্ধ বাণিজ্য ও বাণিজ্যের বিস্তৃতির জন্য যা যা উপাদান প্রয়োজন, কম বেশি প্রায় সব উপাদানই এই নগর গুলিতে ছিল। সমসাময়িক সাক্ষ্যে দেখা যায়, যে প্রয়োজনেই নগর গুলি গড়ে উঠুক না কেন, কমবেশি ব্যাবসা- বাণিজ্যের প্রেরণা সর্বত্রই ছিল বলে মনে হয়। বস্তুত প্রাচীন বাংলার নগর গুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রায় প্রত্যেকটি নগরই প্রশস্ত ও প্রচলিত স্থল ও জলপথের উপর বা সংযোগ কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল।[১৬] আবার এই ব্যবসা- বাণিজ্য আশ্রয় করে বহু সংখ্যক শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ , কুলিক নগরেই বাস করতেন , অষ্টম শতক পূর্ব লিপি গুলিতে এমন প্রমান প্রচুর পাওয়া যায়। এদের নিগম কেন্দ্র গুলিও নগরে। তাছাড়া শিল্প- ব্যাবসা- বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কয়েকটি রাজপদের উল্লেখ্যও লিপি গুলিতে দেখা যায়, এই পদ গুলি এবং নগর শাসন সংক্রান্ত কয়েকটি রাজকীয় পদ (যেমন- পুরপাল, পুরিপালো পরিক) রাজধানী, ভুক্তি অথবা বিষয়ের রাষ্ট্র যন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরা সকলেই যে নগরবাসী , এ সমন্ধে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। দেওপাড়া লিপির "বরেন্দ্রক শিল্পী গোষ্ঠী চূড়ামনি" রানক শূলপানিও নাগরিক। [১৭] অর্থাৎ এটা পরিস্কার যে, বাণিজ্য কে কেন্দ্র করে নগরের সৃষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং নগরকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য নাগরিক বৈশিষ্ট্য গুলি উৎকর্ষ লাভ করেছিল। আধুনিক নগরের যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন পদ, অত্যাধুনিক পরিকল্পনা, শাসন প্রণালী, অর্থনীতি ইত্যাদি বিকশিত হয়েছিল সমৃদ্ধ শিল্প, বাণিজ্যের জন্যই। আর এক্ষেত্রে প্রাচীন উত্তরবঙ্গের নগর গুলির অবদান অনস্বীকার্য।

প্রাচীন উত্তরবঙ্গ তথা বঙ্গদেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদির কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় বস্ত্র শিল্পের কথা। বঙ্গদেশের বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি খ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্বেই দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং এটাই যে দেশের প্রধান শিল্প ছিল, তার প্রমান পাওয়া যায় কৌটিলের অর্থশাস্ত্রে, Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থে, আরব, চীন ও ইতালীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তের মধ্যে। [১৮] বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, নিহার রঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পুন্ড্র দেশের (পৌন্ড্রক) দুকুল শ্যামবর্ণ এবং দেখিতে মনির মত পেলব, সুবর্ন কুজু দেশের (কামরূপ) দুকূলের রং নবোদিত সূর্য্যের মতন। টিকাকার যোজনা করিতেছেন, দুকুল বস্ত্র খুব সুক্ষ্ম, খৌম বস্ত্র একটু মোটা। পুন্ড্র দেশে যে শুধু দুকুল ও পত্রোর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হইত তাহাই নয়, মোটা খৌম বস্ত্রও উৎপন্ন হইত। কৌটিল্য সেকথাও বলিতেছেন।[১৯] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে খৌম, দুকুল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক এই চার প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। খৌম শনের সুতায় প্রস্তুত মোটা কাপড়। কাশী ও উত্তরবঙ্গে এটি তৈরি হতো। পুন্ড্র দেশীয় দুকুল শ্যাম ও মনির ন্যায় স্নিগ্ধ। পত্রোর্ণ রেশমের ন্যায় একজাতীয় কীটের লালায় তৈরি। মগধ ও উত্তরবঙ্গে এই জাতীয় বস্ত্র তৈরি হতো। কার্পাসিক অর্থাৎ কার্পাস তুলার কাপড়ের জন্য উত্তরবঙ্গ তথা বঙ্গদেশ চিরকাল প্রসিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ খুব প্রাচীন কালে বঙ্গের বস্ত্র শিল্প খুব উন্নতি লাভ করেছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বঙ্গদেশ থেকে প্রচুর পরিমানে সূক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হতো। বঙ্গদেশের মসলিন যে সমগ্র জগৎ

বিখ্যাত ছিল তারও উদ্ভব প্রাচীন যুগে হয়েছিল।[২০] আবার বস্ত্র শিল্পের জন্য যে রেশম কীটের প্রয়োজন তাও প্রাচীন উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে মিহির গোস্বামী বলেছেন - " পুন্ড্র শব্দের অর্থ রেশমকীট । রেশমকীট পালন বা ওই কাজে নিযুক্ত মানুষকেই পুন্ডরীক বলা হতো। পুন্ডরীক জাতীয় লোকেরাই খ্রিস্ট জন্মের বহু শতাব্দী আগে থেকেই মালদা জেলার ভূখণ্ডে রেশম উৎপাদন করতো। প্রকৃতিক সম্পদ তুতবনের পাতা ছিল তখনও এই রেশম কীটের খাদ্য। পুন্ডরীকগণ মালদহের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে রেশম শিল্পের উন্নতি ঘটায়।" [২১]

বস্ত্র শিল্পের পরেই উল্লেখ করতে হয় চিনি, লবন ও মৎসের কথা। বঙ্গদেশে চিনি মারফত প্রচুর অর্থাগম হতো বলে মনে করা হয়। পৌন্ড্রক ইক্ষু হতে যে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হয় এ কথা সুশ্রুত বহুদিন আগেই বলেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গদেশ তথা প্রাচীন গৌড় এ প্রচুর পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হতো বলে এর নাম গৌড় হয়েছে। অর্থাৎ ইক্ষুর উৎপাদন প্রাচীন উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে একটি নতুন রূপ দিয়েছিল। প্রাচীন উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির আর একটি স্তম্ভ ছিল কারু শিল্প, লৌহ শিল্প ইত্যাদি। সোনা, রুপা, মনি, হীরা ও বিচিত্র দ্যুতিময় প্রস্তর সজ্জিত নানা অলংকার বিত্তশালী সমাজে ব্যবহৃত হতো। এর ফলে কারু শিল্পীদের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। প্রাচীন উত্তরবঙ্গের লৌহ শিল্পও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। কর্মকার দের অবস্থাও ছিল বেশ সচ্ছল । কৃষিকাজের বিস্তৃতি লৌহ শিল্প কে নতুন দিশা দেখিয়েছিল । বঙ্গদেশে দুমুখো খুব ধারালো তলোয়ার তৈরি হতো। অগ্নিপুরণের মতে অঙ্গ ও বঙ্গদেশ তলোয়ার এর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, বঙ্গদেশীয় তলোয়ার নাকি ছিল খুব শক্ত ও ধারালো।[২২] প্রাচীন উত্তরবঙ্গে তৎকালীন সময়ে আধুনিক কালের ন্যায় বৃহৎ শিল্প গড়ে না উঠলেও, বঙ্গদেশে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে বস্ত্রবয়ন , চিনি, কারু শিল্প, লৌহ শিল্প ইত্যাদি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। শিল্প হিসেবে এগুলির সুনাম বঙ্গদেশের সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, এর প্রমাণ লিপি, বিভিন্ন গ্রন্থাদি, পর্যটকদের বিবরনে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ প্রাচীন উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পও একটি ভারসাম্য তৈরি করেছিল।

অর্থনীতি তথা কৃষি, শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এর বিনিময় ব্যবস্থা বা বিনিময় মাধ্যম। প্রাচীন উত্তরবঙ্গের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও এই বিনিময় ব্যাবস্থা ছিল অর্থনীতির একটি প্রধান অংশ বিশেষ। প্রাচীন উত্তরবঙ্গের ব্যবসা বানিজ্যে মুদ্রা বা কড়ির ভূমিকা নিয়ে পন্ডিত মহলে নানা মতামত প্রচলিত আছে । তবে মুদ্রা হিসেবে ধাতুর প্রচলন অর্থনৈতিক সভ্যতার ক্ষেত্রে একটি বিরাট প্রদক্ষেপ। বঙ্গদেশে এর প্রচলন কবে হয়েছিল তা সঠিক ভাবে বলা মুশকিল। অনুমিত যে খ্রিস্টের জন্মের চার বা পাঁচশত বৎসর পূর্বেই বঙ্গদেশে মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। ভারতবর্ষে সর্বপ্রাচীন চিহ্নযুক্ত মুদ্রা (Punchmarked) বঙ্গদেশে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ বিশেষ ধরনের চিহ্নিত মুদ্রা গুলি বঙ্গদেশে ব্যবহৃত প্রাচীনতম মুদ্রার নিদর্শন এবং সম্ভবত এই ধরনের মুদ্রা বঙ্গ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক শতাব্দী ধরে লোকেদের ব্যবসা বানিজ্যের প্রয়োজন মিটিয়েছিলো। অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকে বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক জীবন যাত্রার ধারা সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ইতিহাসে একটা

কথা খুব প্রচলিত যে , মুদ্রা দ্বারা কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় । প্রাচীন উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা জানার ক্ষেত্রেও মুদ্রা প্রধানতম মাধ্যম। কুষান আমলে বঙ্গদেশে স্বর্ন ও তাম্র মূদ্রা আবিষ্কৃত হলেও তা আদপে ব্যবসায়িক বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল কি না তার স্বপক্ষে বিশেষ কিছু প্রমান নেই। তবে গুপ্ত শাসন প্রচলিত হওয়ার পর তাদের দ্বারা প্রচলিত নতুন মুদ্রার ব্যবহার বঙ্গ দেশে শুরু হয়। গুপ্ত সম্রাটরা সাধারণত স্বর্ন ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করতেন। উত্তরবঙ্গ তথা বঙ্গদেশে প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে প্রচুর পরিমানে গুপ্ত মুদ্রা পাওয়া যায়। এই সময় দুই প্রকার মুদ্রার কথা জানা যায়- দিনার অপরটি রূপক। সম্ভবত প্রথমটি স্বর্ন ও দ্বিতীয়টি রৌপ্য মুদ্রা। কিন্তু গুপ্ত পরবর্তী কালে বঙ্গদেশে স্বর্ন মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস করা হয়। এর প্রধানতাম কারন হলো বঙ্গদেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি। অর্থনৈতিক এই বিপর্যস্ত পরিবেশের সময় সম্ভবত কড়ির প্রচলন অধিক পরিমাণে হয়। কড়ি ছিল এই সময় প্রাচীন উত্তরবঙ্গের ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম। এই ধারা পাল ও সেন যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন উত্তরবঙ্গের ব্যবসা বানিজ্যের ক্রমাবনতি ঘটেছিল এতে কোন সংশয় নেই।[২৩]

৪

প্রাচীন উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ কৃষি ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু গুলি যেহেতু সমাজের বিভিন্ন মাধ্যম গুলির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকে, তাই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বানিজ্য পথ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পণ্য আদান প্রদানের অঞ্চল গুলিও শিল্প, বানিজ্য তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে। প্রাচীন উত্তরবঙ্গ তথা বঙ্গদেশের যে সমৃদ্ধ অর্থনীতির রূপ দেখা যায়, তার পশ্চাতেও কিন্তু এই মাধ্যম গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। উদ্বৃত্ত কৃষি পণ্য থাকলেই শুধুমাত্র শিল্প, বানিজ্য সমৃদ্ধতর বা উৎকর্ষ লাভ করে না, পণ্য আদান প্রদান এর জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যাবস্থা না থাকলে বানিজ্য পশ্চাদগামী হতে বাধ্য। অর্থাৎ বানিজ্য মাধ্যম হিসেবে বানিজ্য পথ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, প্রাচীন বাঙলার অন্তর্বাণিজ্যের স্থল পথের বিবরন স্বল্প। লিপিগুলিতে, বিদেশী পর্যটকদের বিবরনীতে এবং কিছু সমসাময়িক সাহিত্যে কয়েকটি মাত্র প্রান্ততিপ্রান্ত সুদীর্ঘ পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সোমদেবের "কথাসরিৎসাগরে" পুন্ড্র বর্ধন থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত পথের উল্লেখ আছে। অষ্টম শতকের একটি শিলালিপিতে অযোধ্যা থেকে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরনীতে কজঙ্গল থেকে পুন্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ= বগুড়া-রাজশাহী-রংপুর-দিনাজপুর), পুন্ড্রবর্ধন থেকে এক প্রশস্ত নদী পার হয়ে কামরূপ, কামরূপ থেকে সমতট (ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, ২৪ পরগনা নিম্নভূমি), সমতট থেকে তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ পূর্ব মেদিনীপুর) ,তাম্রলিপ্ত থেকে কর্নসুবর্ন এবং কর্নসুবর্ন থেকে ওড্রা , কঙ্গোদ, কলিঙ্গ দীর্ঘ পথের উল্লেখ আছে। উত্তর- রাঢ় অঞ্চল থেকে একটি পথ ছিল পুন্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত।[২৪] আবার বানিজ্যের জন্য কিছু পথ প্রাচীন উত্তরবঙ্গ তথা বঙ্গদেশ থেকে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল। যেমন একটি পথ

উত্তরবঙ্গ থেকে মিথিলা হয়ে পাটলিপুত্রের ভিতর দিয়ে বুদ্ধগয়া স্পর্শ করে বারাণসী, অযোধ্যা অতিক্রম করে সিন্ধু ও গুজরাট বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিদ্যাপতির পুরুষ-পরীক্ষায় এই বানিজ্য পথের উল্লেখ আছে। উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ভিতর দিয়ে বঙ্গদেশ চীন ও তিব্বতের সঙ্গে বানিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। এই পথের বিবরন হিউয়েন সাঙ -এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। প্রাচীন উত্তরবঙ্গের সঙ্গে বানিজ্য সূত্র ধরেই পার্বত্য পথ গুলি বিস্তৃত হয়েছিল। যেমন উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি অঞ্চল থেকে সিকিম, ভুটান পার হয়ে হিমালয় গিরিপথের মধ্য দিয়ে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পেরিপ্লাস গ্রন্থে এই পথের উল্লেখ আছে।[২৫] দুধপানি লেখ থেকে জানা যায় যে অষ্টম শতকে তিন ভাই বানিজ্যের কাজে অযোধ্যা থেকে স্থল পথে পশ্চিম বাংলার তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। কিয়াতানের চৈনিক বিবরণে বলা হয়েছে যে কামরূপ থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে পূর্ব ভারতের মধ্যস্থল মগধে পৌঁছানো যেত।[২৬] অর্থাৎ বানিজ্যের জন্য যে আভ্যন্তরীন পথ গুলির গুরুত্ব ব্যাপক পরিমানে ছিল তা আলোচনা থেকেই স্পষ্ট। বলা যায়, পথকে অবলম্বন করে বানিজ্য বিস্তার লাভ করেছে, আবার বানিজ্য কে অবলম্বন করে বানিজ্য পথ গুলি বিস্তৃত হয়েছিল সেকথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না। তবে বানিজ্যের জন্য দুটি মতই চিরন্তন সত্য।

আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বা স্থলপথ প্রাচীন উত্তরবঙ্গের বানিজ্য গতিকে তরান্বিত করেছিল। ঠিক তেমনি আভ্যন্তরীন ও বহির্দেশীয় বানিজ্যিক ক্ষেত্রে নদীপথ ও সমুদ্রপথও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, প্রাচীন উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান যেহেতু সমূদ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্কীত নয়, তাই নদীপথেই বানিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল ব্যাপক ভাবে। দক্ষিণ বঙ্গে বানিজ্যের সঙ্গে সমূদ্র পথের সরাসরি সম্পর্ক ছিল। প্রাচীন উত্তরবঙ্গের বানিজ্যিকে সমূদ্র পথ একেবারেই যে প্রভাবিত করেনি, এমনটা কিন্তু নয়। "শঙ্খ জাতক", "সমুদ্দবানিজ জাতক", "মহাযান জাতক " , ইত্যাদি গল্পে বঙ্গদেশের নদী পথের উল্লেখ আছে। নদী পথে গঙ্গা-ভাগীরথী বয়ে বঙ্গদেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ ছিল। এ পথ প্রাগৈতিহাসিক পথ, এবং রেলপথে দ্রুত বানিজ্য সম্ভার যাতায়াতের সূত্র পাতের আগে বানিজ্য লক্ষ্মীর যাতায়াত এই পথেই ছিল বেশি। আবার প্রাচীন বাঙলার অন্য দুই প্রধান নদী করতোয়া এবং ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্যপথে বানিজ্য লক্ষ্মীর যাতায়াত এর সাক্ষ্য বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে উত্তর আসামের রেশম জাতীয় বস্ত্র সম্ভার, বাঁশ, কাঠ, চন্দন কাঠ, পান, গুবক বা সুপারি ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র- সুরমা- মেঘনা বয়ে বাংলাদেশে আসতো। করতোয়া এক সময় খুব প্রশস্তা ও খরস্রোতা নদী ছিল এবং তা সোজা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ এই নদী পথেই ছিল। নদীমাতৃক এই দেশে স্থল পথ অপেক্ষা নদী পথেই যাতায়াত ও বানিজ্য প্রশস্ততর ছিল।[২৭]নীহাররঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন চতুর্থ শতকে ফা - হিয়েন তাম্র লিপ্তি থেকে এক বানিজ্য জাহাজে করে সিংহল গিয়েছেন এবং তখন সময় লেগেছিল ১৪ দিন ও ১৪ রাত্রি । ফা - হিয়েনের পর বহু চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক এই পথ ধরেই বাংলা আসেন। এবং সিংহল এর সঙ্গে এই বানিজ্য পথ দিয়েই বাংলার বানিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠে। আবার এখানে একটি কথা তুলে না ধরলে আলোচনা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। প্রাচীন কালে ব্যাবসা বানিজ্যের সমৃদ্ধির

পশ্চাতে যে উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল তা হল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা অসংখ্য ছোট ছোট হাট-বন্দর ও গঞ্জ। যেমন প্রাচীন উত্তরবঙ্গের আভ্যন্তরীণ বানিজ্যিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুন্ড্রদেশে অসংখ্য এই হাট ও গঞ্জ গুলি গড়ে ওঠে, যা কৃষি ও বানিজ্য পণ্য লেনদেন করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল।[২৮]

৫

প্রাচীন উত্তরবঙ্গ তথা বাঙলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, আরো সহজভাবে বললে বাঙলার কৃষি, শিল্প, বানিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদিকে আলোচনা করে একটা বিষয়ে সমস্ত ঐতিহাসিক, পন্ডিতগণই একমত যে, প্রাচীন উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ও সমৃদ্ধিতার ছিল। এর প্রভাব উত্তরবঙ্গের সমস্ত জনগণের উপরেই পরেছিল। কৃষি প্রধান বাঙলা ছিল কৃষিতে অগ্রগণ্য অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায়। বানিজ্যকে কেন্দ্র করে বাঙলার নানা স্থানে হাট ও গঞ্জ এবং নতুননতুন নগড় গড়ে উঠেছিল। পূর্বেই তা আলোচনা করা হয়েছে। স্থল পথে বানিজ্য পরিচালনার জন্য বড় বড় রাস্তা ছিল এবং প্রাচীন নগর গুলিও বানিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিনত হয়েছিল। হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক প্রভৃতি কর্মচারীদের নাম থেকে বোঝা যায় যে, শিল্প ও বানিজ্য হতে রাজ্যের যথেষ্ট আয় হতো। শুধু তাই নয়, বাঙলার বানিজ্য শুধুমাত্র বাঙলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, নদী ও সমুদ্র পথে বাঙলার সমৃদ্ধ বানিজ্য ভারতের বিভিন্ন অংশ ও বিদেশেও (মিশর, রোম, চীন) ছড়িয়ে পড়েছিল।[২৯]এর থেকেই অনুমান করা যায় উত্তরবঙ্গ তথা বাঙলার তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত চিত্রটি। কিন্তু দুঃখের বিষয় অষ্টম শতকের পর বাঙলার এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা রমরমা আর সেভাবে চোখে পড়ে না। স্বর্ন ও রৌপ্য মুদ্রার অপ্রচলন এর পরোক্ষ প্রমান বলা যায়।

উত্তরবঙ্গ তথা প্রাচীন বাঙলার এই অর্থনৈতিক অধঃপতন কোন একক কারন বা কোন নির্দিষ্ট সময় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ শিল্প, বানিজ্যের অবক্ষয় অষ্টম শতকের অনেক পূর্বেই শুরু হয়েছিল। তারনাথের বিবৃতি মতে ললিত চন্দ্রের মৃত্যুর পর সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে অভূতপূর্ব নৈরাজ্যের সূত্রপাত হয়। যা বাঙলার ইতিহাসে মাৎস্যন্যায় নামে পরিচিত হয়েছিল। যা নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন পরে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের এক বিশৃঙ্খল অবস্থায় ব্যবসা-বানিজ্যের অবস্থা খুব ভালো থাকার কথা নয়। ব্যবসা-বানিজ্যের পশ্চাতে রাষ্ট্রের যে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যাবস্থা-বিন্যাস, আইন,শৃঙ্খলা থাকা প্রয়োজন এই যুগে তার কোনও সাক্ষ্যই পাওয়া যায় না। শান্তি ও শৃঙ্খলা যেখানে অব্যাহত নেই সেখানে ব্যবসা-বানিজ্যের সমৃদ্ধি কল্পনা করা কঠিন।[৩০] প্রাচীন উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থার সার্বিক চিত্র ছিল ঠিক এরকমই। অষ্টম শতকের শেষ দিকে বাঙলার বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দরের কথা আর সেভাবে শোনা যায় না। চতুর্দশ শতকের পূর্বে সমগ্র বাংলাদেশে কোথাও আর সামুদ্রিক বানিজ্যের জন্য কোন বন্দরও গড়ে ওঠেনি। ফলস্বরূপ পাল ও সেন যুগে বাঙলার সমাজ প্রধানত কৃষি ও গৃহ শিল্প নির্ভর হয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গ তথা বাংলা প্রাচীন কালে শিল্প, ব্যাবসা, বানিজ্যের জন্য এত সুনাম অর্জন করেছে, ভারতের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও বাঙলার শিল্প, বানিজ্যের খ্যাতি যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল, সেই বাঙলার গৌরবময় অধ্যায় ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে

গেছে। কৃষি কাজের সম্প্রসারণ ঘটেছিল ব্যাপক ভাবে, রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে রূপ নিয়েছিল সামন্ততন্ত্র। সমগ্র বাংলা জুড়ে গড়ে উঠেছিল এক ধরনের নতুন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিকাঠামো।

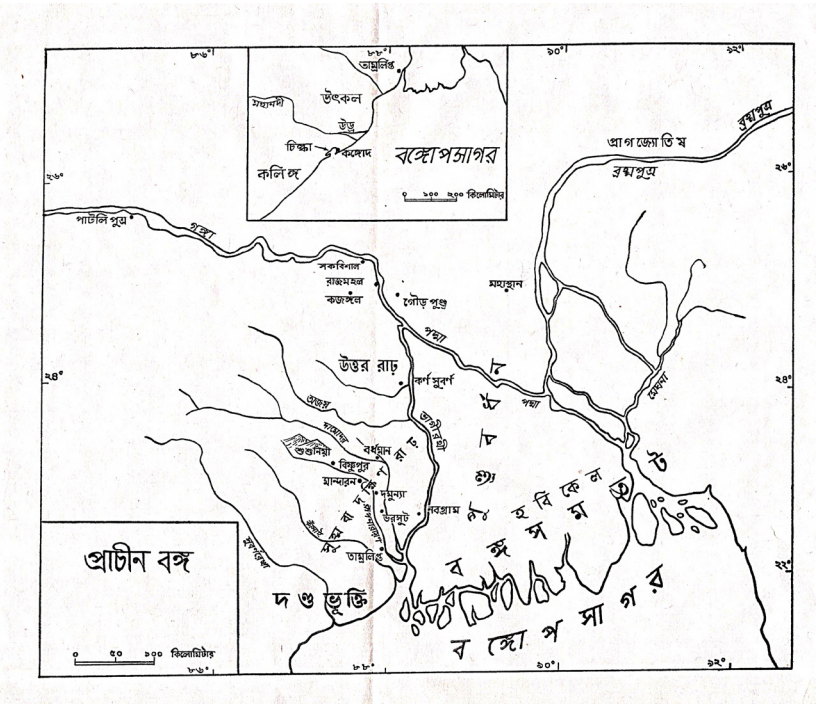

তথ্যসূত্র :

১. ডঃ সুজিত ঘোষ, উনিশ ও বিশ শতকের উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, রর্ডিাস সার্ভিস, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৩৯

২. নীহাররঞ্জন রায় , বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দে 'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা:১১৫-১১৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১২১-১২২

৪. রমণী মোহন দেবনাথ, ব্যাবসা ও শিল্পে বাঙালি, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা: ১০

৫. ডঃ সুজিত ঘোষ, উনিশ ও বিশ শতকের উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, রর্ডিাস সার্ভিস, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৩৯

৬. নীহাররঞ্জন রায় , বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দে 'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ২৯৩

৭. সুকুমার দাস, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, কুমার সাহিত্য প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২,

কোলকাতা, পৃষ্ঠা: ৪০
৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৪২
৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৪২-৪৩
১০. সুজিত কুমার ভট্টাচার্য, কাম কামতা কামাক্ষা তথা কোচ রাজবংশীদের দ্রাবিড়িয় উৎস, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা: ৫
১১. কান্তি প্রসন্ন সেনগুপ্ত, দক্ষিন পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, কোলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ১২৪
১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১২৪-১২৫
১৩. ডঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর, সমাজ ধর্ম ও অর্থনীতি: প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৯০
১৪. জি. কে পাহাড়ী, মধ্যকালীন ভারত , শ্রী তারা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১২৫
১৫. ডঃ সুজিত ঘোষ, উনিশ ও বিশ শতকের উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, রর্ডাস সার্ভিস, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৩৯
১৬. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, দে' জ পাবলিশিং, কোলকাতা, পৃষ্ঠা: ২৯৪
১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২৯৪
১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৪৬-১৪৭
১৯. ডঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর- সমাজ, ধর্ম ও অর্থনীতি: প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ৮৬
২০. কান্তি প্রসন্ন সেনগুপ্ত, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, কোলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ১২৪-১২৫
২১. অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ পরিচয়, গ্রন্থতীর্থ, কোলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৫২
২২. নীহাররঞ্জন রায় , বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দে 'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৫০-১৫১
২৩. কান্তি প্রসন্ন সেনগুপ্ত, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, কোলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ৯৩-৯৫
২৪.. নীহাররঞ্জন রায় , বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দে 'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৯১-৯২
২৫. কান্তি প্রসন্ন সেনগুপ্ত, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, কোলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ৮০-৮১
২৬. জি. কে পাহাড়ী, মধ্যকালীন ভারত, শ্রী তারা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১৩৬
২৭. নীহাররঞ্জন রায় , বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দে 'জ পাবলিশিং, কলকাতা, , পৃষ্ঠা: ৯৬-৯৭
২৮. ডঃ সুজিত ঘোষ, উনিশ ও বিশ শতকের উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, রর্ডাস সার্ভিস, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৩৯

২৯. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার- বাংলাদেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কোলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৮৯
৩০. নীহাররঞ্জন রায় , বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দে 'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৩৮১

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি বিষয়ক চিন্তা ও চেতনার ইতিহাস

রাজীব সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

সারসংক্ষেপ:
বর্তমান আধুনিক পরবর্তী যুগে ইতিহাস গবেষণার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি বারংবার পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়, আধুনিক পরবর্তী যুগের চরম গতিশীলতার সময়েও ইতিহাস তার অস্তিত্ব এবং তার উপযোগিতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিক পরবর্তী যুগে নতুন নতুন বিষয়সূচির উপর ঐতিহাসিকরা আলোকপাত করতে শুরু করেছেন। পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা, বাস্তুতন্ত্র, জীবজগতের উপর পরিবেশের প্রভাব ইতিহাস চর্চার এইরকমই একটি নতুন বিষয়সূচি। বস্তুত পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনাকে আজ আর কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। এই বিষয়টিকেও কোন নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে গেলে সহযোগী সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলির সাহায্য অনিবার্য। প্রকৃতি, পরিবেশ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়গুলি বর্তমানে শুধুমাত্র বিজ্ঞান চর্চার পরিমণ্ডলে আলোচনা করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

সূচক শব্দ : বাংলা সাহিত্য, প্রকৃতি, পরিবেশ, মঙ্গলকাব্য, শাক্ত পদাবলী, বাউল গান।

পরিবেশ চিন্তা-চেতনাকে ইতিহাসের সঙ্গে সংযোজিত করতে গেলে বলে নেওয়া ভাল যে, পরিবেশ সচেতনতা ও সংবেদন এবং তার ভারসাম্য রক্ষার ঐকান্তিক প্রয়োজনের প্রশ্ন— এই সবই সাম্প্রতিক কালে বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে।[১] পরিবেশবিদ্যার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও সংস্কৃতির বৃহত্তর বৌদ্ধিক ইতিহাস আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পরিবেশবাদের আওতায় প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা ইতিহাস আলোচনার একটি অনিবার্য ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে ওঠার পেছনে মূলত দু'ধরনের কারণ রয়েছে। প্রথমত আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থার মধ্যে নিজেদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা এবং তৎসংবলিত উদ্বেগ; দ্বিতীয়ত প্রধানত এই একই কারণে পরিবেশের অন্যান্য প্রজাতির সুরক্ষা এবং সুরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। মৌলিকভাবে ভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী এই দুই ধরনের উদ্বেগ প্রকৃতির প্রতি এক বৃহত্তর মানবিক দায়বদ্ধতার অংশ, যার আশু প্রতিফলন হল প্রকৃতির প্রতি (বিশেষত প্রাণী এবং উদ্ভিদ) আমাদের নিবিড় বিজ্ঞানসম্মত চর্চা। তাই এককথায় বলা যায় যে, প্রকৃতি এবং পরিবেশ সম্বন্ধিত আলোচনা ইতিহাসের এক বিশেষ অঙ্গ বা এক বিশেষ ইতিহাস, যার জন্য

বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এবং সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং তথ্যের এক আবশ্যিক মেলবন্ধন প্রয়োজন।

মানুষের পরিবেশ অর্থাৎ যা আমাদের পরিবেষ্টন করে আছে তার মূল হল ভূমি (Lithosphere), জল (Hydrosphere) ও বায়ু (Atmosphare)। এই প্রাকৃতিক সম্পদ উপভোগের অবশ্যই সীমান্তরেখা রয়েছে, সেই সসীমতা লঙ্ঘন করে প্রকৃতি-দোহন যখন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায় তখনই কোনো না কোনোভাবে আত্মপ্রকাশ করে এক অনিবার্য সঙ্কট। আজ সমগ্র বিশ্ব সেই অমোঘ সঙ্কটের সম্মুখীন। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আবহাওয়ার বিবর্তন প্রভৃতি পরিবেশের নানা বিষয় থেকে উৎসারিত সমস্যাগুলির উৎস খোঁজার উদ্দেশ্যেই পরিবেশের ইতিহাস চর্চা করা হচ্ছে।

মধ্যযুগের বাংলার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এই সময় সামগ্রিকভাবে পরিবেশের চিত্র পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু মানুষের প্রকৃতিবিষয়ক চিন্তার বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যায়, যা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তাই বর্তমান প্রবন্ধটিতে আমি মূলত চৈতন্য পরবর্তীযুগে বিশেষতঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক বাংলা সাহিত্যে থেকে প্রকৃতি বিষয়ক বহুমুখী চিন্তাগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রাক্ আধুনিক মানুষের জীবনবোধ ও প্রকৃতি চিন্তার এই বিশ্লেষণ পরিবেশচর্চার ইতিহাসের ক্ষেত্রে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক. জগজ্জীবন ঘোষাল-বিরচিত মনসামঙ্গল

উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল। বাংলার প্রকৃতির কোলে তিনি আজীবন কাল অতিবাহিত করেছেন।তাই প্রকৃতি কেবলমাত্র তাঁর মননে নয়, চিন্তা-চেতনা এবং তাঁর সাহিত্যেও প্রভাব ফেলেছে। তাঁর কাব্য 'মনসামঙ্গলে' প্রকৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল দুই খণ্ডে বিভক্ত— দেব খণ্ড ও বানিয়া খণ্ড। দেবখণ্ডে যেমন প্রকৃতির জলময় এবং ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে পাই, তেমনি বাণিয়া খণ্ডে প্রকৃতির শান্ত, কোমল, সুন্দর, সবুজরূপ দেখতে পাই। চাদ-এর বাণিজ্য যাত্রা এবং বেহুলার জলযাত্রাপথে প্রকৃতির বর্ণনা ও প্রভাব এ কাব্যের মানব চরিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখিত হয়েছে।

প্রথমেই উল্লেখ করা যায় 'দেব খণ্ডে' বর্ণিত প্রকৃতির কথা। কাব্যে বলা হয়েছে সমগ্র বিশ্ব ছিল জলময়।জীব-জড়, স্বর্গ-মর্ত্য কিছুই ছিল না-

"হরি বোলবে ভাই সংসার সকল জলময়।।ধুয়া।।[২]

এরপর স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, দেবতা ও মানুষ সৃষ্টি হল। এই সৃষ্টি ক্রিয়ার বর্ণনাও অতীব সুন্দর যেমন-

"জলের উপরে নির্ম্মাইল নিরঞ্জন।
একমন দিয়া শুন সৃষ্টির পত্তন।।
অনাদি আদেশ কৈল শুন চারি ভাই ।
প্রলয় ঘুচায়া সৃষ্ট মন কর ভাই।।"[৩]

এরপর বিষ্ণুর দশাবতার সৃষ্টি হল। রাজা ধর্মের বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় তৈরী হল মনসা-

'নিঃশ্বাসত নিঃসরিল মনসার জন্ম হৈল বসিয়া উঠিল্লা বামপাশে। এখানে প্রকৃতির প্রভাব পাই। এছাড়া শিবের পুষ্পবাড়ি প্রসঙ্গে প্রকৃতির বর্ণনা এককথায় অনবদ্য। যেমন-

"কস্তুরী কেতকী কদম্ব আমলকী
গাছে গাছে উকটিয়া চায়।
চাহে গাছ ভাগেভাগ ডালে ডালে পাতে পাতে
ভূতনাথ উদ্দেশ না পায়।।
চাপা নাগেশ্বর যুথী ওড় টগর মালতী
ভাঙ্গ আর ধুতুর পলাশ।"[৪]

এই পুষ্পবনে শিব-দুর্গার গান্ধর্ব বিবাহ হল। পুষ্পবনে রচিত হল শয্যা। রতিক্লান্ত দুর্গা। শংকরের আদেশে ইন্দ্র বারি বর্ষণ করলেন। ফলে সেই জলে দুর্গা পরিশুদ্ধ হলেন—

"সেই জলে শুদ্ধ হইল শংকর ভবানী।"

দুর্গার রূপ দেখে বিহ্বল ব্রহ্মার বীর্য দুর্গার গর্ভে স্নান করার সময় প্রবেশ হলে দুর্গা গর্ভবতী হয়। গঙ্গার পরামর্শে সমুদ্রের তীরে গর্ভপাত করালে তা থেকে দূর্বা ঘাস তৈরী হয়—

'গঙ্গা দুর্গা দুইজনে গেল বনবাস
বালুর ওপরে গর্ভ হৈল দূর্বাঘাস'।

এই দুর্বাঘাস প্রকৃতিরই অংশ। কবি এখানে দুর্বাঘাসের মাহাত্ম্যকে নারী বিশেষ করে দেবীর গর্ভ অংশের ফল হিসাবে দেখিয়েছেন। এছাড়া এই খণ্ডের শেষে রাখাল ও মাঝিদের কাছ থেকে মনসা পূজা পায় তাতেও প্রকৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এরপর 'বানিয়া খন্ডে' প্রকৃতির প্রভাব সবথেকে বেশি। প্রত্যেক কাহিনীর মধ্যেই প্রকৃতি বর্তমান। তবে সবচেয়ে বেশি প্রকৃতির বর্ণনা পাই চাদের বাণিজ্য যাত্রা ও বেহুলার জলপথ যাত্রায়। ছয় পুত্রকে সর্প দংশনে হত্যা করার পর কাতর চাঁদকে মনসা আকাশপথে পুষ্পরথে চেপে এসে তাঁকে পূজা দেবার কথা বলেন। এসময় কবি প্রকৃতির প্রয়োগ সঠিকভাবে করেছেন—

"চড়িয়া হিঙ্গুল রথে আসিয়া আকাশপথে মনসা ডাকিয়া বোলে বাণী।
শুন চান্দো দুরাশয় জিয়াবো তোর পুত্রছয় যদি মোকে দেঅ ফলপানি।।"[৫]

ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর চাঁদ দক্ষিণে বাণিজ্য যাত্রা করলেন। পদ্মার বিবাদে মোকে কিছু নাই ডর' বলে সমস্ত নিষেদ লঙ্ঘন করে চৌদ্দটি ডিঙা প্রস্তুত করে স্বয়ং 'মধুকর ডিঙার অবস্থান করে বাণিজ্য যাত্রা করলেন। এই 'পাটন পর্বে যাত্রাপথের সুন্দর বর্ণনা পাই। 'মধুকরে বসে চাঁদ গগরিয়া ঘাট পার হলেন, তারপর ভ্রমরাদহ, ভাগীরথী। পদ্মার রং এখানে সাদা। তাই তিনি গঙ্গার কথা জানতে চাইলেন।

"গগরিয়া ঘাট বায়া ভ্রমরা দহতে গিয়া পাছে পালা ভাগীরথীর ধার।
দেখিয়া ধবল জল পুছে তবে সদাগর ধবল বরণ কুন পানি।।"[৬]

চাঁদ গঙ্গায় স্নান করে কান্ডারীর কাছ থেকে গঙ্গার জন্ম বৃত্তান্ত শুনলেন। এখানে প্রকৃতির

সঙ্গে গঙ্গার জীবন বৃত্তান্ত ও মর্ত্যে প্রবাহ আগমন ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

তারপর নৌবহর নবদ্বীপ ছাড়িয়ে এল ত্রিবেণী। তারপর সাগর পার হতে এল কাঁকড়াদহ- তারপর শঙ্খদহ। জাল ফেলে শাঁখ তুললেন তিনি। এরপর কড়িদহ, অবশেষে দক্ষিণ পাটন। তবে এপর্যন্ত সাগরের প্রতিকূলতার কথা কবি বলেননি। তারপর বাণিজ্য করে একই জলপথে চাঁদ ফিরতে লাগলেন। এবার মনসা আসল বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। মনসা নেতার পরামর্শে হুনুমান, পবন ও নদ-নদীদের ডাকলেন। মেঘ এল- ভয়ংকর বর্ষা, ঝড়-বাদল হল: প্রচুর নদনদী এল প্রচুর প্লাবন নিয়ে, তবুও চাঁদের নৌকা ডুবল না। এখানে আমরা ভয়ংকর প্রকৃতির রূপ দেখতে পাই। যেমন-

"পদ্মার আদেশ পাঞা চলে মেঘগণ। কাঁকড়ার জলে চলে ঝড় বরিষণ।
আবর্ত সামত মেঘ প্রোণ পুষ্কর। মুষল ধারে জল পড়ে ঢোল পাথর।।"[৭]

তারপর মনসার কথায় সাগর ডিঙা ডুবিয়ে দিলেও কাউকে প্রাণে মারলেন না।

চাঁদ একাকী জলে ভাসছেন চারিদিকে কোন কিনারা নেই। চাঁদ টেপা মাছের মত ভেসে চলেছে। আর মনসা কখনও কাকের ছদ্মবেশে কখনও বা অন্য ছদ্মবেশে চাঁদকে আরো কষ্ট দিচ্ছেন— এই অংশের বিবরণে কবি প্রকৃতিকে। কাহিনীর সঙ্গে চমৎকারভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন। এখানে প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠেছে।

এরপর বেহুলা ও লখিন্দরের বিবাহের পর লখিন্দর মারা গেলে বেহুলা লখিন্দরের ভেলা চেপে তার শবদেহের সঙ্গে ভেসে যেতে থাকে। এখানেও কবি প্রকৃতির অর্থাৎ জলপথের বিবরণ চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। দুই প্রহর বেলায় বেহুলার ভেলা খরস্রোতে ভাসল। প্রথমে ভেলা গগড়িয়া ঘাট পার হল। তারপর ভাগীরথী। এখানে একদিকে খরস্রোতা নদী যেমন বেহুলার প্রতিবন্ধা ঠিক তেমনি মনসা বিভিন্ন ছদ্মবেশে বেহুলাকে বাধা দিতে থাকে। ভাগীরথীর দশটি বাঁক পেরিয়ে মধুসূদন ঘাটে এল বেহুলা। এখানে মধুসূদন দানীর হাত থেকে বাঁচলেন। পরে এল গোদার বাঁক। এই গোদার বাঁকে গোদার অসভ্য ব্যবহার এবং তা থেকে বাঁচার জন্য কবি প্রকৃতির ব্যবহারই নিয়েছেন। গোদার ঘাট পার হতে সূর্যাস্ত হল। ঘন অন্ধকার নেমে এল। নদী খরস্রোতা, ভেলায় একাকী বেহুলা, ভেলার চারপাশে শুশুক, ঘড়িয়াল মাছ, কুমির লাফালাফি করছে। পরদিন আবার সূর্য উঠল এবং মলয় বাতাস বইতে শুরু করল। এখানে উজাড় করা প্রকৃতির বর্ণনা ও ভূমিকা এককথায় অনবদ্য।

স্বামীর শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছে— দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। মক্ষিকা এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেহুলা স্বামীর দেহ জড়িয়ে আত্মহননের কথাই ভাবছেন। এই অবস্থায় নেতাকে দেখা গেল। তাঁর পুত্র কাঁদছে, স্তন্য পানের আবদার করছে। বেহুলা দেখল এক আশ্চর্য দৃশ্য—

"কোপিত হইল নেতা সাগরের জলে
হেন্যাকে মারিয়া থুইল অষ্টনাগ তলে।"

পরে আবার 'ছেন্যাকে জিয়াইয়া পাছে পিয়াইল স্তন'। এখানে প্রকৃতি ও দৈব শক্তি একাত্ম হয়ে এক অনবদ্য রূপে ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, জগজ্জীবন এর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে প্রকৃতির প্রভাব যথেষ্ট।

এতে প্রকৃতির সঙ্গে দৈবশক্তি একাত্ম হয়ে আলাদা চরিত্রে পরিণত হয়েছে। একদিকে যেমন প্রকৃতির বিভিন্নরূপের বর্ণনা পাই, অন্যদিকে তেমনি চাঁদের বাণিজ্য যাত্রার সময় বিভিন্ন ঘাটের নাম জানতে পাই। যা থেকে বোঝা যায়— দেশ সম্পর্কে কবির ধারণা ছিল একান্তভাবে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক। বেহুলার যাত্রা প্রসঙ্গে কবি বেহুলার দুঃখে গাছ, পশু-পাখির যে বর্ণনা করেছেন তাতে বলা যায় যে প্রকৃতি এখানে স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠেছে।

খ. রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গলকাব্য

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ত্রিশ সংখ্যক কবি হলেন রূপরাম চক্রবর্তী। তাঁর রচিত কাব্য সহজ ও সাবলীল। কোথাও পাতিত্যের ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য না থাকলেও কোথাও কোথাও প্রকৃতির প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে এবং এই প্রকৃতি কাহিনীর সাথে একাকার হয়ে গিয়ে কাহিনীকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। রূপরাম প্রকৃতি বর্ণনা করতে বসেননি, কিন্তু বাংলাদেশের কবি তাঁর রচনায় প্রকৃতিকে এড়িয়ে কিছু ভাবতেও পারেননি।

প্রথমে স্থাপনাপালার' কথা বলি। এখানে প্রকৃতির প্রভাব তেমন নেই। তবে বিশ্বসৃষ্টির স্থাপনায় তিনি যে প্রকৃতির ভয়ান, জলময় রূপের বর্ণনা করেছেন তা অনন্যসাধারণ—

"নাঞি জল স্থল স্থিতি বিষম প্রলয় তথি জীবজন্তু কেহ কোথা নাঞি।
রবি শশী নাকি বয়সব অন্ধকারময় একমাত্র আপনি গোসাঞি।
প্রকাশিত অঙ্গ যনু অতি মনোহর তনু তপন তরণি অভিসার।"[৮]

এছাড়া সমগ্র স্থাপনা পালা'য় জগৎ সৃষ্টির বর্ণনায় প্রকৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'হরিচন্দ্র পালায়' কবি হরিচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী মদনার কথা প্রসঙ্গে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। যেমন—

"বিশেষ বিহঙ্গ নানা চরে বারমাস।পানিকোড়া বিস্তর বিন্ধিল বালিহাঁস।।
বাটুল গুলতাই করে বুলে তরুতলা। কাননে কাননে ফিরে লুইচন্দ্র বালা।।
তরুমূল শিখরে পক্ষের পানে চায়। বনে বনে বুলে সব গাছের তলায়।।
উলুক বস্যাছে ডালে ধর্মের আসন। বট তরুবর গুরু এ তিন যোজন।।"[৯]

তবে 'শালে-ভর পালায়' রঞ্জাবতী ধর্ম ঠাকুরের ধ্যানের জন্য যে অরণ্য বেছে নেন এবং ধর্মঠাকুরের রঞ্জাবতীকে পরীক্ষা করার জন্য যেভাবে রূপ বদল করেছেন তা অতীব সুন্দর। আর এরই সাথে অরণ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি প্রকৃতির কথা চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

'লাউসেনের চুরি পালায়' লাউসেনের শৈশবে খেলা করা, গঙ্গায় স্নান করা এবং ধান বোনা প্রসঙ্গে কবি সুকৌশলে প্রকৃতির চিত্র এঁকেছেন। আবার 'আখড়া পালায় আখড়ার বিবরণ এবং ফলা প্রসঙ্গেও প্রকৃতির কথা এসেছে। অন্যদিকে 'বাঘজন্ম পালা'তে বাঘের ভয়াল ভয়ংকর রূপ বর্ণনার সাথে কবি সুন্দর ভাবে ঘন জঙ্গলের বিবরণও নিয়েছেন। যেমন-

'শ্যাওড়ার ঝাড়ে মাথা নাড়ে বাঘ।'

'জামতি পালায়' জামতি নগরকে 'লাউসেন ময়নার তপোবন' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে 'গোলাহাট-এর সমাজজীবন-এর বিবরণে বারে বারে প্রকৃতির কথাই উঠে এসেছে। যেমন—

"ধাতুকা ধাতুকী চিল রঘু-কালমুখী।
আড়াই বুড়ি ডিম্ব কোলে ফুকরে ডাহুকী।।"

'কাঙুর যাত্রাপালায়' প্রকৃতির প্রভাব যথেষ্ট। কবি এখানে কাত্তুরে যাত্রা পথের বিবরণ যেমন দিয়েছেন। তেমনই আছে প্রকৃতির উজার করা সৌন্দর্য্যের বর্ণনা। যেমন-

"পাথরের গড় দেখি পর্বতের আভা।
মেঘের বরুণ জিনি করিয়াছে শোভা।।"

আবার 'জাগরণ পালায়' কবি প্রকৃতির বিবরণ সুন্দরভাবে দিয়েছেন—

"এই তীর্থ হাকন্ড অরুণশাস্ত্রে গায়। তিন সন্ধ্যা দেবতা এহার জ্বলে নায়।।
এইখানে সন্ধ্যা গাত্রী করে দেবগণ। অরুণ উদয় বস্ত্র সাক্ষাত জীবন।।

.....

কতদিনে মানাথ ঠাকুর নিরঞ্জন। পশ্চিমউদয় দেখিব প্রতায় নয় মন।।"[১০]

অবশেষে ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় লাউসেন পূর্বের সূর্যকে পশ্চিমেক উদয় ঘটালেন। এখানে কবির ভাবনার সঙ্গে প্রকৃতির বিবরণ যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ তেমনি প্রকৃতির একটি চির বাস্তবকে অবাস্তব প্রমাণ করালেন এবং তাতে ধর্ম ঠাকুরের কৃপা একাকার হয়ে গেছে। এখানে লাউসেনকে নয় যেন চির বাস্তব প্রকৃতির একটি চির সত্যের বিরুদ্ধে ধর্মঠাকুর কৃপা করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে প্রকৃতির প্রভাব তেমনভাবে না থাকলেও তিনি প্রকৃতি ছাড়া কাব্য লিখতে পারেননি। কাহিনীর সঙ্গে প্রকৃতি কখনো কখনো ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

গ. রামেশ্বরের শিবায়ন

শিবসংকীর্তন ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচয়িতা রামেশ্বর পুরানো বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লেখক। শিবায়ন কাবো রামেশ্বর চাষী বাঙালীদের সংসারের সাধারণ মুখ-দুঃখের যে ছবি কিছুকাল আগে পর্যন্ত সত্য ছিল। কিন্তু এখন যে তার সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে গেছে তা নয়, তবে মিথ্যার স্তরে কিছুটা ঢাকা পড়ে গেছে বলে মনে হয়। রামেশ্বর তাঁর শিবায়ন কাব্যে গ্রাম্য জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রামীণ প্রকৃতির মায়াবী রূপের বর্ণনা যেমন দেখিয়েছেন তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশ দারুণভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মধ্যযুগের কাব্য মূলত দেবী নির্ভর ছিল। মাত্র কয়েকটি পুরুষ দেবতাকে কেন্দ্র করে যে কাব্যগুলি লেখা হয়েছিল তার মধ্যে শিবায়ন কাব্য অন্যতম। শিবকে কেন্দ্র করে

ভক্তিরসাশ্রিত কাব্য এটি। রামেশ্বর এর শিবায়ন কাব্য খানিকে পুরাণের পুনরাবৃত্তি বলা চলে। তবে রামেশ্বর এর মূল কৃতিত্ব হল পুরাণের লৌকিক দেবতা শিবকে মানব করে গড়ে তুলে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রাম্য জীবনের কথকথা তাঁর কাব্যে বিমূর্ত সৌন্দর্য লাভ করেছে। এখানে যেমন গ্রামীণ চাষী, ধান, মশা, কামার, কুমোর এর কথা আছে তেমনি আছে তৎকালীন গ্রাম্য পরিবেশ ও গ্রাম্য প্রকৃতির মায়াবী রূপ। আসলে দেবতাদের মানব রূপে কল্পনা শিবায়ন কাব্যের জনপ্রিয়তার মূল কারণ। তৎকালীন সময়ের একটি দারুণ পরিবেশের সন্ধান পাই নীচের উদ্ধৃতিতে—

"গুটি গুটি দুটি মুখে রক্ত টান্যা খায়।
যতক্ষণ জঠর পূর্ণিত নাঞি হয়।
ছাড়াইলে ছিল্ডে তবু ছাড়িবার নয়।"[১১]

আবার দেখা যায় প্রকৃতির শয্য শ্যামলা রূপ। নববর্ষার আগমন ঘটেছে, আকাশ মেঘের মালার দ্বারা সজ্জিত পল্লী। মানুষের এতে চাষের সুবিধা হলেও কষ্টের অন্ত নেই তাদের—

"পথে পঙ্ক সঙ্কোচ পৃথিবী পয়োময় ।
নদীনালা পূর্ণ হৈয়া মহাবেগে বয়।।

... ...
চলা বুলা গেল নদী নালা আল্যা বান।।"[১২]

পাড়া গ্রামের খালবিলের চিত্র এখানে দুর্লভ নয়। নানারকমের উদ্ভিদের পরিচয় যেমন এখানে আছে তেমনী আছে তাদের বিস্তারিত বর্ণনা। গ্রামের চাষীরা মাঠে ভাল ধান হলে যে আনন্দ তাদের সাধারণত হয় সে আনন্দও ধরা পড়েছে কাব্যখানিতে। তৎকালীন সময়ে নায়েব, গোমস্তাদের ভয়, মহাজনদের ভয় প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে রামেশ্বর তাঁর সচেতন তুলি কলমের টানে দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার একত্রে দেখি শিবের বাসস্থান কৈলাসের দারুণ প্রাকৃতিক বর্ণনা। আসলে রামেশ্বর পুরাণ থেকে শিবকে তুলে এনে যেন আমাদের ধরাধামে হাজির করেছেন। এ শিব আর দেবতা নয়, রক্ত মাংসে গড়া আমাদের ঘরের মানুষ।

রামেশ্বরের কাব্যে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিকতা অনুযায়ী যুগের বৈশিষ্ট্যকেও দেখা যায়। যেমন দেবীর রূপ বর্ণনা, নারীদের পতি নিন্দা, শাশুড়ীদের জামাই নিন্দা, কাঁচলী নির্মাণ ইত্যাদি। তাছাড়া রামেশ্বরের শিব একজন কৃষক। যার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশের এক দারুণ চিত্রকে প্রত্যক্ষ করা যায়। রামেশ্বরের কাব্যে চাষের নানারকম সমস্যার কথা আছে-

"অনেক আয়াসে চাষে শষ্য উপস্থিতি।

... ...
কৃত্যা কাত্যা কায়েত কিফাতি করে তায়।"[১৩]

অভাব অনটনের দারুণ চিত্র এখানে দেখা যায়। কর্তা পরিশ্রম করে যা আনেন তাতে ঠিকমত সংসার চলে না। গৃহিনী স্বামীর কাছে অনুযোগ করলে কর্তা ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু

গৃহিনী করবেন কি। ছেলেগুলি দারিদ্র মানে না-

"এখন বাপের কাছে বস্যা আছে পো।

... ...

দুগ্ধ পুষ্য ক্ষুব্ধ নাকি চুম্ব দিলে রয়।।"[১৪]

আবার রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে প্রকৃতির ভয়াবহ রূপের পরিচয় আমরা পেয়েছি বহুভাবে। যেমন, গৌরীর গমন পথের ঝড় বৃষ্টির যে বর্ণনা রামেশ্বর দিয়েছেন তা এক কথায় অনবদ্য -

"ঈশানে উড়িয়া সকল পুরিয়া
জলধর ধাইল বেগে।
কুলকুল করিয়া অশ্বর ঢাকিয়া
আন্ধার করিল মেঘে।।

... ...
বড় বড় পাষান পড়ে।।"[১৫]

এছাড়া 'মায়ানদী সৃজন' ও 'দেবীর মায়ানদীর উত্তরণ' অংশে রামেশ্বরের প্রকৃতি সচেতনতার পরিচয় আমরা পাই বেশী করে। প্রথমে মায়ানদী সৃজন অংশে আমরা দেখি—

"ঝড় বৃষ্টি নাহি আর নিশা অবসান।
বিশ্ব মাতা বিহানে বাপের বাটীপ যান।।

... ...
সলিল না খায় কেহ শ্বাপদের ডরে।।"[১৬]

এছাড়া 'বৃকোদরের শস্য আহরন' অংশেও তৎকালীন পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যায়। এ অংশে রামেশ্বর বর্ণনা করেছেন—

"প্রণমিঞা বিশ্বনাথে বৃকোদর নাম্বে খেতে
দু মণে দা লৈয়া হাতে

... ...
আগুন মৈটায়্যা দিল তায়।।"[১৭]

অন্যদিকে আবার শিবায়ন কবি কাব্যের সমাপ্তি অংশে ধানের বর্ণনার মধ্য দিয়ে এক অন্যতম স্বাদের পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির ধানের নাম উল্লেখ করে একদিকে যেমন কৃষিজীবি সমাজের পরিচয় দিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন প্রজাতির ধান সম্পর্কে দেওয়া তথ্য যথেষ্ট প্রসংশার দাবীদার। সেই সব বিভিন্ন প্রজাতির কয়েকটি ধান হল— চামরশালি, চন্দনশালি, বাকশালি, সীতাশালি, লাউশালি, কুসুমশালি, গন্ধমালতি, কালিন্দী, কনকচুর প্রভৃতি।

এভাবে রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্য আসলে পুরাণের অনুসরণ হলেও এ কাব্যের অলিতে-গলিতে মধ্যযুগের গ্রামীণ প্রকৃতি ও পরিবেশের সন্ধান দারুণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রামীণ চাষী, খেতমজুর, কামার, কুমোরের কথা যেমন এখানে আছে তেমন যারা ভিক্ষা করে দিন চালায় তাদের পরিচয়ও এখানে পাওয়া যায়। অবশেষে বলা চলে রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্য মধ্যযুগের সমাজ বাস্তবতার দলিল।

ঘ. ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে ধর্মমঙ্গলের জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। মধ্যযুগের কাব্যে যেখানে প্রধানত স্ত্রী দেবতাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত সেখানে ধর্মমঙ্গলে প্রথমে পুরুষ দেবতার পরিচয় পাওয়া গেল। ধর্মমঙ্গল কাব্যটির প্রধান দেবতা হল ধর্মঠাকুর। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর অদ্ভূত পূর্ব কল্পনার রঙে রজিত করে মনের অপরূপ মাধবী মিশিয়ে এই অপরূপ কাব্যখানি রচনা করেছিলেন। ঘনরামের কারো প্রকৃতির বর্ণনা শুধুমাত্র পটভূমি হয়ে থাকেনি, জীবন্ত চরিত্র হয়ে কাহিনী বিবর্তনে সাহায্য করেছে।

ধর্মমঙ্গল মোট ২৪টি পালায় বিভক্ত। মূলকাহিনীর সঙ্গে কোথাও শাখা কাহিনীর যোগ লক্ষ করা যায়। কাব্যের নায়ক লাউসেন। তার জন্ম থেকে স্বর্গারোহন অবধী কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। আর লাউসেনের মধ্য দিয়ে ধর্ম পূজা প্রচার করানো হয়েছে যা কাব্যের মূল উদ্দেশ্য। প্রথম পালা দুটি অংশে বিভক্ত, একটি বন্দনা অংশ অন্যটি ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের কাহিনী, কবি যেখানে সৃষ্টি-পত্তন কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেখানে দেখা যায় তিনি যে বর্ণনা। দিয়েছেন সেখানে আদিকালের প্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা আছে। চতুদিকে অন্ধকার, স্বর্গে দিন-রাত কিছুই ছিল না। এই অংশে সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনা করেছেন কবি। কাব্যের শুরুতে ঢেকুর পালায় দেখা যায়, ধর্মপালের পুত্র গৌড়ের রাজা হলেন। তিনি একদিন গুগয়া যাত্রায় বেরোলেন— এ অংশে অরণ্য প্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা পাই।
ঘনরামের কাব্যে ইছাই ঘোষের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রকৃতির বন্ধুর রূপের কিছুটা পরিচয় আমরা পেয়েছি। সেখানে দেখা যাচ্ছে অজয় নদীর তীরে ত্রিযষ্টির গড়ের কামকরণ ইছাই ঘোষ করেছিলেন ঢেকুর। তা মূলত অরণ্যভূমি। সেই অরণ্যভূমির বর্ণনা দিতে গিয়ে ঘনরাম বর্ণনা দিয়েছেন—

"চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ী গড়
দুর্গম গহন কাটি
করিয়া চত্বর বসালো নগর
রাজার বসত বাটী।"[১৮] (ঢেকুর পালা)

সৈন্যদের গমন পথের যে বর্ণনা ঘনরাম দিয়েছেন সেখানে দেখা যায় প্রকৃতি দূর্গম। সেই দূর্গম পথ দিয়ে সৈন্যরা চলেছে যুদ্ধে। সেই গমনের চিত্র ঘনারামেরপ নিপুণ তুলিকলমের টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। যেমন—

"একাত বেলদার বেগারী আগে ধায়।
উঁচু নীচু কুপথ সুপথ করে যায়।।
খাল খানা নির্ঝর বাচ্চার ঝোপ ঝাপ।
কেটে সেটে সমান সরনি করে সাফ।।"[১৯]

গৌড় যাত্রাপালায় দেখা যায় লাউসেনের গৌড় যাত্রার বিস্তৃত কাহিনী। লাউসেনের গৌড় যাত্রা কালে কবি যাত্রা পথের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন সেখানে গ্রাম, নদী, নালা প্রভৃতি প্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা ঘনরাম অঙ্কন করেছেন।

"বিদায় হইয়া সেন করিলা গমন।
কালিন্দী নদীর ঘাটে দিল দরশন।।
তরণী শরণে সুখে নদী হল পার।
দুকুলে আকুল লোক করে হাহাকার।।"[২০]

প্রকৃতির আর একটিপ অখণ্ড চিত্র পাই অঘোর বাদল পালায়। এখানে দেখা যায় মহামদ যখন জানতে পারলেন ধর্ম ঠাকুরের বলে বলীয়ান হয়ে লাউসেন এত তেজ দেখাচ্ছেন তখন মহামদ ধর্মঠাকুরের পূজার সিদ্ধান্ত নিলেন ধর্ম ঠাকুর এ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি করলেন। প্রবল ঝড় বৃষ্টির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল।

"আজ্ঞা বন্দি সঘনে গগনে গৌড় ।
সখনে ঈশাল কোণে চিকুর আছাড়ে।।
দড় দড় শব্দ ঘোর ঘন উল্কাপাত।
বিপরীত বিদ্যুৎ বিষম বজ্রাঘাত।।
নির্ঘাত শব্দ স্তব্ধ শিলা বরিষন।
প্রমাদ পাড়িল পুরে প্রলয় পবন।।"[২১]

ধর্মমঙ্গল কাব্য রাঢ়েরন জাতীয় কাব্য। প্রাচীনকালে পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি— এই সীমানা বেষ্টিত বিস্তৃত ভূভাগ বাঢ় নামে অভিহিত ছিল। এই বিস্তৃত অঞ্চল বর্তমানে হুগলী, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বিভক্ত। এই রাঢ়ভূমি ছিল প্রাচীন অষ্ট্রিক জাতিক আবাস্থল। আর্থীকরণের কালে এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা ডোম, বাগদী, দুলে, হাড়ি প্রভৃতি অভাজ শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। এই জাতির মধ্যে ধর্ম পূজার সমধিক প্রচার এবং এই অঞ্চলের জীবনবৃত্ত অবলম্বনেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের কায়া গঠন।[২২]

এভাবে ঘনরাম তাঁর কাব্যে দেব মাহাত্ম্য বর্ণনার পাশাপাশি রাঢ় অঞ্চলের অরণ্যভূমি, বাসাই, চাপাইন, ময়নাগড়, ঢেঁকুরগড়, দারকেশ্বর নদী, অদয় নদ, দামোদার নদ প্রভৃতির উল্লেখ করে প্রকৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা করেছেন।

ঙ. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ধারা মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যের ধারায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের স্থান স্বতন্ত্র। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত- ক. অন্নদামঙ্গল, খ. কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, গ. অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ। এবার আমরা তিনখণ্ডে বিভক্ত অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত প্রকৃতিবিষয়ক অংশগুলি উল্লেখ করে আলোচনা করব।

অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে 'অন্নপূর্ণা পুরীনির্ম্মাণ' অংশে কবি গ্রামবাংলার পল্লীপ্রকৃতি, মাটি ঘেঁষা চিরচেনা জগতের এক সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। আর তাই সেখানে ডাহুকা ডাহুকী, বেশে বউ, ময়না, শালিক, টিয়া, কাকাতুয়া, কোকিল, শঙ্খচিল প্রভৃতি পাখি: চীতল, মৃগেল, ভেটকী, কাংলা, শাল, শোল প্রভৃতি মাছ; হিজোল তেঁতুল, অশ্বত্থ, পাকুড়, বট, হরিতকী প্রভৃতি গাছ, করবী, গন্ধরাজ, মালতী, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল; বাঘ, গণ্ডার, ভালুক, সজারু প্রভৃতি পশু, কেউটে, শঙ্খচূড়,ন অজগর, লাউডগা প্রভৃতি শাপের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

'ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খানী খঞ্জন।
সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ।।'[২৩]
কিংবা,
'মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন।
জবা জুতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন।।'
কিংবা,
'ময়না শালিক টিয়া ভোতা কাকাতুয়া।
চাতক চকোর নুরী তুরী রাঙ্গচুয়া।।'

অন্যদিকে 'পুরবর্ণন অংশে কবি সুকৌশলে বাংলা প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে প্রশাসনিক ধারণা থাকলেও তা অচিরেই ম্লান হয়ে যায় কবির প্রকৃতিপ্রীতির গুণে। যেমন-

'কুহু কুহু কোকিল কোকিলাগণ ডাকে।
গুনগুন গুঞ্জরে ভ্রমরা ঝাঁকে ঝাঁকে।।

... ...
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ করার কোকনদ ।।

... ...
পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিনী ছয়রাগে।।[২৪]

কবির প্রকৃতি প্রিয়তার তলে তলে কোথাও যেন রয়েছে নগ্ন সমাজের থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আসা এক পূর্ণতার আস্বাদ। যা ধরা পড়ে,

"আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুন আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে ।।
সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া ।
ভারত কহিছে শাড়ী পর লো করিয়া।।"[২৫]

সুন্দরের মালিনী বাটার বর্ণনায় প্রকৃতি ও বাস্তবতা অনেক বেশি সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে। তাই চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ি, বিভিন্ন বর্ণ ও গন্ধের ফুল সর্বোপরি স্থান সংকুলানের কারণে প্রকৃতিরাজ চন্দ্র-সূর্য সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেই বদ্ধ পরিকর। শেষোত বলা যায়, কবির এই বর্ণনা অনেক বেশি করে ঋতুরাজ বসন্তকে সুচিত করে। যেমন-

"নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ি বৈসে অলিকূল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ বসায় ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল।।"[২৬]

মাল্যরচনা অংশে নামকরণের মধ্যেই কবির প্রকৃতি প্রীতির জীবন্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ফুলের ব্যবহার- বেল, আমলকী, অশোক, মধুটগর, গন্ধরাজ, ধুতুরা, অপরাজিতা যেন সেই জীবন্ততার মাত্রায় এক একটি নতুন পালক।

"ভারত রচিল ফুল কবিতা,
কবিতা রসের শালিকা।"[২৭]

-কবির এই বক্তব্যটি বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে একীকৃত হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে বারোমাস বর্ণনায় ছয় ঋতুর অনুষঙ্গী বারোটি মাস যেন কবি কল্পনা ও বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। আর তাই বৈশাখ মাস— সুগন্ধী ফুল, জ্যৈষ্ঠ মাস— সুস্বাদু আম, আষাঢ় মাসে — ঘন বর্ষন, শ্রাবণ মাস- মেঘের ঝঝনি, ভাদ্র মাস - প্রচুর জলের প্রাবল্য, আশ্বিন মাস— দুর্গ পূজা, কার্ত্তিক মাস - কালিপূজাসহ সাময়িক হিম, অগ্রহায়ণ— হিমের প্রাবল্য তুলনায় বেশি, পৌষ মাস হিমের চরম পরিণতি, ফাল্গুন, চৈত্র-বসন্ত বিলাপ বর্ণনায় কবির উজাড় করা প্রকৃতি প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়।
নানা ফুলগন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়।।
... ...
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম এ দেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর।।
... ...
আষাড়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন।।
... ...
ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি।।
... ...
কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্ত মহিমা।।
... ...
মধুর সময় বড় চৈত্র মধু মাস।
জানাইব নানামত মদনবিলাস।।"[২৮]

আবার তৃতীয় খণ্ডে প্রকৃতির ভয়ংকরতার এক নবতররূপ ধরা পড়ে মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি অংশে। সেখানে কবি প্রকৃতির সঙ্গে নিজেও সর্বদাই রূঢ় প্রবাহমানতার প্রতিকূলে বিরাজিত, যার সঙ্গে মিশে যায় সাধারণ মানুষের সহজ সরলভাবে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়— এই ধারণাটিও। কবির ভাষায়—

"দশ দিক আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুণ হয়ে বহে ঊনপঞ্চাশ পবন ।।
ঝঞ্চনার ঝঞ্চনি বিদ্যুত চকমকি।
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি।।
ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝরঝরি।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরি।।
থরথরি স্থাবর বজ্রের কড়মড়ি।
ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ি।।
ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বাণ।।"[২৯]

অন্যস্বাদের প্রকৃতি প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় রন্ধন অংশে রান্নার প্রসঙ্গে যে উপাদানগুলির অনুসঙ্গের বর্ণনা রয়েছে তা গ্রামবাংলার সঙ্গে সরলীকৃত। যা উঠে আসে 'ভোগের রন্ধনে। শাক'। এছাড়া এখানে রন্ধন প্রণালীরও একটা সূক্ষতর পরিচয় পাওয়া যায়। যার পরিচয় মেলে, 'বড়া বড়ী .... ফুলবাড়ী।। যার সাথে মিলে যায় পল্লী প্রকৃতিতে। উৎপন্ন হওয়া অনেক কৃষি ফসলের পরিচয়ও। যেমন মুগ, বরবটী, মটর, মুলা, লাউ, কুমড়া, আদা। এছাড়া আম, চালতা, তেঁতুল, আমড়া প্রভৃতি ফলের নাম পাওয়া যায়। আবার আসু, কনকচুর, ছায়াচুর, গন্ধেশ্বরী, বাশমতী, জুতী, লতামউ প্রভৃতি ধানের নামও উল্লেখ করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় কবির প্রকৃতি প্রীতি কতটা গভীর এবং প্রকৃতির প্রতি তিনি কতবেশি আন্তরিক ছিলেন।

চ. শাক্ত পদাবলী

শাক্তপদাবলীতে প্রকৃতির আনন্দলীলা নিকেতন শরৎকালকে কেন্দ্র করে আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ে রূপ লাভ করেছে। প্রকৃতির পটভূমিকায় মা মেনকার মাতৃস্নেহ অপূর্ব উৎসাহ রূপ লাভ করেছে। বাংলার শরৎ-প্রকৃতি আগমনী ও বিজয়া গানের প্রাকৃতির উপাদান। বেশ কিছু পদে অল্প কথায় শরৎ প্রকৃতির বর্ণনা এবং তার প্রেক্ষাপটে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা, সংশয় ও বিরহ-বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। শারদ প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য দেখেই মায়ের মনে উমার কথা জেগে উঠেছে। বর্ষান্তে সুনীল আকাশে চাঁদ উঠেছে, হলুদবৃত্তে শরৎ শেফালিকা প্রস্ফুটিত হয়েছে। মেনকা প্রতীক্ষা করে আছেন-

"গিরি, গৌরী আমার এল কৈ?

... ...
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি

বল বল, আমার কোথা বর্ণময়ী?"[৩০]

প্রতীক্ষা ব্যাকুল জননী উমার কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গেছেন, মনে করছেন হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে উমার আবির্ভাব ঘটেছে। দিকচক্রবালে অদ্ভুত এক আলোর আভা ফুটে উঠেছে। মায়ের মনে সংশয়, এ কি শুধু অরুণ আভার পর মুহূর্তেই 'সন্দেহ', "নিশ্চয়' প্রতীতিতে পরিণত হয়—

"এ নহে অরুণ-আভা, নহে শশধর-বিভা,
হিম-মাঝে বুঝি গৌরীর, গৌর-আভা হাসেরে।
শারদ-শশী বঙ্কিম,প করি ঐ আভাহীন
পশ্চিম গগনে ওই উমা মুখ ভাসেরে।"[৩১]

'নবমী রজনী' দশমী প্রভাত'-এর পটচিত্রে বাৎসল্যের ব্যাকুল বর্ণনা আরও মর্মস্পর্শী। নক্ষত্র কুন্তলা নবমী নিশির আবির্ভাব, ভাবী বিরহাতুর জননীর পক্ষে মর্মান্তিক। নবমী নিশিকে তাই 'সচন্দন প্রফুল্ল কুমুদবরে' অঞ্জলী দিয়ে জননী। তাকে বিলম্বিত করতে চান। দশমীর প্রভাত আরও করুণ। দশমীর প্রভাত-শিশির জননীকে নয়ন জলে ভাসায়, 'প্রভাত-কাকলী গান' মায়ের হৃদয়াশ্রু আকর্ষণ করে 'ঊষার আলোকে' মর্মদাহী জ্বালা বিস্তৃত হয়। দশমী প্রভাতের বিহঙ্গ-কলতান জননীর ভবন বিরহের আর্তনাদে স্তব্ধ হয়ে যায়, স্নিগ্ধ অরুণ কিরণ হয় নিষ্প্রভ। বিশাল ডমুর ঘন ঘন বাজে - জননীর হৃদয় কেঁপে ওঠেঃ কি হলো নবমী নিশি হইল অবসান গো'।

উমাকে বিদায় দিতেই হবে। কিন্তু এখনও তার ঘুম ভাঙেনি, প্রকৃতির বর্ণনা করে জননী গভীর করুণ সুরে কন্যাকে আহ্বান করেন-

"মা গো, রজনী প্রভাত হয়েছে,
ও মা, ডাকিছে বিহঙ্গ, পবন-তরঙ্গ
গন্ধভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে।।
ভানু যত তনু প্রকাশ করিছে,
বিদায় দিতে তোমায় বিজয়া বলিছে।"[৩২]

বিদায় দিতে প্রাণ ফেটে যায়, 'মন্দ আঁখি ঝুরে।' "বিহঙ্গতান, পবন-তরঙ্গ অরুণ' সূর্যালোকে বেদনার বাণী অনুরণিত হয়। শুভ্র পটে কৃষ্ণসূচী লেখা যেমন মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে, দশমীর আলোকে শিশিরে জননীর হৃদয়-বেদনাও তেমনই মনে গভীর রেখাপাত করে। প্রকৃতি যেমন বেদনা জাগায়, আবার এই প্রকৃতির মধ্যেই উমাকে সর্বত্র পরিব্যক্ত দেখে জননী সান্ত্বনা লাভ করেন।

জননীর হৃদয়-বেদনাকে পরিস্ফুট করতে আগমনী ও বিজয়ার গানে প্রকৃতির ভূমিকা তুচ্ছ নয়। প্রকৃতিকে আশ্রয় করে শাক্ত কবিরা অনন্ত বাৎসল্যময়ী মাতৃচিত্র অঙ্কন করেছেন। সে এক অপরূপ মাতৃচিত্র। বাংলার শারদ প্রকৃতি, বাংলার উৎসব, বাংলার সামাজিক রীতি-নীতি বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের আনন্দ বেদনার সংবাদে আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি প্রাণময়।

ছ. বাউল গান

মধ্যযুগের গীতিসাহিত্যের ধারায় সাধন সংগীতগুলিতে প্রকৃতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তত্ত্বের গূঢ় রূপকরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তবুও সেই রূপকের মধ্যে বাস্তব নিসর্গচিত্র প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বাউল গানে তাই দেখি, ঝড়ে বিকল নৌকার রূপকে কবি সাধকের আত্মিক সংকট রূপ লাভ করেছে। যেমন—

'উপুর ঝুণুর বাজে নাওরে নিহাইলা বাতাসে।'

কিম্বা

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
(আমি) ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।।"[৩৩]

- এখানে পাখীর প্রসঙ্গ এনে বাউল সাধনার তত্ত্বকে রূপ দেবার প্রয়াস দেখা যায়।

জ. লোকসাহিত্য ও ময়মনসিংহ গীতিকা

লৌকিক সাহিত্যের মধ্যে ময়মনসিংহ গীতিকাগুলিতে প্রেমানুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাই এইসব সাহিত্যে প্রকৃতি বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গীতিকার গ্রামীণ কবিরা প্রেম অথবা প্রকৃতি কেনো কিছুর চিত্রণেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথানুবর্তন করেননি। তাই গারো পাহাড়ে অরণ্য জটিল অন্ধকারময় ভীষণতা কবির লেখনিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে-

"উত্তরা না গারো পাহাড় ছয় মাঝ্যা পথ।
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পরবত।।
হিমানী পরবত পারে তাহারই উত্তর।
তথায় বিরাজ করে সুপ্ত সমুদ্দর।।
চান্দ-সুরুষ নাই আন্দারিতে ঘেরো।
বাঘ ভালুক বইসে মাইনসের নাই লড়াচড়া।।"[৩৪]

আবার অতিপরিচিত শালিধানের ক্ষেত কিংবা কাকচক্ষু জল সরোবরের সৌন্দর্যও তারা ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বর্ষাচিত্র বর্ণনা ও তাঁরা গ্রাম-বাংলার প্রকৃতিকে জীবন্ত করে রেখেছেন—

'হাতেতে জলের ঝারি বর্ষা নামি আসে।'[৩৫]
'শাশুনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে।
বউ কথা কও বলি ডাকে পথে পথে।।'[৩৬]

মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকৃতির প্রসঙ্গ নিয়ে উপমা রূপক সৃষ্টি করেছেন কবিরা। যেমন-

ক। মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আখি।[৩৭]
খ। আশমানের চান্দ যেমন জমিনে পড়িয়া।[৩৮]
গ। আজি পূর্ণিমার নিশা আরে শনিবারে দিনে।
ঔষধ তুলিতে কন্যা চল গহীন বনে।।[৩৯]
ঘ। গোলাপের মধু তায় গোবরিয়া খায়।[৪০]
ঙ। দেশেতে ভমরা নাই কি করি উপায়।[৪১]
চ। আমার সোয়ামী যেন পর্বতের চূড়া।[৪২]

আবার লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যেমন ছড়া, প্রবাদ প্রবচন, ধাঁধা, লোকসঙ্গীত প্রভৃতিতে প্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক বিষয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, গ্রাম্য ছড়ায়—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এলো বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কনো দান।।
কিম্বা, ছেলে ভুলানো ছড়ায়-
আয় আয় চাঁদমামা টি দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যায়।[৪৩]

এইসব ছড়ার মধ্যে বাংলাদেশের প্রকৃতির মোহময় চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ধাঁধার মধ্যেও রয়েছে প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রসঙ্গ। যেমন-

'বন থেকে বেরুল টিয়ে।
সোনর টোপর মাথায় দিয়ে।।'[৪৪]
(উত্তর: আনারস)

টুসু গানেও রয়েছে প্রকৃতির প্রসঙ্গ:
'হলুদ বনের ভাদু তুমি হলুদ কেন মাখ না।
শাশুড়ী ননদের ঘরে, হলুদ মাখা সাজে না।'

আলোচনা সূত্রে দেখা গেছে, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশ শাখা-প্রশাখার উদ্ভব ও বিকাশ ধর্মীয় বিষয়কেন্দ্রিক। প্রাতিষ্ঠানিকতা নয়, ধর্ম ছিল মানবজীবনের ধারণ করার পদ্ধতি, প্রাত্যহিকতার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ। প্রকৃতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, মাধুর্য, শ্রদ্ধা ভয়-ভীতি সকল মনোভাবই ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে বিধৃত আছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানুষ ও প্রকৃতির একটি সহজ সম্পর্ক প্রায় ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী বা অন্যান্য রোমান্টিক সাহিত্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেভাবে তা পাওয়া যায়নি। মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রকৃতির বর্ণনা এসেছে বিশেষত নায়িকার বিরহ ভাবকে বোঝানোর জন্য। তবে প্রকৃতি বিষয়ক কতকগুলি গতানুগতিক বর্ণনা তাতে অপরিহার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্যোগের চিত্র, বন বা উপবনের চিত্র; সেই সূত্রে নগরচিত্র, রাজসভার চিত্র। প্রকৃতি চিন্তার পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতাও তাদের মধ্যে ছিল।

তবে ধর্মের সঙ্গে প্রকৃতি ছিল ওতপ্রতোভাবে জড়িত। কিন্তু ধর্ম বহির্ভূত প্রকৃতি চিন্তার নিদর্শনও পাওয়া যায়। সমকালীন বাংলার মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানের নানা বহুমুখী চিত্রও লক্ষ করা যায়। যে কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাস রচনার মতোই প্রকৃতি চেতনার সম্পর্কে এই বিবরণও ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমমানের গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

সূত্রনির্দেশ :

১. D.F. Owen, What is Ecology? Oxford University Press, 1974,

pp.1-2
২. শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক আশুতোষ দাস (সম্পাদিত) - কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ৩
৩. তদেব, পৃ. ৩।
৪. তদেব, পৃ. ৩৩।
৫. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদনা)-জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬১।
৬. তদেব, পৃ. ৬৬
৭. তদেব, পৃ. ৭৬
৮. অক্ষয়কুমার (ভূমিকা ও সম্পাদনা) - রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল, ভারবী, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১০
৯. তদেব, পৃ. ৪৫-৪৬
১০. তদেব, পৃ. ৩০৮
১১. শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী (সম্পাদিত) - রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৭১, পৃ ১১৩।
১২. তদেব, পৃ. ১১৩
১৩. তদেব, পৃ ১৯০
১৪. তদেব, পৃ. ১৯৩
১৫. তদেব, পৃ. ৪৭৭
১৬. তদেব, পৃ. ৪৮১
১৭. তদেব, পৃ. ৫০৩
১৮. শ্রী পীযূষকান্তি মহাপাত্র (সম্পাদিত)- ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১, পৃ: ২৮
১৯. তদেব, পৃ. ৪১
২০. তদেব, পৃ ২০১
২১. তদেব, পৃ. ৫৫৬
২২. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, দ্বাদশ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৫০২। ২৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত (সম্পাদিত) - ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৪০৪, পৃ. ১০২
২৪. তদেব, পৃ. ২১৬-২১৭
২৫. তদেব, পৃ. ২১৭-২১৮
২৬. তদেব, পৃ. ২২৩
২৭. তদেব, পৃ. ২৩
২৮. তদেব, পৃ ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫
২৯. তদেব, পৃ ৩৬০ ৩৬১
৩০. শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত — ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৮৭, পৃ. ২৫৪

৩১. তদেব, পৃ ২৫৪
৩২. শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায় (সম্পাদিত) - শাক্ত পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭, পৃ. ৪৮
৩৩. অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য - বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১১
৩৪. শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন ও রায়বাহাদুর কর্তৃক সংকলিত— মৈমনসিং গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয়, ১৯৯৩, পৃ. ৪
৩৫. তদেব, পৃ ৩০
৩৬. তদেব, পৃ. ৩০২
৩৭. তদেব, পৃ. ২০
৩৮. তদেব, পৃ. ২৪
৩৯. তদেব, পৃ. ৩৪
৪০. তদেব, পৃ. ৭৩
৪১. তদেব, পৃ. ৭৩
৪২. তদেব, পৃ. ৭৫
৪৩. ড. দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত) - বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আমাদেমি অব ফোকলোর, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ২০০৪, পৃ. ৭৫
৪৪. তদেব, পৃ. ৭৯

বাউল দর্শন ও তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত

মহুয়া বাউল
গবেষিকা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষ আধ্যাত্ম ও ধর্ম সাধনার পীঠস্থান। ভারতীয় এই ধর্ম সাধনার ইতিহাসে বিভিন্ন ধারার প্রচলন রয়েছে, যার মধ্যে দুটি ধারা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হল জীবনকেন্দ্রিক ধারা এবং অপরটি জীবনকে পরিত্যাগ করার ধারা। জীবনকেন্দ্রিক এই ধারার মধ্যে আমরা বাউল, বৈষ্ণব সহজিয়া, প্রভৃতি সম্প্রদায়কে দেখতে পাই। এদের মধ্যে "বাউল লোক সম্প্রদায়" সবচেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। এই বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধন ভোজন গোষ্ঠী, যারা গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে গান গেয়ে বেড়ান। তাঁরা গানের মাধ্যমে তাঁদের আচরণগত বক্তব্য তুলে ধরেন। বাউলরা কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নয়। তাঁরা মূর্তি পূজা, বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদে বিশ্বাসী নয়। বাউলদের একটাই ধর্ম, তা হল "মানব ধর্ম"। বাউলরা সত্য পরিচিত অন্তরাত্মার ধর্মে বিশ্বাসী। বাউলরা মনে করেন সত্যকে জানতে হলে অন্তরাত্মার মাধ্যমে জানতে হবে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনোই সত্যের পরিচয় হয় না। সত্যকে জানার জন্য উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন। তাই বাউলদের কাছে মানুষের দেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতীকী ব্যাঞ্জনা। সেকারণে বাউলরা সারাজীবন ধরে 'মনের মানুষ খোঁজার চেষ্টায় তৎপরত'। তাঁদের বিশ্বাস এই মনের মানুষরূপী আরাধ্য দেবতা মানুষের দেহে অবস্থান করেন। আলোচ্য এই গবেষণা প্রবন্ধে বাউল দর্শন ও তাঁদের জীবনযাত্রার ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে।

সূচক শব্দ: বাউল, মানবধর্ম, লোকসংগীত, জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য।

বাউলরা হলেন মানবপ্রেমি সংসার বিরাগী, পথভ্রষ্টা ও বৈরাগ্য জীবনধারায় অভ্যস্ত সম্প্রদায়। বাউলরা সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে উদাসীন ঈশ্বর পাগল সম্প্রদায়। সভ্যতার আদিকাল থেকেই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এদের দেখা যায়। বাউলরা মানবতাবাদে বিশ্বাসী। কুসংস্কার, জাতপাতের বিভেদ বাউলদের স্পর্শ করে না। 'মানুষতত্ত্ব'ই হল বাউল সাধনার প্রধান লক্ষ্য। সারাজীবন ধরে তাঁরা এই সাধনায় ব্রতী থাকেন এবং গানের মাধ্যমে সেই সাধনার কথা প্রকাশ ও প্রচার করেন। বাউলদের রচিত গানের ভাবের গভীরতা, সুরের মাধুর্য, বাণীর সার্বজনীন মানবিক আবেদন বিশ্ববাসীকে মহামিলনের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাই ২০০৮ সালে ইউনেস্কো বাংলার বাউলগানকে "দ্য রিপ্রেজেনটিভ অব দ্য ইন্টারজিবল কালচার হেরিটেজ অব হিউম্যানেটিভ" তালিকাভুক্ত করে। তবে জাতীয় পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাউলদের সাধনা ও গান সম্পর্কে প্রথমদিকে আগ্রহের সূচনা করেছিলেন হরিদাস মজুমদার, নব্যকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সরলাদেবী প্রমুখ

ব্যক্তিবর্গ। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাউল প্রীতির পরিচয় বিভিন্নভাবে উদ্ভাসিত করেন এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

'বাউল' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে নানা গবেষক ও পণ্ডিতেরা নানান মতামত প্রকাশ করেন। সাধারণভাবে দেখলে আমরা বলতে পারি, বাউল শব্দের অর্থ 'বায়ুগ্রস্ত' অর্থাৎ পাগল। আবার অনেক পণ্ডিতগণ মনে করেন সংস্কৃত 'বাতুল' (পাগল, কর্মহীন) ও 'ব্যাকুল' (বিহবল বা উদ্ ভ্রান্ত) থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি। আবার অনেক পণ্ডিতগণ মনে করেন হিন্দি বাউর শব্দ থেকে বাউল শব্দের উদ্ভব, যার অর্থ হল উলোমেলো বিশৃঙ্খল পাগল ব্যক্তি। আবার কিছু পণ্ডিতগণ মনে করেন পারসিক বা আলা ও আরবি 'আউরিয়া' শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ উলকুল একতারা বাজানো ব্যক্তিদের দেখে মজার ছলে বাউল বলে ডাকতেন। লিখিতভাবে সর্বপ্রথম মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থে বাউল শব্দের উল্লেখ করেন।

"মুকুল মামার ঢুলে ল্যাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রনে....." [১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" মাত্র চারটি পঙক্তিতে পাঁচবার বাউল শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

"বাউলকে কহিও লোকে কহিল আউল
বাউলের কহিও হাটে না বিকাও চাউল
বাউল কহিল কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।"[২]

গবেষক মুহাম্মদ এনামুল হক বাউল শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ সম্পর্কে বলেছেন, "বাউল সম্প্রদায়ের নাম বাউলেরা নিজেরা গ্রহণ করে নাই। সাধারণত বাউল বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়াই দেশের লোক তাহাদিগকে এই নাম দিয়াছেন।"[৩] পনেরো শতকের মোহাম্মদ সগরীরে ইউসুফ জুলেখা, ষোল শতকের বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু' গ্রন্থে 'বাউল' শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব কবে কোথায় হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু শাহ মুহাম্মদের ইউসুফ জুলেখা, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যের চরিতামৃত গ্রন্থে বাউল শব্দের ব্যবহার থেকে অনুমান করা হয় যে, খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে কিংবা তার কিছুকাল পূর্বে বাংলাদেশে বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। সম্প্রতিকালে এক গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, পারস্যে অষ্টম-নবম শতকে সুফি সাধনা প্রবর্তনকালে বা'আল নামে সুফি সাধনার একটি শাখা গড়ে ওঠে। তাঁরা ছিল সঙ্গীতাশ্রয়ী। মরুভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা গান গেয়ে বেড়াত। অন্যান্য সুফি সাধকদের মতো তাঁরাও একসময় ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। এভাবেই বাংলায় বাউল সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। প্রফেসর উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য তাঁর "বাংলার বাউল ও বাউল গান" গ্রন্থে লিখেছেন - বাউল মতবাদের উৎপত্তি আনুমানিক ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের মতে,

বৌদ্ধদের মহাযানপন্থী থেকে বাউলদের উদ্ভব।[৪]

ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাউল সম্প্রদায়ের মানুষদের দেখা যায়। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলে বাউলদের বসবাস। বাংলাদেশের কুটিয়া, ঝিনাইদহ, ঢাকা, চুরাঙ্গা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে বাউলদের দেখা যায়। কিন্তু দুই বাংলার বাউলদের বেশ ভুষা, গানের কথা, করণ কার্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাউলরা বৈষ্ণবদের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁরা বৈষ্ণবদের মতো গেরুয়া পোশাক পরিধান করেন। বাংলাদেশের বাউলরা সুফিদের কাছ থেকে নিয়ে ছিলেন সাদা পোশাক, আলখাল্লা। বাউল নারীদের পোশাক ছিল শাড়ি। বাউল নারীরা অলংকার পরে না। কারণ সাজগোজের আড়ম্বর ত্যাগ করেই এরা বাউল হয়।

বাউলদের সাধনায় যেহেতু জ্ঞান ও দর্শনের অপেক্ষা কর্মের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়, সেহেতু বাউলদের ধর্মগুরু বা মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। বাউলরা বলেন, " ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যায় সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার। "গুরুকে বাউলরা দুই রূপে দেখেন। এক, মানবগুরু রূপে এবং দুই, পরমতত্ব রূপে। বাউলদের দুই রূপের সন্ধানই মেলে। বাউলরা বলেন মানবরূপী গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে পরম গুরুর অনুগ্রহ লাভ করা যায় না।

বাউল সম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। গৃহত্যাগী বাউল যাদের বৈরাগী বলা হয়।অপরটি গৃহী বা সংসারী বাউল। যারা গুরুর নিকট খিলাফত এর মাধ্যমে দীক্ষা নেন, তাঁদের গৃহত্যাগী বাউল বলে। এই শ্রেণীর বাউলরা সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে বিভিন্ন আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে বেড়ান। এই সংসার ত্যাগী পুরুষ বাউলেরা সাদা পোশাক পরেন এবং মহিলারা সাদা শাড়ি। তারা সন্তান ধারণ বা প্রতিপালন করেন না। তাই তাদের 'জ্যান্তে মারা' বলা হয়। বাউল মহিলারা সেবাদাসী নামে পরিচিত। এই সেবাদাসীদের পুরুষ বাউলদের সাধনাসঙ্গীও বলা হয়। আর সংসারী বাউলরা সংসার প্রতিপালনের মাধ্যমে বাউল সাধনায় ব্রতী হন। এদের সংখ্যা বাউল সাধনায় খুব কম দেখা যায়। এই বাউল সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য দেবতা হলেন অন্তরের ভগবান। তাঁরা মনে করেন অন্তরের ভগবানকে পেতে হলে মনপ্রাণ দিয়ে অন্তরের ভগবানকে ডাকতে হবে। তাঁরা মনে করেন অন্তরেই কৈলাশ বৃন্দাবন। দেহই মক্কা মদিনা। দেহের মধ্যেই পরমাত্মা আলোক সাঁই মনের মানুষ অধিষ্ঠান করেন। তাই বাউলরা সারাজীবন ধরে মনের মানুষ খোঁজার চেষ্টা করে যান। তাই লালন বলেছেন—

"মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষেরও সনে... "[৫]

বাংলার বাউল সাধকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হলেন লালন ফকির সাঁই। লালন সাঁই ১৭৭৪—১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাউল সাধনায় তাঁর জীবন নির্বাহ করেছেন। লালন সাঁই তাঁর গানের মাধ্যমে বাউল সাধনার করণ কার্যের নানা দিক তুলে ধরেছিলেন। তিনি আত্মতত্ত্ব, নবী তত্ত্ব,সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনা তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব সকল মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। লালন বলতেন, মহাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তিনি মনে করতেন ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে দেহেই ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে তিনি সেই বিখ্যাত গান—

" খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
তারে ধরতে পারলে মন বেড়ি,দিতাম পাখির পায়ে।
আট কুঠুরী নয় দরজা আটা,মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাঁটা।
তার উপরে সদর কোঠা,
তার উপরে সদর কোঠা,আয়না মহল তায়।"[৬]

বাউল সাধনায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। বাউল সাধনায় মনুষ্যধর্মই প্রধান। লালনের কাছেও মানুষই ছিল প্রধান। চণ্ডীদাসের সেই মহান বাণী — "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর কেহ নাই। " সেই বাণীরই প্রতিফলন হয়েছে লালনের গানে—

"এমন মানুষ আরকি হবে
মন যা ক-রা ত্বরায় ক-রা এই ভ-ব...।"[৭]

লালন জীবনের প্রথম পর্বে কেবল লালন নামে ভনিতা ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ গুরু সিরাজ শাহের নিকট দীক্ষা প্রহণের সময় নিজের নামের সঙ্গে গুরুর নাম উল্লেখ করেন তৃতীয় পর্বে যেখানে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার সিদ্ধিলাভের পর নিজের নামের সাথে ফকির, দরবেশ, সাঁই ব্যবহার করেছেন।[৮]

লালনের গানে একটি ভিন্নধর্মী প্রকৃতি ও স্বতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। লালন গবেষণকদের মতে লালন কবু দার্শনিক ধর্মপ্রেমী ও সাধক কিংবা বাউল শিরোমণি সবই তাঁর গানকে আশ্রয় করে ছিল। গানগুলো তাঁর নিজস্ব গঠনশৈলীর নিপুণতার অনন্য। শতাধিক বছর আয়ুধারি লালন জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বাঁকে এই গানগুলো রচনা করেছেন। তাই তাঁর গানগুলো বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় বাল্যজীবনের বিষয়, গুরু সান্নিধ্যের বিষয় এবং নিজে শিষ্য গ্রহণের বিষয় রয়েছে। সর্বপরি তিনি জীবনের নানাবিধ সমস্যাশঙ্কুল জীবন যা সামগ্রিক জীবনের ক্যানভাসে যেন বিমূর্ত হয়ে ওঠেছে। লালন অতি সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি বেদ বিধি শাস্ত্রীসম্বত ভাষা ব্যবহার করেননি। সে যুগের কোনো কবি গায়ক কিংবা বাউলদের রচনায় বিরল এমনকি তৎকালীন লেখ্য সাহিত্যের রামমোহন রায় কিংবা বিদ্যাসাগরের থেকেও একেবারে সাধারণ ও আটপৌরে জীবনের কথা তিনি বলেছেন। এছাড়াও লালনের গানে আর এক ভিন্ন রীতি পরিলক্ষিত হয়, তা হল "জোরা-বাঁধা" গানের রীতি। এই রীতিতে একটি গানে যেমন রহস্যের কথা থাকে তার পরবর্তী গানে রহস্যের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য তেমন অন্য একটি গান থাকে। এছাড়াও রচনারীতিতে একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র ঘরনা তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লালন গবেষক মুহম্মদ আবু তালিবের বক্তব্য - " শুধু ভাষার দিক দিয়ে কেন,কি ব্যক্তি অনুভূতি, কি রাগ ভেদ করে দিক দিয়ে লালনের গানে এমন এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে একবার শুনলে বা একনজরে দেখলে তাকে চেনা যায়।"[৯]

লালনের সমসাময়িক কালে অনেকে বাউল গান রচনা করেছেন। এদের মধ্যে পাগলা কানাই(১৮২৪-১৮৮৯) , প্রাঞ্জু শাহ(১৮৮১-১৯১৪) , ইন্দু বিশ্বাস, নয়ন ফকির সমূহ। পাগলা কানাই বড়ো মাপের শিল্পী ছিলেন অপরদিকে প্রাঞ্জু শাহ রচিত হিসেবে দক্ষ হলেও লালন শাহের মতো প্রগতিশীল পরিবেশন তার গানে অনুপস্থিত ছিল। তিনি

অনেকটা শরিয়ত পন্থী। এবং মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্যের বড়ো ছাডপ তার গানে রয়েছে। অন্যদিকে ইন্দু বিশ্বাস খুয়া গানের বড়ো শিল্পী হলেও শেষপর্যন্ত পাগলা কানাইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[১০]

এছাড়াও হাউড়ে, গোসাই, জহর শাহ, যাদুবিন্দু প্রমুখের রচনায় লালন শাহের প্রতক্ষ্য ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, কাঙাল হরিনাথ, মীর মশাররফ হোসেন লালন কালের শিক্ষিত কবি। স্বভাব কবি লালন তাঁর গানের স্বভাবসুলভ অনন্যতার এক কাল উন্নীত যুগের সৃষ্টি করেছেন।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান নামক' গ্রন্থে যে ৫১৭ টি গান সংকলন করেন বিভিন্ন পদকর্তার নামানুসারে এর মধ্যে ১৬০ টি লালন শাহের । এই গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায়ে বাউল গানগুলিকে বিশ্লেষণ করে পাঁচটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেন এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। এই পাঁচটি উপাদান হল—

১) বেদ বহির্ভূত ধর্ম;
২) গুরুপদ
৩) স্থূল মানবদেহের গৌরব.. ভান্ড ব্রক্ষ্মবাদ
৪) মনের মানুষ
৫) রূপ স্বরূপ তত্ত্ব।[১১]

বাউলরা কতগুলি তত্ত্ব উপর দাঁড়িয়ে আছে। তত্ত্ব গুলি হল - দেহ তত্ত্ব, আত্মা তত্ত্ব, রূপ স্বরূপ তত্ত্ব, গুরু তত্ত্ব, রস তত্ত্ব প্রভৃতি। এখন সংক্ষেপে তত্ত্ব গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

আত্মতত্ত্ব: আত্ম অন্বেষণে প্রত্যয়শীল লালনের গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে আত্ম কথা। আত্ম ও পরাত্মার তত্ত্ব সুফি মতবাদে ও বৈষ্ণব মতে প্রচলিত। বাউলেরা তাই আত্মা ও পরমাত্মার বিভেদ তো নয়ই বরং অদ্বৈত কল্পনা করে থাকেন। বাউল লালনের গানে এই ভাবে ধ্বনিত হয়েছে -

" আপনার আপন চিনেছে যে জন,
দেখতে পাবে সেই রূপের কিরণ,
সেই আপন আপন রূপ,সেবা কোনো স্বরূপ
স্বরূপের ও সেই রূপ জানিও কারন।
আত্মা দিয়া আত্মার করেরে ভজন" ।[১২]

আত্ম তত্ত্বের প্রদীপ জ্বেলেই লালন নিজেকে যেন খুঁজে ফিরে,' চোদ্দো পোয়া ' এই দেহে, কিংবা জীবন্ম ও পরাত্মার অপার মিলনের বাসনায় সীমাবদ্ধ আত্মা তত্ত্ব জ্ঞানে নিজের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করা আরেক বিস্ময়ের কাজ।তাই লালন বলেন -

"আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
তারে জন্মতর একবার দেখলাম না ।"[১৩]

দেহ তত্ত্ব : বাউল গানের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সাধন ঘটিত ক্রিয়াকর্মের রূপকের ছলে বর্ননা যা একান্ত দেহকে কেন্দ্র করে বিকৃত হয়েছে। অধ্যাত্ম সাধনার শ্রেষ্ঠা কিংবা

পরম পুরুষ কিংবা পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করে তার সঙ্গে মিলিত হবার প্রবল যে কামনা ব্যাস্ত হয়েছে তার মূল ক্ষেত্র হচ্ছে দেহ এবং দেহজ বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ সম্পর্কে সেতু নির্মাণ করে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে উপনীত হতে চান।[১৪]

দেহ মন আত্মার নশ্বর দেহকে অবিস্বর করে উপলব্ধি করে লালন বলেন -"এমন মানব জমিন রইলো পতিত চাষ করলে ফলতো সোনা ।" কিংবা তিনি দেহ খাচার পাখি আসা যাওয়াকে যেমন রুপকাশ্রমের আকর্ষণীয় করেছেন, তেমনি দেহের মধ্যে প্রতিনিয়ত উড়ে আসা এ পাখির প্রতি মোহ ও আসক্তি তাগের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন।

রূপস্বরূপ তত্ত্ব : রূপ বলতে আমরা একটা আকার বুঝি, স্বরূপ হলো যা রূপকে আশ্রয় করে থাকে এবং রূপের অভ্যন্তরে যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে আমরা স্বরূপ বলি। বাউলরা সারাজীবন ধরে রুপ থেকে স্বরূপে উত্তিন হওয়ার আধ্যাতিক সাধনায় মগ্ন থাকেন। মানব দেহকে আশ্রয় করে সাধন ভজন করে তাকে অর্থাৎ স্বরূপকে উপলব্ধি করাই এর চরম লক্ষ্য।দেহের মধ্যেই তারা ব্রহ্মাণ্ডকে কল্পনা করে। তারা প্রাকৃত দেহে রূপান্তরিত করে দেহের মধ্যেই পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে।বাউল গবেষক উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য সুন্দর ভাবে রূপ স্বরুপের তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন - জগতের পুরুষ ও নারীর যে ' রুপ ' তাহা তাহাদের বাহিরের ' রূপ ' । এই ' রূপ ' বা বিশিষ্ট আকৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে যে উহার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্ব, তাহাই ' স্বরুপ '।

গুরু তত্ত্ব: বাউল গুরুবাদী ধর্ম যেখানে গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ ও নির্দেশিত পথেই সাধন ভজন করে আগ্রহ হতে হয়। বাউলদের কাছে গুরু তাই পরম প্রাপ্তির বিষয়, সার্বভৌম শক্তির আধার।গুরু 'যিনি মুর্শিদ তিনি মাওলা' কিংবা ' গুরু তুমি পতিত পাবন পরম ঈশ্বর।' গুরু সিদ্ধ পুরুষ তার ভজনের মধ্য দিয়ে মাওলা কিংবা ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব। কেননা গুরু ছাড়া ' আরশি নগেরের পড়শী' কে চেনা যায় না ,' খাচার ভেতর অচিন পাখি ' কে ধরা যায় না ,আট কুঠুরি নয় দরজার হদিস পাওয়া যায় না ,জেন্তে মরার রহস্য উদঘাটিত হয় না , ' মহাজনের ধন তলে ' ছড়ানো হয় না উলুবনে, দ্বিতলের মৃনালে " সোনার মানুষ" সমন্ধে অবগত হওয়া যায় না।

এরূপ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এই পার্থিব জীবনে গুরুর কাছ থেকে পথ চিনিয়ে নিতে হয় ,আর জটিল সাধন চক্রকে বুঝিয়ে দিয়ে তিলে তিলে গুরু গড়ে তোলে তার শিষ্যকে।

শুধু শিষ্যের প্রয়োজন গুরুকে নয়, বরং উপযুক্ত শিষ্যের যে মনি কাজল যোগ হয় তাতেই ত্রিভুবনের রুপ স্বরুপ পরিলক্ষিত হয়। গুরু শিষ্য এ মিলনের চিত্রটি এভাবেই লালন উল্লেখ করেছেন।

গুরু বা মুর্শিদই তাদের শিষ্যদের সঠিক সাধনায় পরিচালিত করে। তাই লালন গুরু তত্ত্ব বলেছেন -

" মুর্শিদ বিনে কি ধন আর
আছেরে জগতে।।

মুরশিদের চরণ সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা,
কারো না দেলে দ্বিধা ,
যেহি মুর্শিদ সেহি খোদা।
বোঝ ' অলিয়ম মোরশদা '
আয়াত লেখা কোরানেতে । "[১৫]

রস তত্ত্ব : বাউল সাধনা হলো রসের সাধনা, জ্ঞানের বা কৃচ্ছের সাধনা নয়।এই জন্য বাউলরা নিজেদের অনুরাগী বলে পরিচয় দেয় ।বাউলরা রস উপলব্ধির মাধ্যমেই জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে বেড়ায়।একটি বাউল গানে সেই ভাব লক্ষ্য করে বলা যায় -

"অনুরাগ লইলে কি সাধ হয়
ভজন সাধন মূর্খ কর্ম,
ঐ দেখ তার সাক্ষী চাতক হে
অন্য বারি খায় না সে।"[১৬]

বাউল গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, বাউলদের প্রেম-প্রকৃতি পুরুষ মিলনাত্মক। প্রাকৃত দেহোৎপন্ন আকর্ষণ থেকে উদ্ভূত, দেহের উধ্বগত এক আত্মবিস্মৃতিময় অনুভূতি। দেহের বাইরে বাউলদের কোনো সাধনা নেই। তাঁরা অনুমান মানেন না, তাঁদের সবই বর্তমান। তাই বলা যায় যুগে যুগে দুঃসাধ্য সাধনার ভেতর দিয়েই তাঁরা মনের মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই মনের মানুষের অবিরাম সন্ধান তাকে পেতে সাহায্য করে। এই পাওয়ার মধ্যে দিয়েই বাউলরা তাঁদের জীবনের ঐশ্বর্য, জ্ঞান, কর্মপ্রসারতা লাভ করে থাকে। তাঁরা এই পাওয়ার মধ্য দিয়েই নিজের জীবনকে ধন্য বলে মনে করেন এবং নিজের জীবনকে ধন্য বলে মনে করেন এবং জীবনের পূর্ণতা লাভ করেন নতুন নতুন অঙ্গীকারে।

সূত্রনির্দেশ:

১) শ্রীসনৎ কুমার মিত্র (সম্পাদিত) 'বাউললালন রবীন্দ্র', পৃষ্ঠা -১ লালন শাহ,' বিবেচনা পূর্ণ বিবেচনা 'মুনশী আব্দুল মাননান বাংলা সাহিত্য ও লালন শাহ', পৃঃ -১১
২) উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য,' বাংলার বাউল ও বাউল গান', পৃঃ-৪০
৩) মনসুর মুসা (সম্পাদিত), মহম্মদ এনামুল হক রচনাবলি,প্রথম খন্ড 'বঙ্গে সুফি প্রভাব' ঢাকা : বাংলা একডেমী, ১৯৯৯, পৃঃ -১৬০
৪) অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন 'হারমনি' সপ্তম খন্ড, পৃঃ -৮
৫)ওয়ালিক আহামেদ, 'বাউল গান', ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, মার্চ, ২০০০, পৃঃ -১৫২
৬) উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', পৃঃ -৫৯৯
৭) তদেব - পৃঃ -৫৪৭
৮) ওয়াকিল আহমেদ 'লালনগীতিসমগ্র' ঢাকা, বইপত্র, ২য় প্রকাশ, পৃঃ -৫৫

৯) মহম্মদ আবূতামিক শাহ 'লালন গীতিকা' , ১ম খন্ড - ঢাকা একাডেমী - ১৯৬৮ , পৃঃ -২০৯
১০) ডঃ আনোয়ার ল করিম, 'বাংলাদেশের বাউল ' ,ঢাকা -২০০২, পৃঃ -৪৪৬-৪৪৭
১১) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য , ' বাংলার বাউল ও বাউল গান ' , কলকাতা, পৃঃ -২৯১-৩৬৮
১২) বাউল গান - পৃঃ -৫২
১৩) পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৫২
১৪)আনি সুত্তমান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' ,কলকাতা , প্রতিভাস সংস্করণ,১৯৯৯, পৃঃ -১৫১
১৫)ওয়াকিল আহমেদ, 'বাউল গান ' , ঢাকা-২০০৬ , পূর্বোক্ত, পৃঃ -৫৬
১৬) শ্রীসনৎ কুমার মিত্র, 'বাউল লালন রবীন্দ্র ' , পৃঃ -২৮

মানবতাবাদী রামমোহন ও তাঁর শিক্ষা চেতনা : একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

প্রশান্ত কুমার পাল
সহকারী অধ্যাপক, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ,
কলকাতা

সার সংক্ষেপ :

আজ থেকে প্রায় আড়াই শতক পূর্বে, যখন পুরাতন ধ্যান ধারণা, প্রথা প্রতিষ্ঠান ও আদর্শ প্রায় গুরুত্ব হারাতে চলেছে আর উনিশ শতক আধুনিক চিন্তাধারা এবং আদর্শের আবাহন করছে, ভারতবর্ষের সমাজও সংস্কৃতির এমনই এক ক্রান্তিকালে রামমোহনের অভির্ভব হয় (১৭৭২ খ্রি)। আর তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়েছে উনিশ শতকের প্রথম তিন দশক জুড়ে, যার উপকেন্দ্র ছিল "মেট্রোপলিটন কলকাতা।" দেশের সমাজ সংস্কৃতির রূপান্তরের যেবিশেষ পর্বে রামমোহন এলেন, যার বৌদ্ধিক বিকাশ হয়েছিল মূলত বিগত শতকে। তাই তাঁর মননে এবং চৈতন্যে এদেশীয় চিরাচরিত ধ্যানধারণা এবং বিশ্বাস অটুট ছিল।কিন্তু একই সাথে তিনি পশ্চিমের জ্ঞানের দরজাটাও উন্মুক্ত রেখেছিলেন। পশ্চিমের উদার গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ , যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞান ছাড়া যেএদেশর তথা বাংলার সমাজ এবং মনের সংকীর্ণতা ও দীনতার অবসান ঘটবে না, সেটি রামমোহনের মত কালদ্রষ্টা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন বাংলার সমাজ এবং ধর্মজীবনের পশ্চাদগামিতার মুলে যে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার তা দূরীকরনের এক এবং একমাত্র উপায় হল পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার। এই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই রামমোহন বাংলায় ইংরাজি শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হন। অবশ্য ব্রিটিশ শাসনের প্রসারের সাথে সাথে শাসন ও বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি জানা কেরানীর প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। ফলত: বাঙালী সমাজের একাংশের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি ঝোঁক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।প্রথম দিকে রক্ষণশীল সমাজ এবং এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সরকার বাহাদুর এই বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। তবু রামমোহন এবিষয়ে একান্ত উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। কলকাতার দলীয় কোন্দল, সরকারি ঔদাসীন্য, রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের চোখরাঙানি তোয়াক্কা না করে রামমোহন সরকারি এবং বেসরকারি মহলে ইংরাজি শিক্ষার সপক্ষে একটা জনমত গড়ে তুলতে থাকেন। সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারস্ত হন।

তার ঐকান্তিক প্রচষ্টায় ১৮১৭ খ্রি: কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ; অধুনা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন সংস্কৃতচর্চা অপেক্ষা ভারতীয়দের জন্য পশ্চিমী বিজ্ঞানচর্চা যে আশু প্রয়োজন, তা যেমন রামমোহন মানতেন তেমনি এও মানতেন যে প্রাচ্য বিদ্যা চর্চারও প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কলেজ ও অংলো- হিন্দু স্কুল -এর পাঠক্রম দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যে, প্রাচ্যের নৈতিক দর্শন এবং পশ্চিমের যুক্তিবাদের কী আশ্চর্য সমন্বয় রামমোহন ঘটিয়েছিলেন! আসলে তিনি

একই সাথে পশ্চিম এবং পূর্ব কে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। স্বর্গ থেকে আলো চুরি করে প্রমিথিউস যেমন মানবসভ্যতা কে আলোকিত করেন, তেমনি পশ্চিম থেকে জ্ঞানের বর্তিকা টি এনে রামমোহন কলজীর্ণ তমসাচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজ এবং সভ্যতাকে আলোকিত করেন। কিন্তু সেই আলোর বাইরে থেকে যায় শহর কলিকাতার চৌহদ্দির বাইরেথাকা অগণিত মানুষ। সুতরাং তাঁর শিক্ষার গণমুখী চরিত্র টা প্রায় অনুপস্থিতবলে মনে হয়। বাংলার নবজাগরণের এ যেন এক সাধারণ গড়পড়তা সীমাবদ্ধতা, যার থেকে রামমোহনও স্বয়ং মুক্ত ছিলেন না। আলোচ্য নিবন্ধে মানবতাবাদী সংস্কারক হিসেবে রামমোহনের শিক্ষা সংস্কার এবং তার পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমী রেনেশাসের প্রেক্ষিতে বাংলার সমকালীন সমাজ এবং শিক্ষায় রামমোহনের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

সূচক শব্দ: হিন্দু কলেজ, প্রমিথিউস, অ্যাংলো- হিন্দু স্কুল, বেদান্ত কলেজ, উত্তর - আধুনিকতা।

১৭৭২ খ্রি: দেশের এক ক্রান্তিকালে ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষটি এসেছিলেন। দেখতে দেখতে আড়াই শতক পাড় হয়ে গেল। টেমস এবং গঙ্গার জল অনেক গড়িয়েছে। আমরা এখন আধুনিক থেকে উত্তর আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছি। তাই রেনেসাঁস যে আধুনিকতা ও যুক্তিবাদের জন্ম দিয়েছিল তা এখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। সে হোক। তাই বলে কি আর আধুনিকতার ওই পর্বটিকে বাদ দিয়ে সমাজ এবং সভ্যতার ইতিহাস লেখা চলে? হ্যাঁ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেইযে, ইতালিতে যে রেনেসাঁস শুরু হয়, উনিশ শতকে বাংলায় তার ছিটে ফোঁটা মাত্র এসে পৌঁছায় এবং তাকেই আমরা বাংলার তথাকথিত বাংলার নবজাগৃতি বলে থাকি। এই নবজগৃতি অন্তত রেনেসাঁস ছিলনা। ওদের যেমন বুরখার্ড "সুপার স্ট্রাকচার" আর "সাবস্ট্রাকচার"-এর মোহে পড়ে ইতালির রেনেসাঁস কে পরিপূর্ণ জাগরণ বলতে অস্বীকার করেছেন, তেমনি এ দেশে সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষ , অমলেশ ত্রিপাঠী প্রমুখ বিদগ্ধ পন্ডিত বাংলার তথাকথিত নবজাগৃতিকে সম্পূর্ন একটি জাগরণ বলতে দ্বিধাগ্রস্ত। কেউ একে সরাসরি "half renaissance" কেউ আবার "Calcutta Renaissance" বলে মোটা দাগে চিহ্নিত করেছেন।[১] তার অর্থ এই নয় যে, রেনেসাঁসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন বাংলার তথাকথিত নবজাগরণে ছিলনা। ষোড়শ শতকের ইতিলীয় রেনেসাঁর সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্যটি নিঃসন্দেহে হিউম্যনিজম বা মানবতাবাদ, যাকে শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় " রেনেসাঁসের চাবিকাঠি "বলেছেন, তার মোদ্দা কথা: "a philosophy of education that favoured classical studies" বা একটু ভিন্ন অর্থে বললে " revival of learning"। মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক দর্শনকে সরিয়ে প্রাক - খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতি চর্চা ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তার জন্যই তাঁরা নতুন শিক্ষা দর্শনের কথা বলেছিলেন। [২]

রামমোহনকে যারা এক কথায় কট্টর পাশ্চাত্যপন্থী বলে দেগে দেন, তাদের মনে রাখা উচিত এই রামমোহন বেদান্ত কলেজ নিয়ে কম বাড়াবাড়ি করেন নি। প্রাচ্য তথা ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শন; মূলত বেদান্ত দর্শনের যৌক্তিকতা এবং গ্রহণ যোগ্যতা

নিয়ে তিনি শ্রীরামপুর মিশনারীদের সাথে তর্কেও ভিড়ে ছিলেন। আসলে রেনেসাঁসের যে মানবতাবাদী আদর্শের সাথে বাংলার নবজারণের মনস্তাত্বিক দর্শনের তুল্য মূল্য বিচার করা হয়ে থাকে তারও একটা ধর্মীয় ভিত্তি ছিল। তা না হলে রামমোহন, যাকে কিনা এ দেশে "রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক" বলে মনে করা হয়,[৩] তিনি হঠাৎ ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে এতো উদগ্রীব হয়ে উঠে ছিলেন কেন? আসলে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের মধ্যেই তিনি বর্তমানের যুক্তি খুঁজে ফিরে ছিলেন। ইতালীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা বলা চলে। ইতালীয় রেনেসাঁসের মত ধর্ম কে পরিত্যাগ করেনি, বরং যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে ঘষে মেজে আরো যুগোপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন। ইউরোপের একাধিক ধর্মীয় সংস্কারকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত সেক্যুলার ছিলেন না কিন্তু রেনেসাঁসের যে ধারাটিকে আমরা 'স্পিরিচুয়াল হিউম্যানিজম'[৪] বলি, রামমোহন সেই ধরার একজন পথিক ছিলেন। তাই তার চিন্তাধারায় ধর্ম বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। বাংলার নবজাগৃতির উপর পশ্চিমের অভিঘাত ছিল অবশ্যই কিন্তু একটা দেশজ শিকড় ছিল যা এদেশীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত ছিল, রামমোহনের পক্ষে তা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। মনে রাখতে হবে যে, রামমোহন লালনের সমসাময়িক, একজন শহুরে মধ্যবিত্ত, ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত, যিনি পশ্চিমের দরজাটি খুলে দিয়েছিলেন অবলীলাক্রমে,আর অন্যজন মাটির খুব কাছে ছিলেন। মানবতাবাদ সম্পর্কে দুজনের পথ ভিন্ন কিন্তু মূল আদর্শ কিন্তু একই। লালনের মত শয়ে শয়ে মরমিয়া সাধক (কর্ত্তাভজা, সহেব ধনী, সত্যপীর, দরবেশ, বাউল প্রভৃতি) বাংলায় গ্রামে গঞ্জে মানবতার গান গেয়ে চলেছিলেন, পুরাণ এবং কোরানের বাণীকে তাঁরা এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। রামমোহনের আগেই এঁরা পৌত্তলিকতা এবং জাতিভেদ ও পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু ও মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাঁধেনি।"[৫] বাংলার চালচুলো হীনএই অখ্যাত মানবতাবাদীদের প্রভাব রামমোহন কিভাবে অস্বীকার করতেন?

সুতরাং রামমোহনের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা আঠারো শতকের এমন একটা সময়কালে যখন পুরাতন আদর্শ ও ভাবধারা গুলো বাতিল হতে শুরু করলেও একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে যায়নি। আধা সামন্ততান্ত্রিক আর্থ -সামাজিক কাঠামোতে সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা ঈষৎ হ্রাস পেলেও প্রয়োজনীয়তা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে, ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরে পশ্চিমের উদার যুক্তিবাদী ভাবাদর্শ ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। এটা ক্রমশ অনুভূত হতে থাকে যে পুরোনো সঞ্চয়, পুরনো বিশ্বাসকে সম্বল করে দিন অতিবাহ করার যুগের অবসান ঘটেছে। রামমোহনএই দুই যুগের সন্ধিক্ষণে এসেছিলেন। এই দুই যুগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। কম করে ৯টি ভাষার উপর দখল ছিল তাঁর। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান বেনারসে সংস্কৃত চর্চা, পাটনাতে আরবী ও ফার্সি চর্চা করেছেন। এই সময় তাঁর সুফী মুতাজিলা সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসা। জৈন সন্ন্যাসীদের সাহচর্যে তন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা, পারিবারিক বিবাদ, ভারত ভ্রমন ইত্যাদি ঘটনা গুলো রামমোহনকে ভারতীয় সভ্যতার বহুত্ববাদী সংস্কৃতির সাথে আলাপ করিয়ে দেয়। ধর্ম সম্পর্কে তার একটা স্পষ্ট ধারনা গত শতকেই গড়েওঠে।

আর তার পরিশীলিত রূপ দেখতে পাই ১৮০৩ খ্রি: 'তুহাফৎ উল মুয়াহিদ্দিন' বা 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি' তাঁর আবেদনে। এ যেন বেদান্তেরই রকম ফের হিসেবে ধরা দেয় আমাদের কাছে। অন্যদিকে পশ্চিমের দরজাটিও তিনি খোলা রেখেছিলেন। বেন্থাম, হিউম, টম পেইন, জেমস মিলের মত উদারমনা দার্শনিক তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজ দর্শন দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। পাশ্চাত্যের উদার যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচেতনার এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় তাঁর চিন্তা ও চেতনায়। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা কেবল রামমোহনের শিক্ষা চেতনা পূর্ব এবং পশ্চিমের অভিঘাতের নির্যাস টুকুকে সংক্ষিপ্ত রূপে উত্থাপন করবো।

অ্যাডামের রিপোর্ট গুলো বাংলার দেশজ শিক্ষার এক বিশ্বস্ত দলিল। এখানে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে টোল, চতুষ্পদী, মক্তব, মাদ্রাসা গুলোকে আশ্রয় করে দেশজ শিক্ষার যে ধারাটি তখনও আন্তঃসলিলা ফ্লগু ধারার মত সতত গতিশীল ছিল তার এক বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অ্যাডাম নিজে এই শিক্ষা ব্যবস্থার ভগ্ন দশা এবং সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। সময়ের সাথে সাথে দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। ছাপা বইয়ের অপ্রতুলতা, মৌখিক পদ্ধতিতে পাঠ দান; পৌরাণিক ও মহাকাব্যের কাহিনীর উপর গুরুত্ব আরোপ ইত্যাদি কিছু সাধারণ সীমাবদ্ধতার কথা অ্যাডাম উল্লেখ করেছেন। [৬] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারযোগ্য কিছু প্রাথমিক গাণিত (সুধাকরের প্রাথমিক গণিত বিদ্যা) প্রভৃতিবিষয়ে প্রাথমিক কিছু জ্ঞানের হদিস দিলেও জ্ঞানদীপ্তির রসদ এখানে ছিল না। ছাত্রদের মনের খোরাক না থাকায় এই শিক্ষা কাঠামো তে তাদরে বৌদ্ধিক বিকাশের সম্ভাবনা ছিলনা। শিক্ষার্থীদের মননের এবং চিন্তনের পরিসর প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোতে ছিলনা বললেই চলে। অ্যাডামের কথায়: " there was nothing in this system of instructions which could awaken and expand the mind of young scholar and free it from the trammels of mere usage no higher intellectual cultivation, nothing to make the boys conscious of thier moral and social obligations."[৭]

অ্যাডামের রিপোর্ট গুলো প্রকাশিত হবার অনেক আগেই, খ্রিস্টান মিশনারি, শিক্ষিত উদারমনা বাঙালী এবং সাহেবদের বদান্যতায় কিছু স্কুল গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরে পশ্চিমী বণিক পুঁজির বিকাশ এবংমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীই কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে মূলত কাজ করতো। তারা দোভাষীর কাজ করতো। ফলে তাদের কাছে ইংরাজি শিক্ষা প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল। তাই সরকারি উদ্যোগে শুরু হবার আগেই মিশনারি এবং উদারমনা কিছু সাহেবের উদ্যোগে কলকাতায় বেশ কিছু স্কুল গড়ে ওঠে। ফিরিঙ্গী দের এমন অনেক স্কুলের কথা শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন। সেই স্কুল থেকে বাঙালী বাবুরা ইংরাজি শিখে সাহেবী কায়দা আয়ত্ত করেছে, সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। কিন্তু সে ইংরাজি সাহিত্য পাঠের উপযোগী ছিল না। এই সকল ফিরিঙ্গী স্কুলের অর্ধ শিক্ষিত বাঙালী দের ইংরেজির পাণ্ডিত্যের দৌঁড় কতটা ছিল তা সমকালীন কৌতুক এবং নকশা থেকে স্পষ্ট হয়। এক বাঙালি তার সাহেবের ঘোড়ার দানা চুরি করে টিফিন খেত। তাই জানতে পারেসাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দেয়: " ইয়েশ শার মাই হাউস

মার্নিং এন্ড ইবনিং টুয়েন্টি লীভস ফল লিটল লিটল পে, হাউ ম্যানেজ? - অর্থাৎ তার বাড়ি সকাল সন্ধ্যায় কুড়ি খান পাত পড়ে, এত কম বেতনে কিভাবে সে চালাবে। কিছু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি শব্দ শিখে সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করাই এদের মূল লক্ষ্য ছিল। তবে ডেভিড ড্রামণ্ডের বা সব্বর্নের অ্যাকাডেমির মত স্কুলও ছিল, যেখান থেকে ডিরোজিও, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষের মত ছাত্র শিক্ষালাভ করেছিলেন। [৮] তবে সেগুলো ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রমী। ফিরিঙ্গী স্কুল গুলো নিয়ে এতগুলো বাক্যব্যয়ের কারণ এই যে, বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি ক্রমাগত আগ্রহ বাড়ছিল, তা প্রামাণ্য। এমনকি রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠী; মূলত শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেবের দলও ইংরাজি শিক্ষার স্বপক্ষে ছিলেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

বাংলার শিক্ষায় ভারতীয়দের সবথেকে বড় এবং উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তিগত উদ্যোগ নিসন্দেহ ১৮১৭ খ্রি: হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। বাংলায় ইংরাজি শিক্ষার প্রসারে এটি একটি মাইল ফলক হয়ে আছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কে কেন্দ্র করেই বাংলার নবজাগৃতি আবর্তিত হয়েছে। আত্মীয় সভার এক অধিবেশনে ১৮১৬ খ্রি: ইংরাজি শিক্ষার জন্য কলকাতায় এমন একটি হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, যা ভারতীয় দের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হবে। রামমোহন, ডেভিড হেয়ার , বৈদ্যনাথ মুখার্জী প্রমুখ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।[৯] রামমোহনের গোড়া হিন্দু ধর্ম বিরোধী নীতির কারণে তিনি রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীতে প্রায় ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। ফলে ইংরাজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টি গড়ে তোলার জন্য একটি জনমত গড়ে তোলা এবং তা সরকারি মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় বৈদ্যনাথ মুখার্জির উপর। তিনি তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি হাইড ইস্ট কে আলোচ্য প্রস্তাবটি নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে একটি আলোচনা সভার আহবান জানানোর আর্জি জানান। আলোচনায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং কয়েক লক্ষ টাকা অনুদান সংগৃহীত হয়। অবশেষে ১৮১৭ খি: হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার মুখ্য উপস্থাপক কে বাদ দিয়েই।[১০] সেই সময়ের কলকাতার দলাদলি এবং কোন্দলের এতটাই বাড়াবাড়ি ছিল যে, কেউ ধর্মীয় অনুশাসনের বিরোধিতা বা প্রচলিত সামাজিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে সমাজ থেকে, গোষ্ঠী থেকে বহিস্কার করা হত। পিতার দিক থেকে রামমোহন ছিলেন ভঙ্গকুলীন। রামমোহনের মত ভঙ্গকুলীন (broken Kula) ব্রাহ্মণ, যিনি প্রায় একটা সেক্যুলার জীবনযাপনে অভ্যস্ত তাকে সহ্য করা রক্ষণশীল হিন্দু গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া শোভাবাজারের দেব পরিবার অব্রাহ্মণ ছিল। তাই এই দলাদলির আর্থ - সামাজিকদিক যেমনছিলতেমনি ছিল জাতিগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই[১১] ফলে রামমোহন কে সমাজ থেকে দলপতিরা প্রায় ব্রাত্য করে রাখে, ইংরাজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহমত হলেন। রামমোহন এই সব সংকীর্ণ দলীয় কোন্দল, ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া থেকে অনেক ঊর্ধে ছিলেন। বেন্থামের ভাব -শিষ্যের কাছে 'greatest good for the greatest number' টা অনেক বেশি গরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা কমিটি থেকে সেচ্ছয় সরে গেলেন রামমোহন। হিন্দু কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে তানিয়ে কম জল ঘোলা হয়নি, সে বিতর্কে না ঢুকেও বলা চলে যে, গোষ্ঠী গত দলাদলির বাইরেও হিন্দু কলেজের পঠন পাঠন এবং পরিচালন পদ্ধতি নিয়েও

রামমোহনের সাথে রক্ষণশীলদের বিরোধিতা ছিল, রামমোহন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কে একটি সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে চাইছিলেন, সেটা গ্রাহ্য করার মত উদার মন বোধয় সেই সময় ছিল না বললেই চলে।

ঔপনিবেশিক ভারতের শিক্ষা নীতি এবং পরিকাঠামো নিয়ে সরকারি মহলেও জল্পনা চলছিল সমান্তরাল ভাবেই। ১৮১৩ খ্রি: এর চার্টার সেই জল্পনা কে খানিকটা উস্কে দিয়েছিল। নেটিভ ভারতীয় দের বৌদ্ধিক বিকাশের দায় টি কোম্পানী এই প্রথম সরকারি ভাবে ঘোষনা করল চার্টারের মাধ্যমে এবং এবিষয়ে ১ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান অনুমোদন করলো। লক্ষনীয় বিষয় হল, এর দুটো সেকশন ছিল প্রথমটিতে বলা হয়, সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন আর দ্বিতীয় টিতে বলা হল, ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রসার ঘটানো।[১২] এই বিষয় দুটিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী কলে আমরা দেখবো বাঙালী বিদ্বৎ সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ভবিষ্যত শিক্ষার মাধ্যম এবং পাঠক্রম নিয়ে মোট তিনটি প্রথম মতামত লক্ষ্য করা যায়: প্রথমত গোষ্ঠী প্রাচ্যবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত এবং ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি পরকাষ্ঠা দেখিয়ে সংস্কৃত এবং আরবী ফারসী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়। General committee for public instruction এ এই গোষ্ঠীর দাপট মেকলের মিনিটস পর্যন্ত বজায় ছিল। দ্বিতীয় গোষ্ঠী মূলত পাশ্চাত্যপন্থী বা অ্যাংলিসিস্ট এবং ব্রিটিশ ইউটিলিটারিয়ান প্রশাসকরা। পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব এবং শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী এই গোষ্ঠী পশ্চিমী জ্ঞান এবং ইংরাজি ভাষাকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয়। বাঙালী ভদ্রলোক শ্রেণী বেশিরভাগই এই ইংরাজি শিক্ষানীতির সমর্থক ছিলেন। তৃতীয় একটি গোষ্ঠীও ছিল, যারা মূলত বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে বেশি কাজ করেছে।[১৩] হল্ট ম্যাকেঞ্জির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা মনে করতো মাতৃভাষায় শিক্ষা দান হল আদর্শ পথ। বাংলায় এটা নিয়ে অন্তত উনিশ শতকে খুব বেশি জনমত ছিলনা। রামমোহনের শিক্ষা চিন্তায় পূর্বোক্ত এই তিন পৃথক ধারাই কম বেশি এসেছে।

১৮১৩ খ্রি: এর চার্টার অ্যাক্টের পর প্রায় দুই দশক পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা নীতি ছিল মূলত প্রাচ্যবাদী ঘেঁষা। মেকলে তখনও তার মিনিটে কট্টর জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষনা দেন নি। কোম্পানী সরকার রাজ ভাষায় (সংস্কৃত) হিন্দুদের পাশ্চাত্য সাহিত্যের কারন সুধা পান করানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল এবং একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিচ্ছিল। তার কারন হিসেবে প্রশাসকদের প্রধান যুক্তি ছিল দেশজ ভাষার মাধ্যমে ভারতীয়দের নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষা দান। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি ইংল্যান্ডে এই শিক্ষা নীতির সপক্ষে বেশ মজবুত জনমত গড়ে তুলতে পেরেছিল উপর মহলে।[১৪] ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষার সপক্ষে একটি আর্জি পত্র লিখলেন তৎকালীন গভর্নর জনারেল লর্ড আর্মহার্স্টকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর কোথাও রামমোহনের সংস্কৃত ভাষা বা শিক্ষা বিরোধীতা প্রকাশ পায়নি। তিনি শুধু বলতে চেয়েছিলেন ভারতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চা এবং সংস্কৃত চর্চার ঐতিহ্য রয়েছে, ভারতীয়দের প্রয়োজন এমন এক শিক্ষা কাঠামো এবং পাঠক্রম যা তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামির ও কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মন এবং চেতনার উন্মেষে সাহায্য করবে। রামমোহন মূলত ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তার মধ্যে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, শরীর বিদ্যার পাশাপাশি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও

পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করার আবেদন জানান। আর এই পাঠক্রম পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিকাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব ছিল না। রামমোহন যেসময়ে এই বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষার প্রস্তাব রাখছেন, যখন ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ছিল না।[১৫] রামমোহনের এই আর্জি টেকে নি। কারণ General committee for public instruction তে প্রাচ্যবাদীদের প্রাধান্য ছিল। রামমোহনের আবেদনের প্রত্যুত্তরে তারা লিখলেন: " the letter was written by an individual whose opinion were well known to be hostile to those entertained by almost all of his countrymen". পরের বছর সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাহল। প্রতিষ্ঠান টিকে "an extensive philosophical apparatus",[১৬]হিসেবে তোল্লাই দেওয়া হল। রামমোহনের প্রস্তাব গৃহীত না হলেও তিনি একটা ধাক্কা দিতে পেরেছিলেন। General committee for public instruction - এ প্রাচ্যবাদীদের দাপট থাকলেও কোর্ট অব ডিরেক্টর অন্য সুরে গাইতে শুরু করলো। সরকারী শিক্ষানীতির সমালোচনা করে ১৮ই ফেব্রুয়ারি লিখলেন: " Government policy of promoting Oriental learning and plan of establishing institution for imparting the Hindu and Muslim learning as ' originally and fundamentally eroneous ."[১৭]

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে রামমোহন পাশ্চাত্যপন্থী। কিন্তু তিনি যদি তাই হতেন তাহলে তিনি বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেন? কেনই বা বেদান্ত দর্শন নিয়ে মিশনারীদের সাথে বিবাদে জড়ালেন? আসলে রামমোহন 'wisdom of past' কে কখনই পরিত্যাগ করেন নি। শুধু তার সাথে বিজ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে প্রচলিত শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'অ্যাংলো - হিন্দু স্কুল' এর পাঠ্যক্রমে কী ছিল না? পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ইংরাজি সাহিত্য এবং ইউরোপের ইতিহাস সবই পড়ানো হত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই স্কুলের কৃতী ছাত্র ছিলেন। রামমোহন এই স্কুলকে ইংরাজি শিক্ষার এমন একটি ইংরাজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চেয়েছিলেন যা মূলত দেশীয় চিরাচরিত ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।[১৮]

এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে রামমোহন পশ্চিমী শিক্ষা তথা ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের সপক্ষে ছিলেন এবং তার প্রচার ও প্রসারে যথাযথ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাই বলে তিনি কখনোই সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধীতাকরেন নি।বরং এর উল্টো ছবি চোখে পড়ে। তিনি যে 'অ্যাংলো - হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাতে ও পড়ানো হত। বিজ্ঞান বাংলাতে পড়ানো হত। বেদান্ত কলেজে সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলা ছিল পাঠ দানের মাধ্যম। রামমোহন নিজেই একাধিক বিজ্ঞান নির্ভর প্রবন্ধ লেখেন সংবাদ কৌমুদীতে। এছাড়া বাংলা ব্যাকরণ, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১৯] বাংলায় উপনিষদ গুলো তর্জমা করে জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করে তোলেন। রামমোহন কর্তৃক মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের এই উদ্যোগ টিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রেভারেন্ড উইলিয়াম অ্যাডাম: " No one saw more distinctly than Rammohan Roy the importance of cultivating the vernacular language of his countrymen as a most effectual medium of conveying instructions to them".[২০]

রামমোহন কে সমাজ এবং ধর্ম সংস্কারের স্বার্থে প্রায়শই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের সাথে বাক- যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছিল। রামমোহন তার সম্পাদিত পত্রিকা 'সংবাদ কৌমুদি' তে কখনো উপনিষদ আবার কখনো বা পবিত্র কোরান থেকে যুক্তি খুঁজে নিয়ে সামজপতি দের জবাব দিয়েছেন। এই ভাবে বাংলা ভাষা কে তিনি বিতর্কের বা প্রতর্কের ভাষা, সাবলীল প্রতিবাদের ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। [২১] তার লেখা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। হ্যালহেড বা উইলিয়াম কেরীর ইংরেজিতে লেখা ব্যাকরণ ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে সহায়ক হলেও তা বাঙালি দের জন্য উপযুক্ত ছিল না। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ছিল বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ। স্বয়ং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই ব্যকরণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[২২] বাংলা গদ্য বা কথ্য ভাষার একটা সাবলীল শৈলী নির্মাণ করেছিলেন রামমোহন। শ্রীরামপুরে বাংলা লেখার চল শুরু হলেও বাংলা ভাষায় মৌলিক লেখা শুরু রামমোহনের হাত ধরে। তাঁর হাত ধরেই বাংলা ভাষা সংস্কৃতের নিগড় থেকে ক্রমশ মুক্ত হতে শুরু করে। বেদান্ত গ্রন্থ তার দৃষ্টান্ত। তবে বাংলা তথা ভারতীয় কোনো সাহিত্যই জাতীয় সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ সাহিত্যের প্রধান উপাদান যে সৃজনশীলতা তার অভাব, সাহিত্য সৃষ্টিতে আঞ্চলিকতা থাকলে তা সম্ভব নয়। রামমোহন সেই দায়িত্ব নিয়ে বাংলা দেশে প্রথম গদ্য সাহিত্যের ভূমি পত্তন করেন। যুক্তি এবং বিবৃতির জন্য সর্বসাধারণের ভাষা দরকার, যা পরোক্ষে লোক শিক্ষাও দেয়, তা মূলত রামমোহনের তৈরী। তাঁর নির্মিত ভাষ্য গুলো তে সর্বসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এক নতুন যুগের সূচনা করে।[২৩]

রামমোহন যে সময় শিক্ষা নিয়ে রীতিমত পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন, সেই সময়টি নারী শিক্ষার ভ্রূণ পর্ব। নারী তখনও অন্তঃপুর বাসিনী অবগুণ্ঠনবতী। তাদের বাড়ির চার দেওয়ালের বাইরে আসা মানা। সীমিত কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবারে জেনানা মিশনারী বা বৈষ্ণবরা অন্দর মহলে যাবার অনুমতি পেত। সুতরাং নারী শিক্ষার ধারাটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে অত্যন্ত ধীর লয়ে চলছিল। রামমোহন নিজে নারী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, বরং তিনি ' অবলাবন্ধব' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে নারীদের সার্বিক উন্নতি বিধানে শিক্ষার গুরুত্বের বিষয়টি উত্থাপন করেন।[২৪] অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে ছেলে মেয়ে একসাথে পড়ার ব্যবস্থা ছিল। এই সব আয়োজন যথেষ্ট ছিল না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল সমাজ সচেতনতা। তা নিয়ে এসেছিল রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ। নারী শিক্ষা ও মুক্তি ছিল এদের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু তার জন্য আমাদের আলোচ্য শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে; যতদিন না তা একটা আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছে। নারীশিক্ষা প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও সে বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ না নেওয়াটা রামমোহনের সীমাবদ্ধতা। আসলে রামমোহন নারী মুক্তির জন্য আশু যে কাজ টি করতে চেয়েছিলেন তা হল নারীর সামাজিক পরিচিতি এবং পরিবারে নারীর সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা। সম্পত্তির অধিকারের দাবি (দায়ভাগ) প্রতিষ্ঠা করে রামমোহন সমাজে এবং সংসারে মহিলাদের মূল্যবোধ এবং আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার পথতৈরী করে দেন। [২৫]

ভারতবর্ষের ঋদ্ধিবান পরম্পরাগত সভ্যতার একান্ত নিজস্ব সাধনার ধারা আছে। বেদ ও উপনিষদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত তা প্রবাহমান। রামমোহন সেই ধারার

অন্যতম ধারক ও বাহক ছিলেন। ভারতবর্ষের এই চিরন্তন সত্ত্বা কে তিনি পশ্চিমের আলোয় নতুন করে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন।[২৬] কিপলিং পূর্ব এবং পশ্চিমকে সম্পূর্ন বিপ্রতীপ বলে ঘোষণা করেছেন। রামমোহন প্রাচ্যের ভক্তি দ্বারা পশ্চিমের বস্তুবাদী চেতনাকে পরিমার্জিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা চেতনায় সমন্বয়ের আদর্শ বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে ইশ্বর গুপ্তের তীব্র স্বদেশীকতা খোঁজা বৃথা। রামমোহন বাইবেলের আপৌরুষেয়তা মানেননি, তাই বলে তিনি এতোটা কট্টরও ছিলেন না যে 'বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুর ধরবেন'। তর্ক উঠতে পারে - রামমোহনের শিক্ষা চেতনায় ইসলাম কোথায়? তাঁর ধর্ম চেতনায় ইসলাম বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে কিন্তু ইসলাম আসেনি! তার দায় রাজার নয়। আমাদের সবার। বাংলার নবজাগরণ কে যদি তর্কের খাতিরে 'কলিকাতার জাগরণ' বলি, তাহলেও বলতে হয় মধ্যযুগের উত্তরাধিকার নিয়েই এই কলকাতার পত্তন। যত দিন গেছে কলকাতা তার মধ্যযুগীয় উত্তরাধিকার গুলো ঝেড়ে ফেলে আধুনিক হয়ে উঠেছে। নবাবী মেজাজ ছেড়ে কলকাতার একটা 'ইম্পিরিয়াল মেজাজ' তৈরি হয়েছে উনিশ শতকে। সেই মেজাজের সাথে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হিন্দু বণিকরা ইংরেজি শিক্ষা ও বিত্তের সোপান বেয়ে সামাজিক আভিজাত্যের উপরের ধাপে উঠেছে কিন্তু মুসলিমরা পারেনি।[২৭] বাংলার গ্রামে গুলোতেও একই চিত্র। চিরস্থায়ী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা হিন্দুদের শাসক আর মুসলিমদের তাদের অধীনস্থ প্রজাতে পরিণত করেছে। ফলে শহর থেকে গ্রামে সর্বত্রই সমাজের উপর মহলে হিন্দুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কারণেই দেখবো মীর মোশারফ হোসেন কে বাদ দিলে মুসলিম মনীষা নবজারণে নেই বললেই চলে।[২৮] তার দায় রামমোহনের নয়। রামমোহনের শিক্ষার গণভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বার বার। তার শিক্ষা গণমুখী শিক্ষা ছিল না। শিক্ষার গণভিত্তির জন্য যে ' পাবলিক ' দরকার উনিশ শতকে তা কোথায়? উনিশ শতকে কিছু ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালী এবং শ্বেতাঙ্গ - এই নিয়ে গড়ে উঠেছিল ' পাবলিক '। তাই 'পাবলিক ওপিনিয়ন', যাকে আমারা 'পপুলার উইল' বলি, তা মুলত এই শ্রেণীর ইচ্ছা। সিপাহী বিদ্রোহের আগে আমরা তার এই সীমিত চরিত্র দেখবো।[২৯] তাছাড়া, বাংলার তথাকথিত নবজাগরণের একটা মোটা দাগের দুর্বলতা হল এর ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা এবং এলিট চরিত্র। একে বাইপাস করে রামমোহন কেন, উনিশ শতকের কেউই কাজ করতে পারেননি। এটা রামমোহনের নয়, হয়তো সমগ্র উনিশ শতকের খামতি।[৩০]

আলোচনা শেষ করবো রামমোহনের বিশ্ববীক্ষা দিয়ে। এদেশে শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে রামমোহন ইংল্যান্ডে ও ভারতের বহু ইংরেজ বন্ধুর সাথে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ বা চিঠিপত্র মারফৎ যোগাযোগ করেন। জনমত গড়ে তোলার এ এক অপূর্ব কৌশল। পরবর্তী কালে 'মডারেট'বা কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্ব তা অনুসরন করেছিল। জাতির এক সংকটকলে এসে রামমোহন জাতির 'surrendered identity' র ধারণাকে নস্যাৎ করে নিজস্ব একটা সত্ত্বা নির্মাণ করেন।[৩১] তিনি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সাধারনের মধ্যে যে নৈতিকতাও মূল্যবোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা এখন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পলিটিক্সের দাপটে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে।[৩২] তাই 'তাঁর আর রাজা সাজা হল না'। ভারতপথিক রামমোহন জাতি ও ধর্মের উর্ধ্বে উঠে নিজেকে বিশ্বের নাগরিক করে নিয়েছিলেন। ৮ই এপ্রিল, ১৮৩১ খ্রি: থেকে ২৭ সে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩ খ্রি:- জীবনের এই

কতগুলো দিন তিনি ইংল্যান্ডে কাটিয়েছিলেন ইংরেজ বন্ধুদের সান্নিধ্যে। প্রবাসী বন্ধু মেরি কর্পেন্টার রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে যে সনেট খানি উৎসর্গ করেছিলেন, তার চেয়ে বড় সম্মাননা হয় না। আমরা ভারতীয় হয়ে তার কতটুকুই বা দিতে পারলাম?

"When from afar we saw thy burning light
Rise gloriously o'er India's darkened shore,
In spirit we rejoiced; and then still more
Rose high our admiration and delight...." [৩৩] *(M.C)*

সূত্র নির্দেশ :

১. Chittbrata Palit: Social History of Colonial Bengal, Avenel Press, Burdwan, 25 January, 2017 পৃ ১১৯

২. শক্তি সাধন মুখোপাধ্যায়: রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের আলোকে রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, 'জিজ্ঞাসা' প্রথম - চতুর্থ সংখ্যা, সম্পা, শিবনারায়ণ রায়, পৃ ১৩

৩. তদেব পৃ ১৭

৪. তদেব পৃ ১৭

৫. অমলেন্দু দে: বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা - ১২০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭ পৃ ৩

৬. Amitabha Mukherjee: Reform and Regeneration, Rabindrabharati University, June, 1968 পৃ ৬-৭

৭. Amitabh Mukherjee, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৯

৮. শিবনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বংসমাজ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা লি., জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ ৫১

৯. Chittbrata Palit: New Viewpoint on Nineteenth Century Bengal, progressive Publishers, Kolkata -73, June, 2006 p 181

১০. তদেব, পৃ ১৮১-১৮২

১১.. Sabyasachi Bhattacharya(ed): A Comprehensive History of Modern Bengal Vol-ii, article cited: Rammohan and His Times, Primus, 2020 p 122

১২. Amiya Kumar Sen: Raja Rammohan Roy: The Representative Man, Sadharan Bramho Samaj, Calcutta-6, 1990 , p 95

১৩. স্বপন বসু, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা.): উনশি শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তকবিপণী, নভেম্বর, ২০০৩, পৃ ২৩০-২৩১

১৪. Amitabha Mukherjee, op. Cit.., p95

১৫. Ibid.. p 96
১৫. ক. Ibid.. p. 97
১৬. Ibid.. p 95
১৭. Ibid.. p 97-98
১৮. Palit, New view point, p. 181
১৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায়: সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩০), বঙ্গীয় সাহিত্য - পরিষৎ, পৌষ, ১৪০৮, পৃ ৪৬৮
২০. Soumendra Nath Tegore: Raja Rammohan Roy (trans. by Somendra Nath Bose), Sahitya Academy, Calcutta, 1972,p 23-29
২১. Sumita chakraborty: Role and contribution of Raja Rammohan Roy, seminar presentation in a regional workshop organised by Ananya institute for development Research and social action, Lucknow. Venue: New alipore College, Dated: 4/05/23.
২২. Chittbrata Palit: New Viewpoint on Nineteenth Century Bengal, progressive Publishers, Kolkata -73, June, 2006 p 184
২৩. রণজিৎ গুহ: দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা, তালপাতা, আগষ্ট, ২০১০, পৃ১৩০
২৪. অবলাবন্ধব মাসিক পত্রিকা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১ম খণ্ড, কার্তিক, ১৩৮৫ সাল, ১ ম সংখ্যা, পৃ ২৮
২৫. Sabyasachi Bhattacharya(ed): A Comprehensive History of Modern Bengal Vol-ii, article cited: Rammohan and His Times, Primus, 2020 p 130
২৬. দিলীপ কুমার বিশ্বাস: রামমোহন-সমীক্ষা, সারস্বত লাইব্রেরী, মার্চ, ১৩৭৩, পৃ ৫-৬
২৭. বিনয়ঘোষ: মেট্রোপলিটন মন, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০০৯,পৃ ৮-৯
২৮. Amalendu De: Roots of Separatism in nineteenth century Bengal, Raktakarabee, Calcutta -9, June, 2008, p 31-31
২৯. রণজিৎ গুহ: দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা, তালপাতা, আগষ্ট, ২০১০।পৃ ১১৫
৩০. Sumit Sarkar: Critique of Colonial Bengal, papyrus, Calcutta -4, July, 1985.p
৩১. Chittabrata Palit, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১২১. Ericson তাঁর 'Identity, youth, crisis' নামক গ্রন্থে বলেছেন: " when a country or a power become victorious over another country with tremendous prowess, then the defeated country becomes the ' surrendered identity '. একটা পরাজিত জাতি তাই নিজস্ব জাতি সত্ত্বা হারিয়ে বিজয়ী দেশের জাতীয় সত্ত্বাধার করে। ভারত ব্রিটিশদের কাছে তার নিজস্ব জাতি সত্ত্বা বিকিয়ে ইংরেজী সংস্কৃতি রপ্ত করতে থাকে। রেনেসাঁস সংস্কৃতিকে অনেকেই তাই surrendered identity বলে চিহ্নিতকরেছেন।

32. রণজিৎ গুহ: দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা, তালপাতা, আগষ্ট, ২০১০, পৃঃ ১৩৪
৩৩. Mary Carpenter: The Last Days in England of the Raja Rammohan Roy, Riddhi, Calcutta -9, 1976, p 130

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়ার নারীদের অবদান

ড. মনোশান্ত বিশ্বাস
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সারাংশ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ১৯২০ এর দশকের শেষ থেকে গণ-আন্দোলনের চরিত্র গ্রহণ করেছিল, ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক পর্যায়ে এই আন্দোলনের তীব্রতা ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষত অসহযোগ ও আইন অমান্যের সময় গান্ধীর আবেদনে সাড়া দিয়ে নারীরা জাতীয় আন্দোলনের মুখ হয়ে দাঁড়ান। ইতিহাস প্রায়শই জয়ীদের বা মূখ্য নেতৃত্বের জয়গান করে। জাতীয় পর্যায়ে, ঘটনার গভীরে প্রবেশের দুর্বলতার কারণে অথবা 'জনপ্রিয়' মন্থনের মোহে অনেক সময় আঞ্চলিক গুরুত্বকে অবহেলা করা হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস মূলত উপর থেকে দেখার কারণে আঞ্চলিক পর্যায়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের নারীদের অংশগ্রহণের ইতিহাস আমাদের কাছে প্রায় অনালোকিত থেকে গেছে। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে নারীদের যোগদান বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শিরা-উপশিরায় সাংগঠনিক রূপ-রস, ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর-কঠিন ক্লান্তিহীন সংগ্রামী মনোভাব এবং দেশের প্রতি আত্মদানের বিষয়টি স্বাধীনতা আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দিয়েছিল। বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পূর্বেকার নারী-পুরুষ বিভেদ, বড় বড় শহরের গন্ডি আতিক্রম করে জেলা, মহকুমা ও গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে শিকড় বিস্তার করেছিল। এই সময় থেকে জাতীয় আন্দোলনে দুটি বিশেষ দিক উঠে এসেছিল, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কেবলমাত্র পুরুষদেরই অবদান ছিল এমন নয়, বরং গৃহের থেকেও নারীরা যে আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুতিতে এবং শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তা নদীয়া জেলার নারীদের, বিশেষত ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তেহট্টের খাজনা বন্ধের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে প্রমাণিত হয়। এই আন্দোলনের সাংগঠনিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশাসকদের চিন্তিত ও বিব্রত করে তুলেছিল। আলোচ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে নদীয়ার নারীদের অবদানের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

শব্দসূচক : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, নারী, অসহযোগ ও আইন আমান্য, নদিয়া, তেহট্টের খাজনা বয়কট।

ভূমিকা

উনিশ শতকে ইউরোপে যখন নারীরা তাঁদের আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম মুখী, বাংলা তথা ভারতের নারীসমাজ তখন পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যজনিত বন্ধনে আবদ্ধ, অশিক্ষা, সামজিক কুসংস্কারে নিমজ্জিত, আধুনিক 'সংস্কারের' ধারণা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছিল। এই শতকের শেষ দিকে ঔপনিবেশিক অভিঘাতে ব্রিটিশদের সংস্কারমূলক প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শহরের বুদ্ধিজীবী সমাজের দরদি মানুষেরা নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও কুসংস্কার দুরিকরণ এবং নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষিতা বঙ্গনারীরা ধীরে ধীরে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার এবং অর্থকারী পেশায় যোগদানের মাধ্যমে আত্মপরিচিতির প্রসার ঘটাতে থাকে। প্রথমদিকে পুরুষদের সহায়তায় নারী সংগঠন তৈরি হলেও পরবর্তীকালে আত্মপরিচিতির অনুসন্ধানের জন্যই সচেতনভাবে বিশেষত কলকাতা শহরে 'সখিসমিতি', 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল' 'আর্য নারী সমাজ', এবং 'সুমতি' এর মতো নারী সংগঠন গড়ে উঠেছিল যারা জেলা ও গ্রামীণ স্তরেও তাদের শাখা সংঘ প্রতিষ্ঠা করে নারীর উত্তরণের আদর্শ তুলে ধরেছিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারত তথা বাংলায় জাগ্রত নারী চেতনা সংগঠিত নারী আন্দোলনের রূপ নিতে শুরু করেছিল।[১] নারীদের এই আত্মচেতনার বিকাশ নিরবিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, আঞ্চলিক থেকে সর্বভারতীয়, শহর থেকে গ্রামীণ পর্যায়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। পারিবারিক পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য ভেঙ্গে সসম্মানে বাইরের সামাজিক কর্মে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণ ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে জাতীয়তাবাদী কর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেছিল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ১৯২০ এর দশকের শেষ থেকে গণআন্দোলনের চরিত্র গ্রহণ করেছিল, ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক পর্যায়ে এই আন্দোলনের তীব্রতা ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষত অসহযোগ ও আইন অমান্যের সময় গান্ধীর আবেদনে সাড়া দিয়ে নারীরা জাতীয় আন্দোলনের মুখ হয়ে দাঁড়ান। ইতিহাস প্রায়শই জয়ীদের বা মূখ্য নেতৃত্বের জয়গান করে। ঘটনার গভীরে প্রবেশের দুর্বলতার কারণে অথবা 'জনপ্রিয়তা' মন্থনের মোহে অনেক সময় আঞ্চলিক গুরুত্বকে অবহেলা করা হয়। আবার ইতিহাসে নারী চিরকালই ব্যতিক্রমের তালিকায়। এক ধরণের অবহেলা থেকে নারীর ইতিহাস রচনার প্রয়াস করা হলেও তাকে ইতিহাসের মূলস্রোতে জায়গা করে দেওয়া যায় না।[২] ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস মূলত উপর থেকে দেখার[৩] কারণে আঞ্চলিক পর্যায়ের এই আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস আমাদের কাছে অনালোকিত থেকে গেছে। তবে আঞ্চলিক আন্দোলন যে খুব বেশি সাফল্য লাভ করেছিল তা বলা না গেলেও বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শিরা-উপশিরা হিসাবে এই আন্দোলনগুলির সাংগঠনিক রূপ-রস, সংগ্রামী কর্মীদের ক্লান্তিহীন ব্রিটিশ শোষণের বিরোধিতা এবং দেশের প্রতি আত্মদানের বিষয়কে ছোট করে দেখার কারণ নেই। বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যেমন নারী-পুরুষ, বড় বড় শহরের গন্ডি অতিক্রম করে এই আন্দোলন জেলা, মহকুমা ও গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে শিকড় বিস্তার করেছিল। এই আন্দোলনে দুটি বিশেষ দিক উঠে এসেছে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কেবলমাত্র পুরুষদেরই অবদান ছিল এমন

নয়, বরং গৃহের অভ্যন্তরে থেকেও নারীরা যে আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুতিতে এবং শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তা নদীয়ার নারীদের, বিশেষত ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তেহট্টের খাজনা বন্দের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে প্রমাণিত হয়। এই আন্দোলনের সাংগঠনিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশাসকদের বিব্রত করে তুলেছিল। আলোচ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে নদীয়ার নারীদের অবদানের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদানকারী নদীয়ার বিদূষী নারী

প্রথম দিকে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রাণকেন্দ্র ছিল নদীয়ার কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগরের লালমোহন ঘোষ এবং মনোমোহন ঘোষ ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান সংগঠক। তাঁদের নেতৃত্বে নদীয়া জুড়ে ব্রিটিশ শোষণ বিরোধী প্রতিবাদী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁদের দক্ষ নেতৃত্ব নদীয়া জেলা আতিক্রম করে বঙ্গ এবং বঙ্গের বাইরেও গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৮৯৬, ১৯১৫ সালে এবং ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির তিনটি অধিবেশন কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হবার সুবাদে কৃষ্ণনগর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। শুধু তাই নয়, ১৮৯০ সালে মনোমোহন ঘোষ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং ১৯০৩ সালে লালমোহন ঘোষ মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।[৪] প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার অন্যান্য জেলার মতই পুরুষদের মধ্যে সক্রিয় ভাবে জাতীয়তাবাদী সংগঠনে অংশ নেওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তীকালে একাধিক মহিলারা সাধারণ কংগ্রেস কর্মী হিসাবে এবং নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও এগিয়ে এসেছিলেন। নদীয়াতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সক্রিয়ভাবে যোগদানকারী নেতৃত্ব স্থানীয় নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সরলা বালা দাস, বীণা দাস, অর্পণা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলনলিনী ঘোষ, ইন্দুনিভাননী বন্দ্যোপাধ্যায়, তেহট্টের বিপ্রচরণ দাসের কন্যা প্রমদা দাস, বীনাপাণি মজুমদার, নাকাশী পাড়ার যুগলপদ বিশ্বাসের স্ত্রী রোহিতবালা বিশ্বাস, শৈলবালা মজুমদার, বিভা দাস, সরযূ বালা সরকার, মৃনালিনী দে, বেথুয়া ডহরির বিহারীলাল সিংহের কন্যা সাবিত্রী সিংহ প্রমুখ।

বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নদীয়ার নারী সমাজ

নদীয়াতে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদ দুটি ধারাতে প্রবাহিত হয়েছিল। কংগ্রেস প্রভাবিত নরমপন্থী ধারা এবং সশস্ত্র-বিপ্লবপন্থী ধারা, যদিও উভয়েই উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। নদীয়ার মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আদর্শের সমন্বয় এই দুটি ধারাকে পুষ্ট করেছিল। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবীয় সাম্য, সহিষ্ণুতা ও অহিংসার আদর্শের সঙ্গে যেমন গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহের মিল ছিল। ঠিক একই রকম ভাবে বাংলায় জাতীয়তাবাদ ব্যাপক রূপে বিস্তারের পূর্বে ব্রিটিশ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস

ও দ্বিগম্বর বিশ্বাসের বৈপ্লবিক বিদ্রোহ এবং বিশে ডাকাত এবং ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিবাদ নদীয়ার সাধারণ মানুষের হৃদয়ে অগ্নিশিখা লালিত ছিল।[৫] নদীয়ার হরিণঘাটার চৌবেড়িয়ার(বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত) সন্তান দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণনগরের নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শান্তিপুরের কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায় দেশের জন্য আত্মত্যাগ এবং আত্মবলিদানের পরম দেশপ্রেমের আদর্শ উঠে এসেছিল।সারা বাংলার সঙ্গে সঙ্গে নদীয়াতেও স্বাদেশিকতা, দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের বিকাশ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। আবার নদীয়ার ছাত্র আন্দোলনেও গভীর ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

নদীয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত বেশ পুরোনো। তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসির রায়ের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগরে মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। আদালতের ঐ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেছিলেন নদীয়ার কৃষ্ণনগরের অ্যাডভোকেট এন. কে. বসু। বলাবাহুল্য সেই সময় রাজদ্রোহীদের পক্ষে আদালতে মামলা করা যথেষ্ট চাপের ছিল। নদীয়ার পোড়াগাছা গ্রামের বসন্ত বিশ্বাস, মুড়াগাছা হাইস্কুলের ছাত্র, তিনি বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিল্লীতে রাসবিহারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ১৯২১ সালে তিনি বড়লাটের উপর গুলি চালিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর ফাঁসি হয়। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মও ছিল নদীয়াতে। তাঁর চেষ্টায় কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর পেছনের মাঠে লাঠিখেলা, তলোয়ার চালনার যে 'আখরা' গড়ে উঠেছিল সেখানেই এক ঝাঁক তরুণ-তরুণীর বিপ্লবী মন্ত্রে হাতে খড়ি হয়েছিল।[৬] এই সময় নদীয়াতে একাধিক রাজনৈতিক ডাকাতির মাধ্যমে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছিল।

১৯৩০ এর দশকে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের উতাল হাওয়া নাদীয়ার মহিলাদের ঘরের বাইরে টেনে এনেছিল। মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'বাণী পাঠাগার'কে কেন্দ্র করে একঝাঁক নবীন তরুণী নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আশালতা দাস, বিমলপ্রতিভা দেবী, মোহিনী দেবী প্রমুখ। নদীয়া জেলা মহিলা সমিতি তখন বেশ সংগঠিত রূপে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। 'বাণী পাঠাগার' এই সময় ঢাকার 'জয়শ্রী সংঘ'র লীলা নাগের (রায়) প্রতিষ্ঠিত 'জয়শ্রী' পত্রিকার গ্রাহক হিসাবে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রচার করতে থাকেন, অবশেষে পুলিশ 'বাণী পাঠাগার' বন্ধ করে দেয়। নারীদের মনে পরাধীনতা মুক্তির আকাঙ্খার জন্ম দিয়েছিলেন এক বিদুষী নারী সরলাবালা দাস। নদীয়ার কাঁঠালপোতা গ্রামের সরলাবালা দাস (১৮৭৫-১৯৬১), পিতা কিশোরীলাল দাস কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ছিলেন, তাঁর স্বামী শরৎচন্দ্র সরকারের মৃত্যুর পরে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তিনি কোনো প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু সাহিত্য লেখনীর মাধ্যমে গ্রামীণ নারী সমাজের মানসিক উন্নতির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই কারণেই তিনি পিতার কাছে এবং বড়ভাই সরসীলাল সরকারের কাছে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেছিলেন, শুধু তাই নয়, তিনি তার পিতামহী রাইসুন্দরী দেবীর কাছে সাহিত্য পাঠ এবং সাহিত্য রচনার উৎসাহ পেয়েছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে 'ভারতী' পত্রিকাতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'প্রবাসী', 'জাহ্নবি', উদ্‌বোধন' অন্তঃপুর' সুপ্রভাত', প্রভৃতি নারী জাগরণকারী জাতীয়তাবাদী

পত্রিকাতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করে।[৫] সরলাবালার কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের ভাষা নারীর আত্মবিকাশে সাহায্য করেছিল। এমন কি তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতি সচেতন, আধুনিক ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সদস্য ছিলেন।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে যে নারী নদীয়ার মুখোজ্জ্বল করেছিলেন তিনি হলেন, বীণা দাস (১৯১১-১৯৮৬)। বীণা দাস নদীয়ার নারীদের বীরত্ব ও সংগ্রামের ইতিহাসকে বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, তিনি ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য নারী ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিকন্যা। তিনি ২৪ আগস্ট ১৯১১ নদিয়ার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অনুগামী পণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক বেণীমাধব দাস ও মাতার নাম সরলা দাস। তাঁর দিদি ছিলেন বিপ্লবী কল্যাণী দাস। পিতার আদর্শে প্রভাবিত হয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীশ ভৌমিকের সাথে তাঁর বিবাহ হয়।[৬] তিনি কলকাতার বেথুন কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। অসহযোগ এবং বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যোগ দেওয়ার কারণে তাঁর দাদা কারাবরণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনিও রাজনৈতিক মনস্ক হয়ে ওঠেন। সে সময় 'যুগান্তরদল' এর কতিপয় সদস্যের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্য বেথুন কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ১৯৩০ সালে ডালহৌসির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য ছোট ছোট দলের নেতৃত্ব দেন এবং গ্রেপ্তার হন। বীণা দাস ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের নেত্রী ছিলেন এবং ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর পিস্তল দিয়ে গুলি চালিয়ে ছিলেন এবং ধরা পড়ায় এই হত্যা প্রচেষ্টা চালানোর জন্য তাঁর নয় বছর কারাদন্ড হয়। তিনি পরবর্তীকালে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেসের সম্পাদিকা ছিলেন। নোয়াখালির দাঙ্গার পরে সেখানে তিনি রিলিফেরও কাজ করে ছিলেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পরেও সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে নিজেকে ব্যপ্ত রাখেন। মরিচঝাঁপি গণহত্যার সময় তিনি প্রতিবাদী হন। বীণা দাসের শেষ জীবন বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি হরিদ্বার চলেযান। ১৯৮৬ সালের ২৬ডিসেম্বর ঋষিকেশে সহায় সম্বলহীন হয়ে পথপ্রান্তে মৃত্যুবরণ করেন।[৭]

এছাড়াও নদীয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অর্পণা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাল্যকালে পিতা বৈদ্যনাথ অধিকারীর ও শিবকালী মণ্ডলের প্রতিষ্ঠিত 'তরুণ সংঘ' পাঠাগারে পড়াশুনার সময় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নদীয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য এবং নির্মলনলিনী ঘোষের প্রেরণায় স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল নিজের মেজোমামা বীরেন্দ্রবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ১৯৩১ সালে দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ অর্পণা বিপ্লবী পরিবারের মধ্যে থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন ও নদীয়ার নারীদের যোগদান

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আগমনের পর বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি নারীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদ এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সচেতন ভাবে অহিংস-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবাহকে সারা ভারতে গণসংযোগ করে মধ্যবিত্ত ও গ্রামীণ গৃহবধূদের কছে এনেদিয়েছিল।সারা ভারতে ঘরে ও বাইরের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বাঁধ অতিক্রম করার জন্য নারীদের মধ্যে এই সময় নতুন উদ্দীপনার সূত্রপাত হয়েছিল।[১০] মেয়েদের সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও সহ্যশক্তির উপর আস্থার কারণে গান্ধী নিজের অহিংসা-সত্যাগ্রহ নীতি কার্যকর করতে নারীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের আশা করে ছিলেন। রাওলাট সত্যাগ্রহ ও জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পর ১৯২০ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে অহিংস অসহযোগ আদর্শ কিছু কংগ্রেস সদস্যদের বিরোধিতা স্বত্ত্বেও নাগপুর কংগ্রেসে সরকারী উপাধি, আইনসভা, আদালত ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯২২ সালে সারা দেশে অহিংস অসহযোগ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রবল গতি সঞ্চার করেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুগামী নদীয়ার মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় এবং তৎকালীন যুবক ছাত্র নেতা বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল সত্যাগ্রহী কৃষ্ণনগরে অসহযোগ আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন নদীয়ার কৃষ্ণনগরের বাইরেও সমস্ত বিদেশী জিনিস বর্জন এবং গঠনমূলক স্বদেশী কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত করেছিল। কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর মহকুমার একাধিক গ্রামের বহু মহিলারা চরকা ও খদ্দরের তাঁত পরিচালনার মাধ্যমে অর্থোপার্জন করে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন। সত্যাগ্রহীরা কৃষ্ণনগরে ১৯২১ সালে নারী-পুরুষ মিলিত ভাবে জাতীয় বিদ্যালয় ও ‘গরবিনী কটেজ’ স্বরাজ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।[১১] হেমন্ত কুমার সরকারের একান্ত প্রচেষ্টায় ‘জাগরণ’ নামে নতুন পত্রিকা স্বদেশী ভাবনা প্রসারে সহায়তা করেছিল।

১৯২২ সালে নদীয়ার করিমপুর, ভেড়ামারা ও দৌলতপুরের কৃষকরা আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সময় কৃষকদের সঙ্গে মহিলারা, যেমন, বীণা দাস, অর্পণা বন্দ্যোপাধ্যায়, রোহিতবালা বিশ্বাস, শৈলবালা মজুমদারের মতো অগ্রগামী নারীদের জীবন-সংগ্রাম নারী-পুরুষ সকলকে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে সাহস জুগিয়েছিল। তাছাড়া গান্ধীর আদর্শ জাতীয় আন্দোলনের আঙ্গিনায় নারী-পুরুষ, ধর্মীয় সম্প্রদায় ও শ্রেণীগত ভেদাভেদের কঠিন দেওয়াল ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছিল।[১২] মারিও প্রেয়ার, দেখান যে গান্ধীবাদী আহিংস নীতি কিভাবে বাংলার নারীদের মনে আশা জাগিয়েছিল এবং তাঁরা ধীরে ধীরে গান্ধীর অনুগামী হয়ে উঠেছিলেন।[১৩] অসহযোগ আন্দোলনের প্রক্কালে নদীয়ার শান্তিপুরে, রানাঘাটে, চাকদহে, নবদ্বীপে তাহেরপুরে, হরিণঘাটায়, কৃষ্ণগঞ্জে, মুড়োগাছা এবং মাঝদিয়াতে কংগ্রেসের ‘মহিলা সমিতি’ গঠিত হয়েছিল। নদীয়া জেলা কংগ্রেসের জাতীয়াতবাদী আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারীরা স্বেচ্ছায় প্রচারকার্যের যুক্ত থেকে, অথবা চাল ও পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। এই সময় নদীয়া ‘সেবক সংঘের’ চেষ্টায় বহু অজানা নারীদের সাহায্যে ‘দরিদ্র ভান্ডার’, ‘সৎকার সমিতি’, ‘সাধনা লাইব্রেরী’ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের

নেতৃত্বে নদীয়ায় স্বরাজ্য পার্টির সাফল্য এসেছিল এখানের নারী-পুরুষদের মিলিত বিপুল সমর্থনের ফলে। প্রাক-নির্বাচন কালে তিনি কৃষ্ণনগরে আসেন, ১৯২৬ সালে অ্যানি বেসান্ত এর আগমনে নারীদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

নদীয়ায় নারীদের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন

১৯২৯ সালে কংগ্রেস কর্তৃক 'পূর্ণ স্বরাজ' ঘোষিত হওয়ার পরে প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারি সারা দেশে 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা হত। নদীয়ার নারীদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী গণ-সংগ্রামের সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় হল ১৯৩০ এর দশকের আইন অমান্য আন্দোলনের পর্ব। 'স্বরাজ' ও 'পূর্ণ স্বাধীনতার' আদর্শে সারা ভারতের মতো নদীয়াতেও একই সঙ্গে অহিংস সত্যাগ্রহ এবং বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে অভূতপূর্ব মুক্তির নেশায় ব্রিটিশ বিরোধী উন্মাদনা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। নদীয়ার যুবক-যুবতী ছাত্র সমাজ তীব্র আন্দোলনে সমস্ত রকম বাঁধ ভেঙ্গে একাত্ম হয়েছিল সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৩০ সালে ৬ই এপ্রিল জাতীয় কংগ্রেস 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের' স্মরণে 'জাতীয় সপ্তাহ' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়, গান্ধীর নেতৃত্বে ডান্ডি অভিযানের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হলে, অন্যান্য এলাকার মতো কৃষ্ণনগরেও তারকনাথ দাস, অন্নদানন্দ দাশগুপ্ত, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেশ বিশ্বাস এবং কাশীনাথ মজুমদার প্রমুখের নেতৃত্বে সারা জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের প্রচারাভিযান শুরু হয়। এই আন্দোলন দ্রুত সারা জেলার কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সুরেশ রায়ের রচিত 'ওঠরে চাষী, জগৎবাসী, ধর কষে নাঙল, চাষী ধর কষে নাঙল। মোরা মরতে আছি ভালো করে মরব এবার চল'[১৪] গণ-সঙ্গীতটি সাধারণ মানুষদের স্বেচ্ছায় আন্দোলনমুখী করে তুলেছিল। এই সময় কুষ্টিয়ার প্রচুর মহিলাসহ একদল সত্যাগ্রহী কৃষ্ণনগর হয়ে মেদিনীপুরের কাঁথি অভিমুখে যাত্রা করে। কৃষ্ণনগরে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কপালে তিলক চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছিলেন নির্মলনলিনী ঘোষ। সেদিন বহু অজানা-অচেনা নারীদের সঙ্গে নিয়ে নদীয়ার 'সত্যব্রতী দল' লবন আইন ভঙ্গের জন্য কালিকাপুরের উদ্দেশ্য রওনা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে গান্ধী নারী-পুরুষ সকল ভারতবাসীকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানান। তিনি ১৯৩০ সালের ১০ই এপ্রিল 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকাতে "To The Women of India" শিরোনামে একটি লেখায় আইন অমান্য আন্দোলনে নারীদের যোগদানের মাধ্যমে রাস্তায় নেমে বিদেশি পোষাক, মাদক ও বিদেশি দ্রব্য বর্জন এবং পিকেটিং করার আহ্বান জানান।[১৫] কলকাতার সঙ্গে নদীয়াতেও তাঁর এই ঘোষণার প্রভাব পড়েছিল। গান্ধী মনে করতেন যে,'women as the epitome of non-violence' তিনি বলেছিলেন, 'If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior... If non-violence is the law of our being, the future is with woman'[১৬] নারীদের প্রতি গান্ধীর এই বিশ্বাস এবং আস্থা বাংলা তথা নদীয়ার নারীদের একাংশকে গান্ধীবাদী করে তুলেছিল। ১৯৩০ সালে সুভাষ চন্দ্র বসু যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তদানীন্তন সভাপতি তখন নদীয়ায় 'একটি মহিলা সভায়' আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের আবেদন

জানালে অর্পণা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বর্ণাভরণ খুলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে অর্পণা বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রচারকার্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক বীরেশ্বর বসু যখন নিজ চাকরী ছেড়ে আন্দোলনে যোগদান করেন তখন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুপ্রীতি মজুমদার প্রভাবিত হয়ে ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং মাত্র ১২ বছর বছর বয়সে আইন অমান্য করার জন্য একমাস কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। এছাড়াও বেথুয়াডহরীর বিহারীলাল সিংহের কন্যা সাবিত্রী সিংহ ১৯৩০ সালে নাকাসীপাড়া মহিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা ছিলেন। নাকাসীপাড়ার নারীদের সংগঠীত করার দায়িত্ব স্বেছায় নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বীনাপাণি মজুমদার ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরের জাতীয়তাবাদী মহিলা সংগঠনের সক্রিয় সদস্যা ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে নির্মলনলিনী ঘোষের সঙ্গে তিনি বাড়ি বাড়ি প্রচারের মাধ্যমে নারীদের আন্দোলনে সামিল করা এবং প্রত্যহ প্রভাতফেরির মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী জনমত গঠনে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাছাড়াও কৃষ্ণনগরের বিপ্লবীদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন।

উনিশ শত তিরিশের দশকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন নদীয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বেশ পরিচিত মুখ। তাঁর স্ত্রী শৈলবালা মজুমদারের চেষ্টায় তাঁদের বাড়িটি স্বদেশী ও বিপ্লবীদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। তিনিও ১৯৩০ সাল থেকে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। একদিকে নানা অভাব-অনটনের মাঝেও স্বদেশীদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতেন অন্যদিকে কৃষ্ণনগরের পথে পথে ঘুরে নির্মলনলিনী ঘোষ, বিভা দাস, সরযূ বালা সরকার, বীণাপাণি মুজমদার, ইন্দুনিভাননী বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃনালিনী দে প্রমুখ মহিলাদের নিয়ে তিনিই প্রথম কৃষ্ণনগর মহিলা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগঠনের নতুন প্রজন্মের মহিলাদের প্রভাবে পরবর্তীকালে নদীয়ার নারী আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৎকালীন নদীয়ার জনপ্রিয় বিপ্লবী নেত্রী সুপ্রীতি মজুমদার ১৯৩২ সালে যখন আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু হয়েছিল তখন তাঁকে জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকেই তিন মাসের জন্য স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে আবার যখন কস্তুরাবাই গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা দেশে মহিলাদের প্রতিবাদী পদযাত্রা এবং 'মিছিল আন্দোলনের' সূত্রপাত হয়েছিল, কৃষ্ণনগরে তিনি এই মিছিল আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। সেই কারণে ১৯৩২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমা শাসকের আদেশে তাঁকে তিনমাসের কারদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।[২৭]

অর্পণা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩১ সালে নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলনের অন্যতমা সংগঠিকা এবং অভ্যর্থনা কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা ছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে নদীয়ার প্রথম মহিলা পাঠাগার, 'বাণী পাঠাগারের সম্পাদিকা ছিলেন। তৎকালীন সময়ে নদীয়ার মহিলাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আশালতা দাস, বিমল প্রতিভা দেবী এবং মোহিনী দেবী। অর্পণার নেতৃত্বে নদীয়ার শান্তিপুরে, রানাঘাটে, চাকদহে, নবদ্বীপে তাহেরপুরে, হরিণঘাটায়, কৃষ্ণগঞ্জে এবং মাঝদিয়াতে মহিলা সমিতি গঠিত হয়েছিল। নদীয়া জেলা

কংগ্রেসের সহ-সম্পাদিকা, বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেসের সদস্যা ও মহিলা কংগ্রেসের উপসমিতির সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন নবদ্বীপ ও মেহেরপুরে ব্যাপক আকার নিয়েছিল, ১৯৩০ সালের শেষে নদীয়াতে প্রায় ৩৫০-৪০০ জন সত্যাগ্রহী কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছিল।[১৮] কৃষ্ণনগরে জেলা কংগ্রেস কমিটি শহর যুব ছাত্র পরিষদ এবং মহিলা কমিটি সংগঠক হিসেব দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। জেলার সর্বত্র মদ, গাজা বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা এবং শোভাযাত্রার মাধ্যমে আইন অমান্যকারীরা লবন প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়। স্থানীয় প্রশাসন প্রচন্ড দমনমূলক নীতি নেওয়া স্বত্বেও সত্যাগ্রহীরা ১৪৪ ধারা অতিক্রম করে আইন ভেঙ্গে গ্রেপ্তার বরণ করে। সরকার নদীয়ার মহিলাদের গ্রেপ্তার না করার নীতি নিলে, কংগ্রেস নারীদের সাংগঠনিক চেষ্টাকে কাজে আন্দোলনের গতিবৃদ্ধি করার কৌশল গ্রহণ করেছিল। এই সময় নির্মলনলিনী ঘোষ, ভারতীয় খ্রিস্টান মহিলা মিসেস নট এবং বীণাপাণি মজুমদার আইন অমান্য আন্দোলনে নারীদের যোগদানের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের প্রেরণায় শৈলবালা মজুমদার, অর্পণা অধিকারী, সরযূ বালা, কুষ্টিয়ার অমিয়া সান্যাল, মৃণাল দেবী, আশা অধিকারী,এবং নবদ্বীপের হেমাঙ্গিনী দেবী প্রমুখ পুলিশ-বাহিনীর নির্যাতন উপেক্ষা করে ১৪৪ ধারা অতিক্রম করে জাতীয় পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা চালিয়ে যান। ১৯৩২ সালে গান্ধী আরউইন চুক্তির পূর্বে পর্যন্ত নদীয়াতে আইন অমান্য আন্দোলন অব্যাহত ছিল। বিপ্লবীরা এই সময় ভগৎ সিং এর ফাঁসি রদ এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে নতুন করে বিপ্লবী কাজকর্মে লিপ্ত হয়। বিপ্লবীরা কৃষ্ণনগরের পুলিশ সুপারের ঘরে বোমা নিক্ষেপ করে। এই সময় নদীয়া জেলা মহিলা সমিতির সভানেত্রী কৃষ্ণনগরের আশালতা দাস, বিমলা প্রতিভা দেবী, নির্মলনলিনী, বিভা দাস প্রমুখ একাধিক সভা সমিতিতে বন্দীদের মুক্তির দাবি তুলেছিলেন।

তেহট্টের খাজনা বন্ধের সত্যাগ্রহে নারীদের অংশগ্রহণ

১৯৩২ সালে যখন নদীয়ার জেলা কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল,তাঁর প্রতিবাদে সারা নদীয়া জুড়ে ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। জেলা কংগ্রেস কমিটিকে বেআইনি ঘোষণা করলে তার প্রতিক্রিয়া পড়েছিল নদীয়ার তেহট্টতে ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনের উপর। এই সময় নদীয়ার তেহট্টতে ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় যোগদানের বিষয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বীরেশ্বর বসু সর্ব প্রথম নদীয়ায় কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণার প্রতিবাদ করে কারাবরণ করেন। গান্ধীর স্ত্রী কস্তুরী বাই কে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে নির্মলনলিনী কৃষ্ণনগরের নারীদের সংগঠিত করে শোভাযাত্রা করেছিলেন। ১৯৩২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি 'পতাকা সত্যাগ্রহের' সময় কৃষ্ণনগরে ইন্দুনিভানী দেবী এই সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১৯] তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিমলা ভট্টাচার্য, সুনীতি ঘোষ প্রমুখ। এই আন্দোলনের সময় ত্রিশ জন মহিলা সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

১৯৩২ সালে ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতিকে স্মরণ করেই তেহট্টের 'চাঁদের হাট' গ্রামে খাজনা বন্ধের আন্দোলনের সূচনা করে ছিলেন নদীয়ার জেলার নেতা

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীকুমার মোদক প্রমুখ। এই আন্দোলন কর্মসূচি হিসাবে প্রথমেই সমস্ত রকম চৌকিদারী কর দেওয়া বন্ধ করা হয়। ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনে মূলত তেহট্টের মহিলাদের ভূমিকা বীরত্বপূর্ণ ছিল। তাছাড়াও কৃষ্ণনগরের মৃণালিনী দেবী ও সাবিত্রী দেবী ছিলেন উল্লেখযোগ্য নারী নেতৃত্ব। তাঁরা গ্রামীণ নারী বাহিনী তৈরী করেছিলেন। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নির্মম ভাবে মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের ও মহিলা কর্মীদের পিকেটিং করার সময় চুলের মুঠি ধরে ও রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখে।[২০] এর প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় অনেক চৌকিদারও পদত্যাগ করেছিল। চাঁদের হাটের তুষ্টু প্রামাণিক ও সতীশ বিশ্বাসের নেতৃত্বে এই আন্দোলন আরো তীব্র আকার নিয়েছিল। নির্মল নলিনী, সাবিত্রী দাস ও মৃণালিনী সান্যাল সহ ১৪ জন মহিলা এই আন্দোলনে কারাদন্ডিত হয়েছিলেন।

১৯৩২ সালের ২৯শে জুন তেহট্টতে জেলা কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস প্রায় বিশ হাজার লোক নানা সরকারী বাধা অতিক্রমণ করে এই সভায় যোগদান করেছিল। সেদিনের তেহট্টতে জেলা কংগ্রেসের সম্মেলন ছিল জনগণের ক্ষোভ প্রকাশের বধ্যভূমি। জনগণের বিশালতা প্রশাসকদের আতঙ্কিত করে তোলায় এই সম্মেলনে পুলিশ গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুলিশে গুলি চালানোর প্রতিবাদে সারা নদীয়া জুড়ে তীব্র গণ-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। নবদ্বীপে হেমাঙ্গিনী দেবীর নেতৃত্বে নবদ্বীপ সদর মহকুমা অবরোধ করা হয়েছিল। পলাশী পাড়ায় নির্মলনলিনী ঘোষ, সাবিত্রী দাস, শশী বিশ্বাস ও গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। খাজনা বন্ধের এই আন্দোলনের প্রতিবাদী অগ্নিশিখা ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত নদীয়ার মানুষদের উত্তপ্ত করে রেখে ছিল। তেহট্টের বিপ্রচরণ দাসের কন্যা প্রমদা দাস ১৯৩২ সালে চাঁদের হাটে 'খাজনা বন্ধ' আন্দোলনের সময় স্থানীয় অঞ্চলের নারীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করে ছিলেন। সেই সময়ে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তিন মাস জেল খাটেন। আবার ১৯৩৩ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে তেহট্ট থেকে হাঁটাপথে কৃষ্ণনগর আসেন, কৃষ্ণনগরে আসা মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করে ছয় মাস কারাদন্ড দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে নাকাশী পাড়ার যুগলপদ বিশ্বাসের স্ত্রী রোহিতবালা বিশ্বাস খাজনা বন্ধের সত্যাগ্রহের দিনগুলোতে গ্রামীণ নারী সংগঠনের অন্যতম পুরোধা হিসাবে উঠে এসেছিলেন।[২১] তিনি পারিবারিক দিক দিয়ে বিভূতিভূষণ বিশ্বাস ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের এবং নদীয়ার তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা রামাপদ রাহা ও পঞ্চানন সিংহরায়ের কাছে থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করে ছিলেন। ১৯৩২ সালে তেহট্টের খাজনা বন্ধ আন্দোলনে যোগদান করে সাত মাস কারাদন্ড ভোগ করেছিলেন। অন্যদিকে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী সাবিত্রী সিংহ ছিলেন সুবক্তা, তেহট্টের খাজনা বন্ধের আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর জ্বালাময়ী বক্তব্য এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। ১৯৩২ সালে নাকাসীপাড়াতে শতাধিক মানুষের সমাবেশে 'স্বাধীনতা দিবস' পালনের সময় এবং প্রকাশ্য জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার অপরাধে এবং আন্দোলন সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে সেই সময় গ্রেপ্তার করা হয় এবং মেহেরপুর মহকুমার হাকিম আদালতে বিচারে ছয় মাস কারাদন্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন ও নদীয়ার নারী সমাজ

১৯৩৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদ সুভাষচন্দ্র বসুর থেকে সরে আসা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের প্রভাবে বাংলার রাজনীতিও বহুধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিকে কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষ বসু ও শরৎ বসুকে কেন্দ্র করে মনোমালিন্য বঙ্গীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকাশ্যে চলে আসে, অন্যদিকে ১৯৪০ এর দশকে বাংলায় মুসলিম লিগের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে যা আগে ছিল না। প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে সুভাষ বসুর প্রভাব ছিল ব্যাপক, কিন্তু তিনি দেশ ত্যাগ করায় সংগঠন তৈরীর বিষয়টি অধরা থেকে গিয়েছিল। ফলে তাঁর তৈরী 'ফরওয়ার্ড ব্লক' ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে বিশেষ জমি প্রস্তুত করতে পারেনি। বাংলার নারীরা এই সময় বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ঢাকায় লীলা রায় জয়শ্রী সংঘের মাধ্যমে সুভাষ বসুর আদর্শ বিস্তারের চেষ্টা[২২] করলেও এই সংঘ বাংলার অন্য জেলা গুলিতে বিশেষ পরিচিত ছিল না। তবে নদীয়ার নারীদের একাংশের মধ্যে লীলা রায়ের বিপ্লবী কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ ছিল। কারণ কৃষ্ণনগরের 'বানী পাঠাগার' লীলা রায়ের সম্পাদিত 'জয়শ্রী' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিল। ১৯৪২ সালে তেহট্টের বিচরণ দাসের কন্যা প্রমদা দাস সক্রিয়ভাবে ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এর আগে ১৯৩৩ সালে কলকাতা প্রদেশ কংগ্রেসের অধিবেসনে যোগ দিতে যাওয়ার সময় কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তখন তাঁকে বহরমপুর জেলে ছয় মাস কারাদন্ড ভোগ করতে হয়েছিল। বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তিনি কুমিল্লার 'অভয় আশ্রমে' লাবণ্যলতা চন্দ, যমুনা ঘোষ এবং প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে দেড় বছর ধরে ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গঠনমূলক কাজে লিপ্ত ছিলেন।[২৩] ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় পিকেটিং করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দেড় বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল। পরে বীরভূমের সিউড়ী আদালত থেকে তাঁর মুক্তি হয়।

১৯৪৬ সালে সারা বাংলায় কৃষকদের নেতৃত্বে জমিদার-জোতদার বিরোধী তেভাগা আন্দোলন স্বাধীনতার অন্তিম পর্বে ব্যাপক গণ-জাগরণের সৃষ্টি করেছিল।[২৪] এই আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবের। কিন্তু উল্লেখযোগ্য গবেষণার অভাবে নদীয়ার তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিমিতি যেমন জানা যায় না। বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে নারী-শ্রমিকদের প্রেক্ষিতে দেখতে গিয়ে সুনিল সেন লিখেছেন, ১৯৪৬ সালে কলকারখানার শ্রমিকদের ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক ধর্মঘট দেখা দিয়েছিল তেমনটি ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এই সময় বড়ো বড়ো কারখানায় নারী শ্রমিকদের তেমন চোখে পড়ে না। আন্দোলনে প্রভাবতী দাশগুপ্তা ও সন্তোষ কুমারীর মতো নেতৃদের দেখা যায় নি বরং মৈত্রেয়ী বসু, সুধা রায়, বীনা দাস (ভৌমিক) অহল্য রাঙ্গনেকার ও গোদাবরী পারুলেকর এর মতো নেতৃত্বদের সর্বভারতীয় পর্যায়ে দেখা যায়।[২৫] কিন্তু এই সময় নদীয়াতে কৃষক সংগ্রাম তথা তেভাগা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কেও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার অভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার শ্রমিক আন্দোলনে নদীয়ার নারীদের অবস্থানও অনালোকিত।

উপসংহার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নদীয়ার নারীদের অবদান ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং আঞ্চলিক পর্যায়ে নারীদের সাংগঠনিক দৃঢ়তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যা বৃহত্তর জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করেছিল। নদীয়ার জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা মনমোহন ঘোষ এবং লালমোহন ঘোষ এর হাত ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। গান্ধীর আদর্শের প্রভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন ১৯২০ এর দশকের শেষ থেকে গণ-আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করার ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক পর্যায়ে এই আন্দোলনের তীব্রতা ছড়িয়ে পড়েছিল। নদীয়াতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের আগমন ঘটেছিল পুরুষদের সহযোগী হিসাবে। কিন্তু ১৯৩০ এর দশকে নদীয়ার নারীদের মধ্যে মহিলা সমিতি গুলি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রনের বিষয় সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। বৃহত্তর বাংলার মতই 'জন পরিসরে মহিলাদের উত্থানে প্রাথমিক পর্বে পিতৃতান্ত্রিক প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও ধীরে ধীরে তা লোপ পাচ্ছিল এবং মহিলাদের স্থান ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছিল'[২৬] ১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত বাংলায় কংগ্রেস রাজনীতিতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ মূলত শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[২৭] আবার নিম্নবর্ণের নমঃশূদ্র, রাজবংশী এবং পৌন্ড্রদের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-কুলীন রক্ষণশীলতা কম থাকলেও দারিদ্র, অশিক্ষা ও জাতিগত কারণে উচ্চবর্ণের দ্বারা চালিত আন্দোলন থেকে তারা বাইরে অবস্থান করেছিল।[২৮] নদীয়াতে অবশ্য প্রাক-স্বাধীনাতা পর্বে প্রকট বর্ণ-সমীকরণ দেখা যায় নি। বরং গান্ধীবাদী আদর্শে আইন অমান্য আন্দোলন এবং তেহট্টের খাজনা বন্ধের আন্দোলনে যোগদানকারী মহিলাদের মধ্যে সমাজের নিম্ন বর্ণের মহিলা, কৃষক-শ্রমিক পরিবারের, একেবারে অজপাড়া গাঁয়ের নারীরা সক্রিয় ভাবে সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের অবদান ছাড়া এই আন্দোলন গণজাগরণের রূপ গ্রহণ করতে পারত না। এছাড়া গ্রামে ট্যাক্স বয়কট আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য কৃষ্ণনগরের কংগ্রেস নারী সংগঠন গ্রামের মানুষের ক্ষোভের সঙ্গে অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব নিয়েছিল। বন্দী-সত্যাগ্রহীদের মুক্তির দাবীতে নারীরাই কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ ও পলাশীতে শোভাযাত্রা এবং থানায় ধর্না দিয়েছিল। এই আন্দোলনে দুটি বিশেষ দিক উঠে এসেছে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কেবলমাত্র পুরুষদেরই অবদান ছিল এমন নয়, বরং গৃহের থেকেও নারীরা যে আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুতিতে এবং শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তা নদীয়ার নারীদের বিশেষত ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তেহট্টের খাজনা বন্ধের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে প্রমাণিত হয়।

সূত্র নির্দেশ এবং টীকা

১। ঘোষ, সারদা, নারীচেতনা ও সংগঠনঃ ঔপনিবেশিক বাংলা, ১৮২৯-১৯২৫, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা, ৩০১-৩০৬

২। বেগম, সালেহা, পথিকৃৎ মুসলিম নারী, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৩, রত্নাবলী চ্যাটার্জীর লেখা মুখবন্ধ থেকে নেওয়া।

৩। গুহ, রণজিৎ, নিম্নবর্গের ইতিহাস, ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, সম্পাদিত,

নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা, ২২-৪৬
৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মরজিৎ এবং অন্যান্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া, নদীয়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা সমিতি, নদীয়া নাগরিক পরিষদ, কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউজ, ১৯৭৩ পৃষ্ঠা, ১২৩-২৪
৫। রায়, মিলন, বাংলার অনুন্নত সম্প্রদায়ের উত্থানঃ বাগদিদের আর্থ-সামাজিক বিন্যাস ও উত্তরণ, অপ্রকাশিত পিএইচ, ডি, গবেষণা সন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮
৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মরজিৎ এবং অন্যান্য, (১৯৭৩) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১২৬
৭। চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্যনাথ, জেলে ত্রিশ বছরঃ প্রাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গণ, ঢাকা, ২০০৪, এছাড়াও, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২৭ শে ডিসেম্বর, ২০১৭
৮। দাশগুপ্ত, কমলা, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, অগ্নিযুগ গ্রন্থমালা-৯, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা, ১২৫-১৩০
৯। সেনগুপ্ত, সুবোধ চন্দ্র এবং বসু, অনিল, সংসদঃ বাঙালি চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা, ৬৬৩
১০। বাগচি, যশোধরা, নারী ও নারীর সমস্যা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা, ১৫৪
১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মরজিৎ এবং অন্যান্য, (১৯৭৩), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১৩২
১২। বাগচি, যশোধরা, (২০১৩), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১৫৪
১৩। Prayer, Mario, The 'Gandhians' of Bengal, Nationalism, Social Reconstruction and Cultural Orientations, 1920-1942, Pisa, Roma, 2001, pp. 38, 79-84
১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মরজিৎ এবং অন্যান্য, (১৯৭৩), প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১৫২
১৫। Chatterjee, Manini, 1930: Turning Point in the Participation of Women in the Freedom Struggle, Social Scientist, Vol. 29, No. 7/8, 2001, pp. 39-47
১৬। Chatterjee, Manini, ibid, p. 42
১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মরজিৎ এবং অন্যান্য, (১৯৭৩), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২১০
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা, ১৮০-৮১
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা, ২২২
২০। তদেব, পৃষ্ঠা, ৩৫৭
২১। তদেব, পৃষ্ঠা, ৩২৫
২২। মন্ডল, পলাশ, ঢাকার দিপালী সংঘ থেকে শ্রীসংঘঃ লীলা রায়ের (১৯০০-৭০ খ্রিষ্টাব্দ) চিন্তা ও কর্মের বিরর্তন, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, সংখ্যা-৩৫-৩৬, ২০১৫, পৃষ্ঠা, ১২৫-১৪৪
২৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মরজিৎ এবং অন্যান্য, (১৯৭৩),প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৩২৫-২৬
২৪। পাল, চিত্তরঞ্জন, সম্পাদিত, তেভাগার নারী, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১১, এবং দাস, সুস্নাত, অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রামঃ তেভাগা আন্দোলনের

আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার, নক্ষত্র, কলকাতা, ২০০২
২৫। সেন, সুনীল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়, চতুরঙ্গ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা, ৮৪৭
২৬। ভট্টাচার্য, সব্যসাচী, বাংলায় সন্ধিক্ষণঃ ইতিহাসের ধারা, ১৯২০-১৯৪৭, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী, ২০১৪, পৃষ্ঠা,৬১
২৭। তদেব, ভট্টাচার্য, সব্যসাচী, পৃষ্ঠা, ৬২-৬৩
২৮। বিশ্বাস, মনোশান্ত, বাংলার মতুয়া আন্দোলনঃ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬

বাংলার সীমানা নির্ধারণ: র‍্যাডক্লিফ কমিশন

মেঘমিত্রা বিশ্বাস
অধ্যাপিকা
চাকদহ কলেজ

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে ভারতবাসী বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করলেও ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা বিভাজনের সমস্যা সেই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ পূরণ করেনি। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ভেঙে ধর্মের ভিত্তিতে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল, লর্ড মাউন্টব্যাটেন সেই ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের হাতে। অথচ র‍্যাডক্লিফের ভারত-পাকিস্তান বিষয়ে বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। ভৌগোলিক অবস্থান না বুঝেই এবং কোনো শীর্ষস্থানীয় নেতার সাথে আলোচোনা না করেই র‍্যাডক্লিফ দুই দেশের সীমানা নির্ধারণ করে ফেলেন। ফলে র‍্যাডক্লিফের নির্ধারিত সীমানা বিভাজন হয়ে ওঠে অবিবেচনাপ্রসূত। এর পরিণামে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় উদবাস্তু সমস্যা, ধর্মে ধর্মে হানাহানি, ছিটমহল সমস্যা, ভাষাগত সমস্যা প্রভৃতি। এই অবিবেচক সীমানা নির্ধারণের ফলে শুধু যে তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যার জন্ম হয়েছিল তা নয়, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ র‍্যাডক্লিফ লাইনের দরুন তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত। তারা নিজ নিজ সীমান্ত নিরাপত্তার বিষয়েও সদা ত্রস্ত।

সূচক শব্দ : র‍্যাডক্লিফ, সীমানা, মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, থানা, জলসেচ, ছিটমহল, তিনবিঘা করিডোর।

বাংলার সীমানা নির্ধারণ: র‍্যাডক্লিফ কমিশন

ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশ যখন উত্তাল, তখন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ রবিবার স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদযাপিত হবে। এর পরের বছর থেকে কংগ্রেসের সমর্থকরা প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের শেষ রবিবারটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করতে থাকে। জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনী থেকেও এ বিষয়ে তাঁর আবেগের কথা জানা যায়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দিনটিকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন নির্ধারণ করে।আসলে ওই দিনটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে জাপানের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির দিন। অপরদিকে ভারতের শাসন ক্ষমতায় যারা বসবেন তাঁরাও দেরি করতে চাননি।[১] শেষপর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে

সঙ্গে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম অধ্যুষিত একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ভারত বিভাজনের পর ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা কী হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব বিলাতের বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের (১৮৯৯-১৯৭৭ খ্রি.) সভাপতিত্বে একটি কমিশনের হাতে দেওয়া হয় যা সীমানা কমিশন নামে পরিচিত। সীমানা নির্ধারণের এই দায়িত্ব প্রদানের জন্য স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নামটি প্রস্তাব করেছিলেন মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না।র‍্যাডক্লিফের নামের বিষয়ে প্রথম দিকে কংগ্রেসের আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতারা তাঁকে মেনে নেন। কেননা র‍্যাডক্লিফ মাউন্টব্যাটেনের পছন্দের পাত্র ছিলেন। জওহরলাল নেহেরু বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির মুসলিম এবং অ-মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জনবিন্যাসের বিষয়টি মাথায় রাখার কথা বলেছিলেন। মাউন্টব্যাটেন পত্র মারফৎ নেহরুর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সমর্থন করেছিলেন এবং তার সীমানা বিভাজনের খসড়াতে বিষয়টিকে মান্যতা দেওয়ার সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ বিখ্যাত ব্যারিস্টার হওয়া সত্ত্বেও ভারত বা ভারতের জাতিগত বিন্যাস-অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। সীমানা নির্ধারণ কমিশনের চেয়ারম্যান হওয়ার আগে র‍্যাডক্লিফ কখনো ভারতেও আসেননি। অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ লিখেছেন যে, "র‍্যাডক্লিফ জানতেন না কোথায় বাংলা, আর কোথায় পাঞ্জাব। অথচ এই দুটি অঞ্চল ভাগ করতে হবে ধর্মের মানদণ্ডে। তাই ভারতে আসার পূর্ব মুহূর্তে 'ইণ্ডিয়া অফিস'-এর উপসচিব তাঁকে উপমহাদেশের একটি মানচিত্র দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কী করতে হবে। . . . র‍্যাডক্লিফ মানচিত্র দেখে প্রথম আবিষ্কার করলেন যে, প্রায় ন-কোটি লোক, তাঁদের বাড়ি, তাঁদের ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, সব্জিক্ষেত, গোচারণভূমি, রেলপথ, কারখানা— সবই বিভাজন করতে হবে।" [২] এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল— মানচিত্রটিও ছিল খুবই নিম্নমানের। র‍্যাডক্লিফ ৮ই জুলাই ভারতের মাটিতে পা রাখেন এবং মাত্র ৩৫ দিনের মধ্যে বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা বিভাজনের কাজটি এক প্রকার দায়সারাভাবে সম্পূর্ণ করেন। তিনি ৯ই আগস্টের মধ্যে বাংলা এবং ১২ই আগস্টের মধ্যে পাঞ্জাব বিভাজনের রূপরেখা সম্পূর্ণ করে ফেলেন। ১৩ই আগস্ট র‍্যাডক্লিফের সুপারিশপত্র ভাইসরয়ের দপ্তরে জমা পড়ে। এই বিভাজনের পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা অনুমান করেই র‍্যাডক্লিফ ১৪ই আগস্ট ভারত ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান। তিনি এরপর আর কোনদিন ভারতে আসেননি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এদেশে এলে তিনি নিহত হতে পারেন।[৩]

সীমানা কমিশনের প্রধান স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ মাত্র মাসখানেক সময়ের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্রে ছুরি চালিয়ে বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা বিভাজিত করেন এবং ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ করেন। মাত্র ৯টি পৃষ্ঠায় বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। অতি অল্প সময়ে র‍্যাডক্লিফ বাংলা ও পাঞ্জাবের যে সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন তাতে বহু ক্ষেত্রেই অবিবেচনার ছাপ ছিল স্পষ্ট। তাছাড়া ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে জাতিগত ভিত্তিতে সীমানা পৃথক করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়ার আন্তরিকতাও পুরোপুরি ছিল না। অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ লিখেছেন, "ব্রিটিশ

ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল স্যার ক্লড অকিনলেক র‍্যাডক্লিফকে বলেছিলেন যে, জাতি গঠনের জন্য যেভাবে সীমান্ত তৈরী করতে হয় বা প্রতিরক্ষার কথা বিবেচনা করতে হয়, সে-সব এখানে ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই।" [৪] র‍্যাডক্লিফ লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়েছিলেন যে, এত অল্প সময়ে অতি দ্রুততায় বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা বিভাজন করতে গেলে তাতে ভয়াবহ ভুল হতে পারে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, "পরিণতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন, ভারতবর্ষকে এই বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হিসেবেই মেনে নিতে হবে।" [৫] তাই দেশবিভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তানে যে শরণার্থী বা উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তা র‍্যাডক্লিফের এই অবিবেচনাপ্রসূত সীমানা নির্ধারণের ফলে তীব্রতর হয়। এই সমস্যার গভীরতা, ভয়াবহতা, অমানবিকতা ছিল অত্যন্ত তীব্র ও বেদনাদায়ক। বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মনোনীত হয়েছিলেন বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস এবং বিজন কুমার মুখোপাধ্যায়। মুসলিম লিগের পক্ষে ছিলেন বিচারপতি সালেম মহম্মদ আক্রম এবং এস. এ. রহমান।

যাই হোক, বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণের জন্য পৃথক দুটি কমিটি গঠিত হয়। র‍্যাডক্লিফ ছাড়া বাংলার সীমানা কমিশনের অপর চারজন সদস্য ছিলেন চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, আবু সালেহ মহম্মদ আক্রাম এবং এম.এ. রহমান। ছাপানো অক্ষরে মাত্র ৯ পাতায় বাংলার সীমানা বিভাজিত হয়ে যায়।[৬] এরপর র‍্যাডক্লিফ দুটি পৃথক খামে করে বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণের সুপারিশ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হাতে তুলে দেন। ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ উৎসব যাতে কালিমালিপ্ত না হয়, তার জন্য দু'দিন পরে অর্থাৎ ১৭ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের হাতে র‍্যাডক্লিফ সুপারিশগুলি তুলে দেওয়া হয়। কলকাতা-সহ সম্পূর্ণ বর্ধমান ডিভিসন, দার্জিলিং জেলা পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয়। এছাড়া দেশীয় রাজ্য কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম ডিভিসন ও ঢাকা ডিভিসন, রাজশাহী ডিভিসনের রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি জেলা এবং প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের খুলনা জেলা।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারতের স্বাধীনতা আইন' পাশ করে। এই আইনেই ভারত-বিভাজনের সিদ্ধান্তটি পাকা হয়। ৩ রা জুনের পরিকল্পনা বা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্ত বিভাজিত হয়। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে, ভারত একটি মাত্র ভৌগোলিক সীমারেখায় থাকলেও পাকিস্তানের ভূখন্ড দুটি পৃথক ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে পড়ে। এভাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ভারত ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়। তবে দেশভাগের সময় বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এই প্রদেশ দুটি সম্পূর্ণরূপে মুসলিম অধ্যুষিত ছিল না। কেননা, দেশভাগের পূর্বে বাংলায় সমীক্ষা অনুসারে ৫৪.৪ শতাংশ এবং পাঞ্জাবে ৫৫.৭ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা ছিল।[৭] তবে, র‍্যাডক্লিফ ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা মাথায় রেখেই ভারত বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশকে ধর্মের নিরিখে দুটি অংশে বিভাজিত করে, বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে পূর্ব পাকিস্তানে এবং পাঞ্জাবের মুসলিম আধিক্য অঞ্চলকে পশ্চিম

পাকিস্তানে ফেলে।পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। অপরদিকে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানের এবং পূর্ব পাঞ্জাব ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে সেখানে বিপুল পরিমাণ জনবিনিময় ঘটে। পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্ব পাঞ্জাব তথা ভারতে চলে আসে এবং পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিম পাঞ্জাব তথা পাকিস্তানে চলে যায়। পাঞ্জাবের এই জনবিনিময় ঘটে অতি দ্রুত। শুধু ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে বিচার করলে দেখা যায় যে, সীমানা অতিক্রম করে ৭২,২৬,০০০ জন মুসলিম শরণার্থী পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন এবং ৭,২৪৯,০০০ জন হিন্দু ও শিখ শরণার্থী পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এসেছিলেন।[৮]

দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের এবং পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ববঙ্গ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। উভয় বঙ্গের ভৌগোলিক সুবিধার কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলা ভারতের এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনা জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ চট্টগ্রাম জেলায় ৯৮ শতাংশ অমুসলিম সম্প্রদায়ের বাস সত্ত্বেও র‍্যাডক্লিফ কী কারণে তা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেন তা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়। ফলে সেখানে ভারতের পতাকা উত্তোলন করে আন্দোলন শুরু হয়। যাই হোক, পূর্ব শর্ত অনুসারে, দেশভাগের পর ভারত ও পাকিস্তানের উভয় সরকার র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়।

র‍্যাডক্লিফ কমিশনের দ্বারা জেলাস্তরে হিন্দু বা মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোনো জেলা ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল থানা স্তরে হিন্দু বা মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। র‍্যাডক্লিফ এক্ষেত্রে কংগ্রেসের সাথে সহমত হয়েছিলেন যে, থানা হল সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বিভাগ, যার সেন্সাসের উপর ভিত্তি করে বিভাজন সীমানা টানা উচিৎ।[৯] সেজন্য বাংলার বেশ কয়েকটি জেলা থানা পর্যায়ে বিভাজিত হয়। কেননা, এসব জেলার কোনো কোনো থানায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আবার কোনো কোনো থানায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এই কারণে বাংলার দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, নদীয়া প্রভৃতি জেলাগুলি দ্বিখণ্ডিত হয়। দ্বিখণ্ডিত এই জেলাগুলির কোন্ কোন্ থানা ভারতের এবং কোন্ কোন্ থানা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা নীচের সারণীতে উল্লেখ করা হল—

জেলার নাম	পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থানা	পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত থানা
দিনাজপুর	পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থানাগুলি ছাড়া বাকি অঞ্চল ২০টি থানা।	রায়গঞ্জ, ইটাহার, বংশীধারী, কুশমুণ্ডি, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ, বালুরঘাট প্রভৃতি ১০টি থানা।
জলপাইগুড়ি	তেঁতুলিয়া, বোদা, দেবীগঞ্জ, পাটগ্রাম ৫টি থানা।	অবশিষ্ট ১০টি থানা।

মালদহ	নাচোল, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ ৫টি থানা।	অবশিষ্ট ১০টি থানা।
নদীয়া	খোকসা, কুমারখালি, কুষ্ঠিয়া, মীরপুর, আলমডাঙা, ভেড়ামারা, গণদণি, দামুরহুদা, চুয়াডাঙা, জীবননগর, মেহেরপুর, দৌলতপুর প্রভৃতি থানা।	নদীয়ার অবশিষ্ট অংশ।

র‍্যাডক্লিফ কমিশনের এরূপ বিভাজনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ পৃথক তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা— (১) গঙ্গার দক্ষিণে দক্ষিণবঙ্গ, (২) গঙ্গার উত্তরে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর নিয়ে গৌড়বঙ্গ এবং (৩) সবচেয়ে উত্তরে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। কংগ্রেসের সাথে একমত হয়ে র‍্যাডক্লিফ হুগলি নদীর জলবণ্টনের কথা মাথায় রেখে মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ফলে পুরো মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হয় এবং মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্ব দিক ছাড়া সমগ্র খুলনা জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল— কলকাতা যে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে তা উল্লেখ করা হয়নি। উত্তরবঙ্গের বোদা-দেবীগঞ্জ-পাচগর-এর মত পাঁচটি মুসলিম অধ্যুষিত থানা বাদে অবশিষ্ট জলপাইগুড়ি জেলা পশ্চিমবঙ্গেই থেকে যায়।[১০] জলপাইগুড়ি জেলার তেঁতুলিয়া থানা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহারের মধ্যে যোগাযোগ ব্যাহত হয়। আবার জলপাইগুড়ি জেলার পাটগ্রাম থানা পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ায় এবং রংপুর জেলার হাতিবান্ধা ও ডিমলা থানা ভারতের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় ভবিষ্যতে সেখানে ছিটমহল[১১] সমস্যার সৃষ্টি হয়। এভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশের মতো। নোয়াখালি জেলার চারটি থানা এলাকায়ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। সেখানকার বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে তাদের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানানো হলেও তা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আসামের বাঙালি হিন্দু অধ্যুষিত শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত হয়।[১২] অবিবেচনাপ্রসূত সীমানা বিভাজনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের সঙ্গে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এর সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়। জয়া চ্যাটার্জি লিখেছেন, “West Bengal did not get a direct territorial link with its northern districts until 1956, when the States Reorganisation Committee gave it a narrow strip of Bihar, which at last joined together the two parts of the state which had been unconnected since August 1947.” [১৩]

র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সিদ্ধান্তে থানা পর্যায়ে হিন্দু বা মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণের কথা বলা হলেও বাস্তবে বহু ক্ষেত্রে এই নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। ফলে পরবর্তীকালে বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। কমিশনের এই নীতি

লঙ্ঘনের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক-

(১) দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার বোঁদাগঞ্জ, বীরগঞ্জ ও বানহারুল- এই তিনটি থানা ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। অথচ এই থানা এলাকাগুলি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

(২) মালদহের চাঁচোল থানা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আবার মালদহের খরবা, কালিয়াচক, হরিশ্চন্দ্রপুর ও রতুয়া— এই চারটি থানা মুসলিম অধ্যুষিত হলেও এগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

(৩) জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জ, পাটগ্রাম, বোদা, পচাগড় ও তেঁতুলিয়া— এই পাঁচটি থানা অঞ্চলের বর্ণহিন্দু, তপশিলী ও আদিবাসীদের হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত ধরলে এখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু এই পাঁচটি থানা পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। অবশ্য তপশিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের প্রভাবে এখানকার আদিবাসীদের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে না ধরে 'অন্যান্য' সম্প্রদায় হিসাবে সেন্সাস রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। ফলে এই থানাগুলি পাকিস্তানে যাওয়ার পথ সহজ হয়।

(৪) মুর্শিদাবাদ জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হওয়া সত্ত্বেও তা পশ্চিমবঙ্গে রাখা হয়। অথচ খুলনা জেলা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হলেও তা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এভাবে বহুমুখী অবিবেচনার ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয় এই যে, নিজ থানা এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও উভয় দেশের বিভিন্ন এলাকায় এর ফলে বহু মানুষ সংখ্যালঘু হয়ে পড়লেন। র‍্যাডক্লিফের সীমানা বিভাজন এতটাই অবিবেচনাপ্রসূত ছিল যে, এই সীমানা বিভাজনের ফলে কোন কোন পরিবারের শোয়ার ঘর পশ্চিমবঙ্গের এবং রান্নাঘর পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়। বহু কৃষকের বাড়ি ও কৃষিজমি দুই দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। র‍্যাডক্লিফ তাঁর কাজের জন্য এত অল্প সময় পেয়েছিলেন যে, তাঁর কাছ থেকে বিভাজনের যুক্তিসঙ্গত ও সম্পূর্ণ সুবিবেচনাপ্রসূত রূপরেখা আশা করাও ছিল বাতুলতা মাত্র। S. P. Dasgupta লিখেছেন, "... there were instances where the international boundary of Radcliff between India and Pakistan was drawn leaving some where the dividing line passes through a single house with some rooms in one country and others in the neighbouring country; especially this kind of thing happened in Bengal part." [১৪] এ থেকে বাংলার সীমানা নির্ধারণে চরম অবিবেচনার বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে।

জয়া চ্যাটার্জি লিখেছেন, "Over 5 million Muslims were left in West Bengal and about 11 million Hindus found themselves stranded in the eastern wing of Pakistan."[১৫] বিনয়ভূষণ ঘোষ লিখেছেন, "কার্জন বাঙ্গালী হিন্দু সমাজকে হতবল করে দিতে চেষ্টা করেও অবশেষে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭-এ র‍্যাডক্লিফ জাতীয় নেতাদের সক্রিয় সম্মতিতে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজকে চিরকালের জন্য পঙ্গু, পরনির্ভর ও ছত্রভঙ্গ করে দিলেন এক অসম দেশবিভাগের সাহায্যে।"[১৬] দেশভাগের সময় সমগ্র বাংলার জনসংখ্যার ৪১.৫ শতাংশ ছিল অমুসলিম। কিন্তু

সীমানা বিভাজনের পর তারা পেল বাংলার এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড। তাই বিনয়ভূষণ ঘোষ আরও লিখেছেন যে, ". . . যে ইংরেজ রাজপুরুষদের হাতে দেশ বিভাগের ভার, তারা প্রায় সবাই হিন্দুবিদ্বেষী এবং লীগকে যতটা সম্ভব প্রভুভক্তির পুরস্কার দেওয়া যায় তারই চেষ্টায় ব্যস্ত। এরই ফলে গোটা বাংলার এক-তৃতীয়াংশ পড়ল হিন্দুবাংলার ভাগ্যে। বাঙ্গালী হিন্দুকে নানাভাবে বঞ্চিত করার জন্য ইংরেজ সরকার বিবিধ কৌশল অবলম্বন করল।"[১৭]

র‍্যাডক্লিফের এই বিভাজনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব-বাংলায় নানা অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। যেমন- মুর্শিদাবাদ এবং নবদ্বীপের মুসলমানেরা পশ্চিমবঙ্গে তাদের জেলা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়েছিল।[১৮] জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণের যে পাঁচটি থানা এবং দিনাজপুরের যে অংশটা পূর্ববঙ্গের মধ্যে পরেছিল, সেই অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীরা যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ ছিল। সবচেয়ে ট্র্যাজিক বিষয় ছিল খুলনার ক্ষেত্রে। খুলনা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার বৈঠকে খুলনাকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রাখার কথা বলা হলেও শেষপর্যন্ত র‍্যাডক্লিফ রিপোর্টে এই জেলাকে পূর্ববঙ্গের মধ্যে দেওয়া হয়।র‍্যাডক্লিফ রিপোর্ট জনসমক্ষে আসার পর সমগ্র খুলনা ডিভিসনের মানুষজন এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। খুলনা কংগ্রেস কমিটি খুলনাকে ভারতে দিয়ে, মুর্শিদাবাদকে পাকিস্তানে দেওয়ার পক্ষে জোড়ালো সওয়াল করে। এই অবিবেচনাপ্রসূত র‍্যাডক্লিফ লাইনের ফলে বহু সময় ধরে সীমান্তবর্তী জেলাগুলি উত্তপ্ত ছিল। যেমন- হাসনাবাদের পূর্বদিকে অবস্থিত রাজনগর নামক অঞ্চলটি ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত খুলনার মধ্যে ছিল। তারপর ১৯৪৫ এ সার্ভে বিভাগ এই অঞ্চলটিকে হাসনাবাদ থানাভুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ফেলে। ১৯৪৭ সালেও র‍্যাডক্লিফ কমিশন একই ব্যবস্থা জারি রাখে। রাজনগররের মুসলমানরা এই সিদ্ধান্ত একেবারেই মেনে নেয়নি। ফলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহুবার সীমান্ত উত্তপ্ত হয়েছিল।[১৯]

এই র‍্যাডক্লিফ লাইন জনমানসে শুধু অসন্তোষেরই জন্ম দেয়নি, এই লাইন ভৌগোলিক ও সীমান্ত নিরাপত্তার দিক থেকেও ছিল যথেষ্ট দুর্বল। কেননা, এই বিভাজনের লাইন এতটাই অবিবেচকভাবে টানা হয়েছিল যে, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিকভাবে নদীর গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয়েছিল। যেমন, মাথাভাঙা নদী বৃষ্টির জলে পুষ্ট হওয়ায় বর্ষাকালে এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি প্লাবিত হয়, আবার শুষ্ক সময়ে এই অঞ্চলে জলের ঘাটতি দেখা যায়। প্লাবনের সময় সীমান্তে নিরাপত্তার বিষয়টাও প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে পড়ে।[২০] র‍্যাডক্লিফ লাইনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ববাংলার অর্থনীতিও যথেষ্ট ক্ষতির মুখে পড়ে। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, একই জমিদারের জমি দুই দেশে বিভাজিত হয়েছে। ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে খুলনার এক হিন্দু জমিদার তার সীমান্তের ওপারে থাকা জমি থেকে কর আদায়ের জন্য সীমান্ত পেড়োলে পাকিস্তানের সেনাদের হাতে বন্দী হন। পরবর্তীতে আর কখনই সীমান্ত অতিক্রম করবেন না, এরকম মুচলেকা দিয়ে তিনি ছাড়া পান।[২১] বহু ভাগচাষি পেটের দায়ে প্রতিদিনই সীমান্ত এপার-ওপার করেন। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তারা ধরাও পড়ছেন। যেমন— ফুলবারি থেকে এক ভাগচাষি তার ন্যায্য শষ্য নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে ফেরার সময় বাংলাদেশ সেনার হাতে ধরা পরেন।[২২]

এই অপরিকল্পিত বঙ্গ বিভাজনের ফলে পশুপালক শ্রেণী ও জেলে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দৈনিক সংবাদপত্রে এক সময়ের নিয়মিত খবর থাকতো ইছামতী নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে ট্রলার কিংবা নৌকা আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করেছে।পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ— উভয় ক্ষেত্রেই এরূপ সীমানা লঙ্ঘনের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। সীমানা অতিক্রম বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বহু মৎসজীবী আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। সীমানা বিভাজনের ফলে সীমান্তবর্তী বহু গ্রামের স্বয়ম্ভর অর্থনীতি ব্যহত হয়। গ্রামের হাট-বাজার অন্য দেশে পরায় অনেক গ্রামবাসী হাটে-বাজারে যাওয়ার অধিকার হারায়। কারণ, ১৯৪৭-এর পর থেকে সেই হাট বা বাজার আর তাদের নয়। সে তো অন্য দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পরে গেছে।

সীমানা নির্ধারণের পরবর্তী পর্যায়ে ১৩১টা ছিটমহল ভারতের এবং ৯৫টা ছিটমহল অবিভক্ত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের রংপুর ও দিনাজপুর জেলাকে কেন্দ্র করে ভারতের অন্তর্গত ছিটমহলগুলির মোট আয়তন ছিল ৫২,৭৪৫ বর্গমাইল এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের অন্তর্গত ছিটমহলগুলির মোট আয়তন ছিল ১৯,০২০ বর্গমাইল। র‍্যাডক্লিফ সীমান্ত ভাগের সময় তেঁতুলিয়া, পচাগড়, দেবীগঞ্জ এবং পাটগ্রামকে গুরুত্ব দিলেও বোদাকে একেবারেই গুরুত্ব দেননি। ১৯৫৮ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে স্থির হয় যে, বেরুবাড়ির অর্ধাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে বেরুবাড়ির অধিবাসীরা গর্জে ওঠে। তাঁদের স্লোগান ছিল— "জান দেব, প্রাণ দেব, বেরুবাড়ি দেব না। রক্ত দেব, বেরুবাড়ি রুখবো।"[২৩] শেষপর্যন্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মিলিত বিরোধিতা ও বেরুবাড়ি অঞ্চলের প্রতিবাদ স্বরূপ সরকার পক্ষ ১৯৫৮-র সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে।

অপর উল্লেখযোগ্য সমস্যা ছিল তিনবিঘা করিডর। তিনবিঘা করিডোর ছিল ভারতের অধীন। অপরদিকে বাংলাদেশের অধীন দহগ্রাম ও অঙ্গারপোতার নাগরিকদের স্বাধীনভাবে চলাচলে যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল। এমনকি বাংলাদেশের প্রশাসনিক কর্তাদেরও প্রশাসনিক কোন কাজকর্মের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা হত। দহগ্রাম-অঙ্গারপোতার অধিবাসীরা অভিযোগ করেছিল যে, অস্ত্র-সহ ভারতীয় সৈন্যরা যখন-তখন তাদের অঞ্চলে প্রবেশ করে। এতে তাদের নিরাপত্তা ব্যাহত হয়।[২৪] তিনবিঘা করিডরের নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে ভারত ও বাংলাদেশ সেনার মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় পরিষেবাকে কেন্দ্র করেও ছিটমহলগুলির অধিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম হয়েছিল। ছিটমহলগুলিতে সঠিক নিরাপত্তার বালাই না থাকায় ছিটমহলগুলি দুষ্কৃতীমূলক কর্মকান্ডের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়। নারীপাচার, জালনোট পাচার, মাদক দ্রব্য পাচারের বড় বড় হাব ছিল এই ছিটমহলগুলি। ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তারা তাদের দুষ্কৃতীমূলক কর্মকান্ডকে পরিচালনা করে। সীমান্তরক্ষীর ছায়া পর্যন্ত এই ছিটমহলে পড়ত না। অধিবাসীরা অপর রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে থাকায় সামরিক সুরক্ষা দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।[২৫] Willam Van Schendel উল্লেখ করেছেন যে, ছিটমহলগুলিতে চুরি, ডাকাতির মত ঘটনার সাথে অস্ত্র কারবারও চলত। কারণ, ছিটমহলবাসীদের কোন নাগরিক পত্র (সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট) এবং সামরিক

বাহিনীর নিরাপত্তা না থাকায় সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল।[২৬]

ছিটমহলবাসীরা ঠিক কতটা দুর্দিনের মধ্যে রয়েছে তা ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ছিটমহলের পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে দিল আসামা' নামক শিরোনামে প্রকাশিত এক খবর থেকে জানা যায়। বাংলাদেশী ছিটমহল মশলডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা আসামা বিবি সন্তান প্রসবের জন্য যখন হাসপাতালে এসেছিলেন, তখন তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় যে, সে ছিটমহলের বাসিন্দা। সন্তান প্রসবের পর হাসপাতালের সুপার নিখিল দাস থানায় খবর দিয়েছিলেন। আসামে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হবে কিনা— এই নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের মধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মানবিকতা জয়যুক্ত হয়েছিল—আসামা গ্রেফতার হননি। কিন্তু তার সন্তানকেও কোন 'বার্থ সার্টিফিকেট' প্রদান করা হয়নি। আসামার সন্তান ভারত না বাংলাদেশের নাগরিক? নাগরিকত্বহীনতায় গণতন্ত্রের প্রশ্নটি তাদের কাছে আজও অর্থহীন। শিশুটির পিতা মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।[২৭] দিনহাটার 'ছিটমহলবাসী কমিটি'র প্রধান জানান যে, নাগরিকত্বের পরিচয়ের অভাবে তাদের প্রতিনিয়তই সমস্যার মুখে পড়তে হয়। ছিটমহলগুলিতে কোন রাষ্ট্রের তরফ থেকেই পানীয় জলের, প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়নি। এর ফলে ছিটমহলবাসী বংশপরম্পরায় অক্ষরজ্ঞানহীন থেকে যায়। ভারতবর্ষ জুড়ে যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সর্বশিক্ষা অভিযানের জোয়ার এসেছিল, তার কোন ঢেউই ভারতের অন্তর্গত ছিটমহলগুলিতে প্রবেশ করেনি। এমনকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরও অভাব ছিল ছিটমহলগুলিতে। তাদের কোন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। এমনকি শিশুর জন্মগ্রহণকে কেন্দ্র করেও তাদের বঞ্চনার, অপমানের শিকার হতে হত। ছিটমহলে এসে ভারত তথা বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রেরই মানবাধিকার, মানবতাবাদ ভূলুণ্ঠিত হয়, যা সভ্য সমাজের কাছে এক লজ্জার বিষয়।

সূত্র নির্দেশ:

১. রামচন্দ্র গুহ, গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ, ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪
২. আনন্দগোপাল ঘোষ, স্বাধীনতার ষাট: প্রসঙ্গ ছেড়ে আসা মাটি, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, সাহিত্য ভগীরথ প্রকাশনী, কোচবিহার, পৃ. ১১
৩. আনন্দগোপাল ঘোষ, তদেব, পৃ. ১৬
৪. আনন্দগোপাল ঘোষ, তদেব, পৃ. ১২
৫. আনন্দগোপাল ঘোষ, তদেব, পৃ. ১২
৬. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ দেশত্যাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪, অনুষ্টুপ, কলকাতা-৯, পৃ.২২-২৩
৭. Joya Chatterji, 'The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52', JSTOR, p.118.
৮. Joya Chatterji, 'The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52', JSTOR, p.118

৯. The Memorandum on the partitionof bengalpresented on behalf of the Indian National congress case before the Bengal Boundary Commission, P. 27.
১০. Joya Chatterji, 'The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52', JSTOR, p. 118.
১১. ছিটমহল হল কোনো দেশের সেই ক্ষুদ্র ভূখণ্ড যা প্রতিবেশি দেশের বৃহৎ ও সরল ভূখণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করার ফলে দ্বিতীয় সেই দেশটিতে ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটি তার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
১২. বিমলানন্দ শাসমল, ভারত কী করে ভাগ হলো, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৮১, তিন সঙ্গী, ৫৭সি, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১৬
১৩. Joya Chatterji, 'The Spoils of Partition : Bengal and India, 1947-1967, First Published : 2007, Cambridge University Press, New Delhi, p. 60
১৪. S. P. Das Gupta, "The Partition of Bengal 1947 : Its Genesis and Sequel" in 'Looking Back at Partition of Bengal : Geo-political Implications of Partition in West Bengal', Editor : Dr. Manisha Deb Sarkar, First Published : 2009, K. P. Bagchi & Company, Kolkata, p. 25.
১৫. Joya Chatterji, Ibid, p. 57
১৬. বিনয়ভূষণ ঘোষ, দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাঙালী, প্রকাশক ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত, পৃ.৭৭
১৭. বিনয়ভূষণ ঘোষ, তদেব, পৃ.৭৮
১৮. Joya Chatterji, 'The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52', JSTOR, p. 217
১৯. Joya Chatterji, 'The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52', JSTOR, p. 221
২০. Inspector's Report on Border Intelligence of Nadia district, 23rd April, 1948, in GB File No. 1238-47 (Nabadwip).
২১. Joya Chatterji, 'The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52', JSTOR, p. 226
২২. Joya Chatterji, 'The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52', JSTOR, p.226.
২৩. মাধুরী পাল, "বেরুবাড়ী আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তার তাৎপর্য", গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ইতিহাস অনুসন্ধান, খন্ড-১৭, কলকাতা, ২০০২, পৃ.৬৫৫
২৪. Chandrika. J Gulati, Bangladesh Liberation to Fundamentalism; A study of Volatic Indo-Bangladesh Relations, Commonwealth Publishers, New Delhi, 1988, p. 175
২৫. Willem Van Schendal, Stateless in South Asia : The Making of

the India Bangladesh Encloves, The Journal of Asian studies, Vol-16, No-1, Cambridge, Feb-2002, pp. 130-131
২৬. Willem Van Schendal, Ibid, p. 133
২৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা এপ্রিল, ২০১০

ব্রিটিশ ভারতে বিপ্লবী জাতীয় চেতনায় বিস্মৃত এক বাঙালি বিজ্ঞানী

শ্রী অহিন রায়চৌধুরী
পিএইচ.ডি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ :
বিজ্ঞান সাধনায় ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগ থেকে বরাবরই পৃথিবীকে পথ দেখিয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। রাজাদের নীতি সমূহ এই চলার পথকে বিভিন্ন ভাবে সুগম করে তুলেছে। বলা যায়, সেখান থেকেই বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্যে এক দীর্ঘ সখ্যতা তৈরি হয়েছে যার প্রবাহ ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ অধিকৃত পরাধীন ভারতবর্ষেও বর্তমান ছিল। মেঘনাদ সাহা তার অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক চেষ্টায় অতিসাধারণ অবস্থা থেকে ভারতের এক জন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি যে কেবল এক জন বিশ্ব শ্রুত পদার্থবিদ ছিলেন তাই নয়, ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, এমন কি ভারতের নদী বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত ও তার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে সুস্পষ্ট রূপ নিতে পেরেছিল। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। মেঘনাদ সাহার দূরদৃষ্টি ও সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য গড়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন ভারতের নদী নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা। এর ফলে নদীর সর্বনাশা ভয়ঙ্কর বন্যার হাত থেকে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও গাছপালা রেহাই পায়। পরাধীন তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিজ্ঞান ও তার স্বনাম ধন্য বিজ্ঞানীদের অবদান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিপ্লববাদকে বিভিন্ন উপায়ে সরাসরি সমর্থন জানানো ও সেই কর্মকাণ্ডে নিজেদের অনেকেই সংযুক্ত করিয়েছিলেন নির্দ্বিধায়। তেমনই একজন 'বিজ্ঞানী-বিপ্লবী' ছিলেন মেঘনাদ সাহা। এখানে তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাতের প্রয়াস করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : বিজ্ঞান, রাজনীতি,পরাধীনতা, জাতীয়তাবোধ, বিপ্লববাদ ও স্বাধীনতা

ভারতীয় উপমহাদেশ সহ সমগ্র বিশ্বে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে উঠেছে যে ক'জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর মৌলিক তত্ত্বের ওপর বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা তাঁদের অন্যতম। মেঘনাদ সাহা শুধুমাত্র একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবে জড়িয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় মেঘনাদ সাহা বিপ্লবী স্বদেশী আন্দোলনকারী নেতৃত্ববৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং শৈলেন ঘোষ। অবশ্য বিপ্লবীদের গুঢ় আন্দোলনপন্থার কারণে ইতিহাসবিদগণের পক্ষে মেঘনাদ সাহার বিপ্লবী আন্দোলনের বিস্তারিত জানা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে তৎকালীন আইরিশ বিপ্লবী সংগঠন সিন-ফিন পার্টির স্বাধীনতা আন্দোলন

অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো। জার্মানীর সহায়তায় আইরিশ অভ্যুত্থানকারীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশ কিছু গুপ্ত সংগঠন তৈরি করেছিলো।সিন ফেইন বাঙ্গালিদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিলো কারণ শুত্রুপক্ষ ছিলো একই-ব্রিটিশ, যারা এই দুটি জাতির মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে উপনিবেশ কায়েম করে রেখেছিলো। আইরিশ ন্যাশনালিষ্ট পার্টির আন্দোলন নানা দিক থেকেই উপমহাদেশীয় গান্ধীবাদী আন্দোলনের সাথে তুলনীয় ছিলো। মেঘনাদ সাহা এই ধরনেরই সংগঠন অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তরের সাথে জড়িত ছিলেন।বিপ্লবী গোষ্ঠিতে যোগ দিয়ে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন নামে অধিক পরিচিত) এবং পুলিন দাসের মতো নেতার সংস্পর্শে এসে তরুণ মেঘনাদ সাহা সশস্ত্র প্রতিরোধে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এবং এর ফলে ব্রিটিশ নানাবিধ চাপে তাঁর জীবন ওষ্ঠ্যাগত হয়ে যায়। একটি ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে একজন পদার্থবিদের এধরনের বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে যাওয়া খুবই বিরল ঘটনা।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় অংশগ্রহণের জন্য স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও পড়াশুনোর লড়াই ছাড়েননি। চিন্তা করুন ১৯১১সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান পড়তে ঢুকলেন। পদার্থবিজ্ঞান পড়াচ্ছেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, রসায়নের অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সহপাঠীদের মধ্যে আছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আছেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ধর, নিখিলরঞ্জন সেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ছিলেন মেঘনাদের এক বছর সিনিয়র। এদের সঙ্গে পড়লেও মেঘনাদের লড়াইটা আলাদা। ছোট জাতের অসম্মান নিয়ে বিজ্ঞানসাধনা চালিয়ে যাওয়ার লড়াই। থাকেন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের জন্য আলাদা আলাদা থাকা ও খাবার ব্যবস্থা। হোস্টেলের সরস্বতী পূজায় অঞ্জলি দিতে গেলে কিছু ব্রাহ্মণসন্তান মেঘনাদকে অপমান করে মণ্ডপ থেকে বের করে দেয়। এর মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেঘনাদ সাহা প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন, আর প্রথম হলেন সত্যেন বসু। মেঘনাদ সাহা আর সত্যেন বসু দুই প্রিয় বন্ধু ভারতীয় বিজ্ঞানে উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক। কিন্তু আজ বোঝা যায় নিচু জাতের হিন্দু হিসেবে সাহার লড়াই স্বচ্ছল, উঁচু জাতের বসুর চেয়ে কত কঠিন ছিল। এর থেকেই বোঝা যায় এই এই হিন্দুধর্ম ও তার জাত প্রথা, তার অত্যাচার এই উপমহাদেশের বিজ্ঞানসাধনার হাজার বছরের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। গত দুই হাজার বছরে কত শত মেঘনাদ সাহা হারিয়ে গেছে হিন্দু গর্বের জাতের করাল অন্ধকারে। এটাই তো ইতিহাসের কাজ। পরতে পরতে লেগে থাকা ঘটনাগুলিকে আলাদা করা ও ব্যাখ্যা খোঁজা। ইডেন হস্টেলে জাতের বজ্জাতির বিরুদ্ধে সহপাঠী ও আবাসিক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও নীলরতন ধর তীব্র আপত্তি করলেন এবং তিনজন হস্টেল ছেড়ে দিলেন। চলে এলেন মেসে। সেই বিখ্যাত মেস-১১০, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা। যেখানেতাঁর আলাপ হয় বিপ্লবী বাঘাযতীন, ভূপেন দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) সহ আরও অনেকের সঙ্গে। ভূপেন দত্ত এই ব্যপারে 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' বইতে আলোকপাত করেছেন। এমনকি ১৯২৭সালে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হওয়ার সময়েও তার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা দফতরের রিপোর্ট যায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে বলশেভিক কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সাহায্য করবার। বলশেভিক সাহিত্য পড়বার। তার মেয়ে চিত্রা রায় লিখছেন যে তার শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিকেলবেলায় কলকাতার গড়ের

মাঠে হাওয়া খেতে যাওয়ার সময়ে সাহা সহ তার প্রিয় ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে স্বদেশি আন্দোলনে দীক্ষিত করতেন। এ এক হারিয়ে যাওয়া সময়। এক দিকে পরাধীনতার গ্লানি। অন্যদিকে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদের, বিদ্রোহের প্রস্তুতি। মেঘনাদ সাহা তার এক উজ্জ্বল অভিজ্ঞান মাত্র।[১]

বাংলার সংগঠন অনুশীলন সমিতির সাথে ১৯১৫এর দিকে পাঞ্জাবের বিপ্লবী সংগঠন গদর পার্টির বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। তবে এই দলটির কর্মকান্ড পরিচালিত হত কানাডা ও সানফ্রান্সিসকো প্রবাসী বিভিন্ন বিপ্লবী নেতার মাধ্যমে। বার্লিনে অবস্থিত গদর বাহিনীর কিছু সদস্য বাঘা যতীনকে অবহিত করেন যে জার্মানীর কাইজার উইলহেম ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং জার্মানী এই বিপ্লবীদের অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতে আগ্রহী। এই কর্মকান্ডের তদারকিতে ইন্ডিয়ান রেভোলিউশন কমিটি নামে বার্লিনে একটি সংগঠন তৈরি হয়। কাইজারের মারফত বাঘা যতীন জানতে পারেন হেনরী নামের অস্ত্রবাহী একটি জাহাজ সিঙ্গাপুর থেকে ফিলিপাইন হয়ে সুন্দরবনে ভীড়বে। মেঘনাদ সাহা এবং যদুগোপাল মুখার্জীকে এই জাহাজ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে ১৯১৫এর ২রা জুনহেনরী যখন সাংহাইয়ের বন্দরে আসেনতখন ব্রিটিশ এবং ফরাসী বাহিনী জাহাজটিতে তল্লাশি চালিয়ে সব অস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জাহাজটি সুন্দরবনে না ভীড়ে জার্মানীতে ফিরে যায় এবং মেঘনাদ সাহা খালি হাতে ফিরে আসেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় মেঘনাদ সাহা বিপ্লবী স্বদেশী আন্দোলনকারী নেতৃত্ববৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং শৈলেন ঘোষ। অবশ্য বিপ্লবীদের গুঢ় আন্দোলনপন্থার কারণে ইতিহাসবিদ গণের পক্ষে মেঘনাদ সাহার বিপ্লবী আন্দোলনের বিস্তারিত জানা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে তৎকালীন আইরিশ রিভোলিউশনারী সিন ফেইন পার্টির স্বাধীনতা আন্দোলন অনুপ্রেরনা জুগিয়েছিলো। জার্মানীর সহায়তায় আইরিশ অভ্যুৎথানকারীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশ কিছু গুপ্ত সংগঠন তৈরি করেছিলো। সিন ফেইন বাঙ্গালিদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিলো কারণ শুত্রুপক্ষ ছিলো একই-ব্রিটিশ, যারা এই দুটি জাতির মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে উপনিবেশ কায়েম করে রেখেছিলো। আইরিশ ন্যাশনালিষ্ট পার্টির আন্দোলন নানা দিক থেকেই উপমাহাদেশীয় গান্ধীবাদী আন্দোলনের সাথে তুলনীয় ছিলো। মেঘনাদ সাহা এই ধরনেরই সংগঠন অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তরের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯১৭সালে ব্রিটিশশাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড চেম্সফোর্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন স্থাপন করলেন। কমিশনের প্রধান হিসেবে বসানো হল এম ই স্যাডলারকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন কেমন চলছে তার রিপোর্ট তৈরি করাই স্যাডলারের দায়িত্ব। যদিও কমিশনের আসল উদ্দেশ্য অন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরমহলে নজর রাখা। ১৯০৫এর বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্রিটিশ সরকারের চোখে বিপ্লবী তৈরির আখড়া। স্যাডলার একটা প্রশ্নপত্র তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী মিলিয়ে মোট ৬৭১ জনকে বিলি করেন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে আরও দাবিদাওয়া আলাদা করে লিখে জানানো যাবে। স্যাডলার জানতেন, উত্তরপত্রে কড়া নজর থাকবে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের। উত্তরদাতাদের মধ্যে একজনের উত্তরপত্র ছিল বেশ দীর্ঘ। পঠনপাঠনের

সমস্যা ছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যময় পরিবেশের দিকেও আঙুল তুলেছিলেন। উত্তরপত্রে লেখা ছিল,"যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে আবাসিক করে তোলার কথা ভাবা হয় এবং যথাযথ হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয় তা হলে 'ডেমোক্র্যাটিক ক্লাস' বা গণতান্ত্রিক শ্রেণির (আমি তাদেরই গণতান্ত্রিক শ্রেণি বলে অভিহিত করছি, যাদের পিছিয়ে পড়া শ্রেণি বলা হয়) কথা ভাবতেই হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে লাগোয়া হস্টেল রয়েছে, তাতে তথাকথিত উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণদের মৌরসিপাট্টা চলছে। সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে কায়স্থ ও বৈদ্য ছাত্রেরা। কোনও গণতান্ত্রিক শ্রেণির ছাত্রকেই ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ ছাত্র এক ঘরে মেনে নেয় না বা একসঙ্গে খেতে বসলেও আপত্তি জানানো হয়।" উত্তরদাতা বছর কুড়ির এক লেকচারার মেঘনাদ সাহা। মাত্র দু'বছর আগে স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন এবং স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে মেঘনাদ সাহার মতোই পিছিয়ে পড়া বা 'নিচু জাত'-এর ছাত্রদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। কিন্তু তাঁর ও মেঘনাদের দৃষ্টিভঙ্গির বুনিয়াদি পার্থক্য ছিল, যা বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর রিপোর্টে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য আলাদা আর্থিক তহবিল গড়ার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। শীলের রিপোর্টে যুগ্নি, বারিক, সুবর্ণবণিক, নমঃশূদ্র, সাহাদের 'ডিপ্রেসড ক্লাস' বা কোথাও 'লোয়ার কাস্ট' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে মেঘনাদের রিপোর্টে এরা প্রত্যেকেই এক ছাতার তলায়, গণতান্ত্রিক শ্রেণি। নিজের রিপোর্টে পৃথক তহবিল গড়ে তোলাকে একদমই প্রশ্রয় দেননি মেঘনাদ। তিনি সবার সমান অধিকারের পক্ষে। মেঘনাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেশের বর্তমান ভর্তুকিপুষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার সরাসরি বিপক্ষে। তিনি সেই সময়েই বুঝেছিলেন, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিভেদ টেনে এবং ভর্তুকি দিয়ে কোনও এক বিশেষ শ্রেণির উন্নতির সম্ভাবনাকে মেরে ফেলায় দেশের সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব নয়।কলেজে পড়ার সময়ে জাতিভেদের শিকার হওয়া, সেই স্মৃতি পিছনে ফেলে বিজ্ঞানী হিসেবে কেরিয়ার গড়ার পথেও পদে পদে পশ্চিমি বিজ্ঞানীদের নিস্পৃহ মনোভাবের সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করা। ছোটবেলার অন্ধকার শেওড়াতলার গ্রাম্য জীবন, কলেজে পড়ার সময়ে খাস কলকাতা শহরে কুসংস্কারের ছায়া তাঁকে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে, বিজ্ঞান গবেষণার উন্নতি ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে দেশের নিচু তলার মানুষের দুর্দশা তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল ১৯১৩সালে প্রিয় শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রেরণায় গড়ে তোলা বন্যাত্রাণ প্রকল্পের দিনগুলি। মেঘনাদ বুঝেছিলেন এই সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য দেশকে আগে প্রস্তুত করতে হবে। অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না। দেশে শিল্প গড়লে তবেই তা ভবিষ্যতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আবার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ফলাফলে সমৃদ্ধ হবে শিল্প। তবে এই বিশাল কর্মকাণ্ড তখনই সম্ভব হবে, যখন সম্পদের বণ্টনে সমতা আসবে। দেশের সম্পদ বণ্টনের দায়ভার বিজ্ঞানীদের কাঁধে থাকে না, থাকে দেশচালক আমলাদের হাতে। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলীয়ান দেশচালকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন মেঘনাদ। ধীরে ধীরে সেই গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তোলার দিকে ঝুঁকছিলেন তিনি।১৯৩৫থেকে ১৯৫১-এই ১৬বছর রাজনীতিক ও বিজ্ঞান প্রশাসক

মেঘনাদ সাহা'কে আত্মপ্রস্তুতির মঞ্চ গড়ে দেয়। 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকার হাত ধরে দেশের বিবিধ সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান নির্দেশ এবং ১৯৩৮সালে তৎকালীন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসুকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে যার সূত্রপাত।[২]

১৯১৫সালে যখন স্নাতকোত্তর পাশ করেন মেঘনাদ সাহা, তখন বিশ্ব জুড়ে পদার্থবিদ্যায় নতুন নতুন আবিষ্কারের ঘটনা তাঁর মধ্যে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। ছাত্রাবস্থায় সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। যোগ্য সহপাঠীর উপস্থিতিও মেঘনাদকে অনেকটাই উৎসাহ জুগিয়েছিল। পরের বছরই নব্য প্রতিষ্ঠিত রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার পদে যোগদান করেন। শুরু হয় পড়ানোর পাশাপাশি নিজের গবেষণা। মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞান গবেষণার প্রথম দিকের বিষয় ছিল তাত্ত্বিক ও ফলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান। একাধিক বিষয়ে গবেষণা করলেও তিনি বিখ্যাত হন তাপজনিত আয়নন বা thermal ionization বিষয়ক তত্ত্বের জন্যে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞান গবেষণা নির্ভেজাল পদার্থবিদ্যা ও শুষ্ক গাণিতিক সমীকরণের সমাহার। কিন্তু ছোটবেলা থেকে জাতপাতের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সামাজিক বিভাজনের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ যে সাহার তাপজনিত আয়ননের গবেষণার মূলে নিহিত ছিল।মেঘনাদ সাহা সূর্য বা কোনও নক্ষত্রে স্থিত পদার্থগুলির পরমাণুর আয়ননের ঘটনা ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর জাতপাত বিরোধী সমাজভাবনার প্রেরণায়। নক্ষত্রের মধ্যকার পরমাণুগুলি প্রচণ্ড তাপ ও চাপে যেমনটা ব্যবহার করে, তা তাদের নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী। নিজস্ব ইচ্ছে অনুযায়ী। নক্ষত্রের প্রভাবে নয়। অধ্যাপক সাহার চিন্তাভাবনায় গোটা সমাজটাই একটা নক্ষত্র, যে সব সময়ই তার মধ্যকার পদার্থের পরমাণুগুলিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু পরমাণুগুলি নিজের ইচ্ছে মতোই জীবন কাটাবে, যেমনটা কাটিয়েছিলেন মেঘনাদ। শহরতলির অন্ধকারে ডুবে থাকা গ্রাম থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া, আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ করা, আরও পরে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হওয়া-তাঁর নিজের জীবনটাই যেন নক্ষত্রের প্রচণ্ড তাপ ও চাপের সম্মুখীন হওয়া এক পরমাণুর গল্প, যে কিনা চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক বিধিনিষেধে প্রভাবিত হয়নি। বরং তাঁর স্বাধীন ইচ্ছে, নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই বেছে নেওয়ার প্রত্যয় প্রভাবিত করেছে গোটা সমাজকে। তবে এই সমস্ত কিছুই খুব সহজে হয়েছিল, এমনটা নয়।[৩]

১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস সি ডিগ্রির পাশাপাশি 'প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ' ও 'গুরু প্রসন্ন ঘোষ' বৃত্তি লাভ করেন মেঘনাদ সাহা। এই বৃত্তির টাকায় মেঘনাদ প্রায় দু'বছর ইউরোপে ভ্রমণও গবেষণার সুযোগ পেলেন। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে লন্ডনে পৌঁছলেন মেঘনাদ সাহা। ইচ্ছে ছিল কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ডে গিয়ে কাজ করবেন। কিন্তু সেখানে খরচ এত বেশি যে দুটো বৃত্তি থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয় নি মেঘনাদের পক্ষে। মেঘনাদ গেলেন ইম্পেরিয়াল কলেজে। তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি তখন সেখানে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে পি এইচ ডি করছেন। এখানেই মেঘনাদের সাথে পরিচয় হয় শান্তি স্বরূপ ভাটনগরের সাথে। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের মধ্যে বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ইম্পেরিয়াল কলেজে শুরুতে সুনির্দিষ্ট

কোন অধ্যাপকের সাথে কাজ করার পূর্ব-পরিকল্পনা সাহার ছিল না। প্রথম কয়েক দিন ঠিক বুঝতেও পারছিলেন না কোত্থেকে শুরু করবেন। মেঘনাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী স্নেহময় দত্ত তখন ইম্পেরিয়াল কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি করছেন। তিনি সাহাকে পরামর্শ দিলেন প্রফেসর ফাউলারের সাথে কাজ করতে। প্রফেসর ফাউলারের গবেষণার সাথে মেঘনাদ পরিচিত। বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিদ স্যার নরম্যানলক্ইয়ারের ছাত্র ফাউলার ছিলেন 'নেচার' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। ফাউলার নক্ষত্রের বর্ণালী নিয়ে গবেষণা করছিলেন সে সময়। মেঘনাদ সাহাকে প্রথম দেখে প্রফেসর ফাউলার মনে করেছিলেন যে অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের মত সাহাও পিএইচডি করতে এসেছেন তাঁর কাছে। কিন্তু সাহা যখন বললেন যে তিনি এসেছেন মাত্র কয়েকমাসের জন্য নিজের তত্ত্ব যাচাই করে নিতে- তখন ফাউলার মোটে ও পাত্তা দিলেন না তাঁকে। কিন্তু কিছুদিন পরই ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে সাহার "আয়নাইজেশান ইন দি সোলার ক্রোমোস্ফিয়ার" এ প্রকাশিত হলে ফাউলারের ব্যবহার আগাগোড়া বদলে যায়।[৪] তিনি সাহাকে খুবই গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। ফাউলারের সাথে পাঁচ মাস কাজ করেছিলেন মেঘনাদ সাহা। এ সময় সাহা স্যার জে জে থমসনের কাছে অনুরোধ করেছিলেন কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশল্যাবে পরীক্ষা করে সাহার তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করে দেখার জন্য। কিন্তু স্যার থমসন জানালেন সাহার পরীক্ষণের জন্য যে উচ্চ-তাপমাত্রার দরকার- সে রকম যন্ত্রপাতি তাঁর ল্যাবে নেই। তিনি পরামর্শ দিলেন বার্লিনে গিয়ে প্রফেসর নার্নস্টের সাথে যোগাযোগ করতে। জার্মানির প্রতি মেঘনাদ সাহার একটা দুর্বলতা বরাবরই ছিল। জার্মানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সব সময়েই মুগ্ধ করেছে মেঘনাদকে। জার্মান ভাষা তাঁর জানা আছে। ১৯২০ সালে তিনি বার্লিনে গেলেন এক বছরের জন্য। লন্ডন থেকে যাবার সময় প্রফেসর ডোনানের কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু একই সময়ে সাহার মত আরো চৌদ্দ জন ছাত্র এরকম চিঠি নিয়ে গেছেন নার্নস্টের কাছে। প্রফেসর ওয়াল্টার নার্নস্ট তখন বিশ্ববিখ্যাত। ১৯২০ তেই নার্নস্ট পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন। নার্নস্ট শুরুতে লন্ডন থেকে আসা কোন ছাত্রকেই তাঁর ল্যাবে ঢুকতে দিতে রাজী হননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হেরে যাওয়ার কারণে ইংল্যান্ডের ওপর অনেক রাগ নার্নস্টের। পরে অবশ্য তিনি সাহাকে তাঁর ল্যাবে কাজ করতে দিতে রাজী হয়েছিলেন। কারণ হিসেবে সাহাকে তিনি বলেছিলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গালে শেষ চড়টা ভারতই মারবে।"[৫] বার্লিনে থাকাকালীন মেঘনাদ সাহার সুযোগ হয় ম্যাক্সপ্ল্যাংক, আর্নল্ড সামার ফেল্ড ও আলবার্ট আইনস্টাইনের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবার। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রথম অনুবাদক সাহা ও বসু। শুধু তাই নয় ১৯১৯ সালে আইনস্টাইনের সার্বিক তত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়ার পর আইনস্টাইন যখন রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেছেন তখন ভারতীয় সংবাদপত্রে আইনস্টাইনের কাজ সম্পর্কিত প্রথম রচনাটি ও মেঘনাদ সাহাই লিখেছিলেন।[৬] বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে ও সাহার ব্যক্তিগত পরিচয় হয় বার্লিনে এসে সামারফেল্ডের মাধ্যমে। বার্লিনে বসে মেঘনাদ সাহা জার্মান ভাষায় গবেষণা পত্র রচনা করেনএবং তা জার্মানির বিখ্যাত সাময়িকী 'Zeitschrift fur Physik' এ প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে।[৭]

১৯১৯ সালটি শুধু মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যই গুরুত্বপূর্ন নয়, বরং এ

বছরটি ভারতীয় মুক্তিকামী আন্দোলনের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার ঠিক পর-পরই এইবছর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বিতর্কিত রাওলাট আইন জারি করে। এই আইনের আওয়ায় যে কোন ব্যক্তিকে সন্দেহের বশে এবং কোনো রকম আপিল করার সুযোগ প্রদান ছাড়াই আটক করে রাখা যাবে এবং তাদের আইনি সুবিধাবঞ্চিত করা যাবে। এই আইনের বিরুদ্ধে সারা ভারতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে আন্দোলনের তীব্রতা বাংলা এবং পাঞ্জাবেই সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। এই আইনের প্রেক্ষিতেই মহাত্মা গান্ধী সত্যগ্রহ চালু করেন। ব্রিটিশ সরকার সেই সময় যেখানে সম্ভব হয়েছে কঠোরভাবে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেছে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসারের জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি নৃসংশ ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ কর্নেল রেজিনাল্ড ডায়ের একটি নিরস্ত্র প্রতিবাদের উপর নির্বিচারে গুলি করার আদেশ দিলে প্রচুর প্রাণহানি ঘটে। মেঘনাদ সাহা এর প্রতিবাদে লেখালেখি করেন। বিদ্যমান নৃশংসতায় মনোবল হারিয়ে তিনি পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করেন। নিজের জ্ঞান দিয়ে তিনি ভারতের উন্নয়নকল্পে মনোনিবেশ করেন।অন্য অনেক বিদুষকের বিপরীতে মেঘনাদ সাহা ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা যেমন- নদী ব্যবস্থাপনা, রেলওয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ভারতের বিদ্যুৎব্যবস্থা এসব নিয়ে লেখালেখি করেন এবং ভারতজুড়ে এসব বিষয়ে সাংস্কৃতিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তাঁর সারা জীবনের অন্যতম প্রেরণা ছিলো জাতির জন্য বিজ্ঞান সচেতনতা এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমেই জাতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। ১৯৩১ সালে তিনি 'Academy of Sciences of the United Provinces of Agra and Oudh' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এরপরের বছর তিনি এর প্রেসিডেন্ট নিয়োজিত হন।

মেঘনাদ সাহাকে পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত করার চেষ্টা করেছিলেন ১৯২৭ এর পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী আর্থার কম্পটন। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণায় ভাটা পড়ার কারণেই হোক বা দেশীয় বিজ্ঞানীদের বিরোধিতায়, নোবেল প্রাইজ় তিনি পাননি। তাঁর জীবনযাপনের দিকে চোখ রাখলে বোঝা যায়, নোবেল পুরস্কারের মুখাপেক্ষীও ছিলেন না তিনি। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল বিজ্ঞানের হাত ধরে জাতিভেদ, অসাম্যকে জয় করা এবং তথাকথিত উঁচু তলার মানুষদের তৈরি করা বিভাজন রেখাকে মুছে ফেলা। আমৃত্যু সেই কাজটাই করে গিয়েছেন মেঘনাদ নিষ্ঠার সঙ্গে।একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিজ্ঞান সংগঠক মেঘনাদকে না পেলে ভারত বিজ্ঞান গবেষণায় সাবালক হয়ে উঠত না। কংগ্রেসের চরকা কাটার নীতির বিরোধিতার কারণে দেশের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল না, যা বাধা সৃষ্টি করেছিল মেঘনাদ সাহার কর্মকাণ্ডে। স্বাধীনতার পরে, ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি কমিশনেও তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংগঠক হিসেবে নিজের কাজ করে গিয়েছেন তিনি। এশিয়া মহাদেশের প্রথম সাইক্লোট্রন যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করা, প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরিও তাঁর সাহসী পদক্ষেপের পরিচয় বহন করে। এছাড়াও দেশীয় উপাদানে নিজের বিটা স্পেকট্রোমিটারও তৈরি করেছিলেন অধ্যাপক সাহা, যার সাহায্যে ভারতীয় খনিজ পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা জরিপ করা, এ দেশে জীববিজ্ঞানের গবেষণাকেন্দ্রিক বিজ্ঞান বা নিউক্লিয়ার সায়েন্সের প্রয়োগ তাঁর হাত

ধরেই শুরু হয়।[৮] কলকাতায় ফিরে আসার পর বিজ্ঞানের পাশাপাশি রাজনীতিতেও কিছুটা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন অধ্যাপক সাহা। ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকাকালীন সুভাষ বসুর সাথে পরিচয় ছিল সাহার। কলেজ স্ট্রিটের মেসে ও যাতায়াত ছিল সুভাষ বসুর। অধ্যাপক সাহা তাঁর 'সায়েন্স এন্ড কালচার' জার্নালে প্রবন্ধ লিখলেন ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে এবং প্রায় সাথে সাথেই নেতাজী সুভাষ বসু মেঘনাদ সাহাকে অনুরোধ করলেন 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি' গড়ে তোলার ব্যাপারে কাজ করার জন্য। কাজ শুরু করলেন মেঘনাদ সাহা। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা ও শিল্পপতিদের সাথে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে মেঘনাদ সাহার। ১৯৩৯ সালে জাতীয় জ্বালানী নীতিতে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেন মেঘনাদ। জহরলাল নেহেরু তাঁকে সমর্থন করেন। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য ও দুটো সাব-কমিটির সভাপতি ছিলেন মেঘনাদ সাহা। 'শিক্ষা' এবং 'জ্বালানি ও শক্তি' কমিটির সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক সাহা দেশের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা-ব্যবস্থা, জ্বালানি ও শক্তি সমস্যা সমাধানের বিস্তারিত পরিকল্পনা জাতীয় কমিটিতে পেশ করেন। নৌ পরিবহন ও সেচ-প্রকল্পের উপ-কমিটির ও সদস্য ছিলেন মেঘনাদ সাহা। সেচ প্রকল্পের কমিটির সদস্য হিসেবে মেঘনাদ সাহা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী শাসনে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দেন। আমেরিকার টেনেসি নদীর জলনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মত করে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশান গঠন করার জন্য সাহার প্রস্তাব ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে গৃহীত হয়। অধ্যাপক লরেঞ্জ-এর কাছ থেকে সাহা সাইক্লোট্রনের উপর অভিজ্ঞতা অর্জন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইক্লোট্রন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তিনি সাইক্লোট্রন স্থাপনের জন্য দোতলা ভবন তৈরি করে দিলেন। নেহেরুর সাহায্যে টাটা শিল্পগোষ্ঠীর কাছ থেকে ষাট হাজার রুপি পাওয়া গেছে। বিড়লা গোষ্ঠী ও প্রায় সম পরিমাণ টাকা দিয়েছে। কিন্তু সাইক্লোট্রনের যন্ত্রপাতির যা দাম তাতে এই টাকা খুব সামান্য। তবুও কাজ থেমে থাকলো না। কলকাতায় স্থাপিত হলো ভারতবর্ষের প্রথম সাইক্লোট্রন। এবং তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হলো 'ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইনস্টিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এর দু'বছর পর ১৯৫০ সালের ১১ই জানুয়ারি নোবেল বিজয়ী নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী আইরিন কুরি ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অধ্যাপক সাহা আমৃত্যু পরিচালক ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের। অধ্যাপক সাহার মৃত্যুর পর এর নাম হয় 'সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'।

মেঘনাথ সাহা শুধুমাত্র একজন সফল বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা চিন্তাশীল সক্রিয় রাজনীতিবিদ। তিনি বরাবরই তার বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীদের কাছে জাতীয় পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। তার রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শের বৈপরীত্য ছিল। তিনি দেখেছিলেন তৎকালীন সময়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা অনুযায়ী খাদি শিল্পের প্রতি আগ্রহ বেশি ছিল। তারা বৃহৎ আকারে শিল্প স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিল না এবং সেই

সময় কংগ্রেস নেতারা বৃহৎ শিল্প ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক অধ্যক্ষতা গ্রহণ করতেই বেশি আগ্রহী ছিল। তিনি বৃহত্তর ভাবে শিল্পায়নের গুরুত্ব বুঝেছেন সেই কারণেই তিনি মহাত্মা গান্ধী চিন্তাধারার অন্ধ ভক্ত ছিলেন না এবং সেই একই কারণে রাজনৈতিকভাবে তিনি ও নেহেরুর মধ্যে দূরত্ব ছিল।[৯] তিনি রাজনীতির পথে না এসেও দেশের জন্য কাজ করতে পারতেন এবং বরাবরই সেই মতনই বিভিন্ন কাজকর্ম করতেন। ভারতে নদী প্রকল্প বিষয়ে তিনি দেখেছিলেন যে পরিকল্পনা কমিশনে বিষয়টি ফুল ভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং গোড়াতেই পরিকল্পনা সম্বন্ধে অস্পষ্টতা রয়েছে। তাই শুধুমাত্র সাইন্স এন্ড কালচার ম্যাগাজিনে এডিটোরিয়ালের মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত ভ্রান্তি গুলির প্রতিবাদ ফলপ্রসূ হয়ে উঠছিলো না। তাই তিনি সংসদীয় ক্ষেত্রে এর প্রতিবাদ আবশ্যক মনে করেছিলেন। একই সাথে এর মাধ্যমে জনগণ এবং সরকারকে তাদের ভুলগুলি সম্পর্কে অবগত করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বড়দা শরৎচন্দ্র বসু তাকে সংসদে অনুগ্রহ করেন। শরৎচন্দ্র বসু এবং তার সহকর্মীরা মনে করতেন মেঘনাথ সাহা জাতীয় পরিকল্পনা বিষয়ে বহুদিন ধরে চিন্তাভাবনা করছেন এবং তার সুচিন্তিত মত ভারতের ভবিষৎ পরিকল্পনায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া উচিত, এবং ভারতীয় সংসদের তার উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[১০] তিনি বরাবরই মহাত্মা গান্ধীর চরকা-খাদি-হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রির বিরোধী ছিলেন। ফলে কংগ্রেসের নমিনেশন সংসদে যাওয়া সম্ভব ছিল না যদিও তার নাম কংগ্রেস নেতারাই প্রস্তাব করেছিলেন। তাকে তার মনোভাব ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হলেও তিনি তার সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। তার মতে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্লোগান অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২র নির্বাচনের সময় শরৎচন্দ্র বসু জীবিত ছিলেন না, তার স্ত্রী বিভাবতী বসু তাকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন। একজন বিজ্ঞানীর কাছে সংসদীয় সদস্য হওয়ার জন্য নির্বাচনে দাঁড়ানোর খুব একটা সহজ নয়, নির্বাচনে অর্থনৈতিক সাহায্যের থেকেও সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা ও জনবলের প্রয়োজন হয়। ১৯৫২ সালে ভারতীয় লোকসভার নির্বাচনে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র (বর্তমানে কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র) থেকে বামপন্থী দলের সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং জয়লাভ করে, তিনি বাম মনোভাবাপন্ন হলেও কোনদিন বামপন্থী দলের সদস্য ছিলেন না।[১১]

ভারতীয় পঞ্জিকা সংস্কারে মেঘনাদ সাহার অবদান অনস্বীকার্য।[১২] শকাব্দের সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর যোগাযোগ লক্ষ্য করে মেঘনাদ সাহা ভারতের বর্ষপঞ্জি শকাব্দ ধরে করার প্রস্তাব দেন। ১৯৫২সালে ভারত সরকার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম অবৈজ্ঞানিক পঞ্জিকা প্রচলিত থাকায় সরকারি কাজে সমস্যার মধ্যে পরে পঞ্জিকা সংস্কারে ব্রতী হয়।[১৩] মেঘনাদ সাহাকে পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত করে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয়।[১৪] কমিটির অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে এ সি মুখার্জি, কে কে দাফতারি, জে এস কারাডিকার, গোরক্ষ প্রসাদ, আর ভি বৈদ্য এবং এন সি লাহিড়ী অন্যতম। সারাভারতে একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকা প্রচলন করার উদ্যেশ্য সারা ভারতে প্রচলিত প্রায় ত্রিশটি পঞ্জিকা সংগ্রহ করে তাদের সংস্কার করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের ভাবাবেগকে মাথায় রেখে এটি সংস্কার করা হয়।

১৯৪৭ এ দেশ বিভাজনের সময় পশ্চিমবঙ্গ আন্দোলনের অগ্রগামী পুরুষ ছিলেন মেঘনাদ সাহা। হিন্দু দলিতদের ইসলামবাদের সঙ্গে যুক্ত করা ছিল সেসময়ের এক পুরানো সাম্রাজ্যবাদী খেলা। নমঃশূদ্ররা কখনই ইসলামের আশ্রয়ে কোন সুবিধা করতে পারেন নি। কিন্তু অনেকেই এই খেলার শিকার হন, যেমন- যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গের হিন্দু নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এই নেতাটি জিন্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানে মন্ত্রী হন, আপন সম্প্রদায়ের মানুষদের পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে বলেন। পরিশেষে তিনি দেখেন যে তাঁর মন্ত্রিত্ব তাঁকে কোন বাস্তব ক্ষমতার অধিকারী করেনি কারণ নমঃশূদ্ররা পূর্ব পাকিস্তানে বীভৎসভাবে অত্যাচারিত হলে তাঁর কথায় পুলিশ অবধি যায় না। সেই সঙ্গে তাঁর অনুভূতি হয়েছিল এই যে নমঃশূদ্ররা ইসলামবাদের ছলনা ও অত্যাচারের শিকার মাত্র হয়েছে। যোগেন মণ্ডল শেষে পাকিস্তানের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে আপন প্রাণ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেই পালিয়ে আসেন। তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানমনস্ক মেঘনাদ সাহা এই খেলার শিকার হন নি। জাতিভেদের আচারের কারণে তিনি সমস্যার শিকার হলেও জানতেন যে ইসলামবাদ নমঃশূদ্রদের জন্য কোন প্রকৃষ্ট বার্তা বহন করবে না। কলিকাতা এবং নোয়াখালীতে ১৯৪৬এর গণহত্যার পর অন্য সবার মতমেঘনাদ সাহা বুঝতেই পেরেছিলেন ইসলামীয় দেশে হিন্দু বাঙালী সংখ্যালঘুর কি নিদারুণ পরিণাম হতে পারে। তাই তিনি অন্য কিছু স্বাধীনচেতা বাঙালী বুদ্ধিজীবী যেমন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস, এঁদের সাথে একজোট হয়ে ১৯৪৭সালের ৭ই মে বাংলা বিভাজন করে বাঙালী হিন্দুদের জন্য পৃথক বাসভূমির দাবীতে সরব হন।[১৫] শেষে গণদাবীতে বাংলা কংগ্রেস এই আন্দোলনের পথিকৃৎ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে হাত মেলাতে বাধ্য হয় এবং ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর দেখা গেলো রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী কোন কমিটিতেই অধ্যাপক সাহাকে রাখা হয়নি। কিন্তু অধ্যাপক সাহা থেমে থাকেন নি। স্বাধীনতার পর হাজার হাজার শরনার্থীকে পুনর্বাসনের জন্য তিনি 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' গঠন করলেন। 'সায়েন্স এন্ড কালচারে' সরকারের কাজের আলোচনা ও সমালোচনা চলতেই থাকলো। হোমি ভাবাকে প্রেসিডেন্ট করে যখন এটমিক এনার্জি কমিশন গঠন করা হলো- অধ্যাপক সাহা তার বিরোধিতা করে যুক্তি দিয়েছিলেন, দেশে প্রয়োজনীয় পরমাণু-জনশক্তির অভাব যে রকম রয়েছে, তেমনি এখনো কোন সুষ্ঠু শিল্পনীতি গড়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় পরমাণু শক্তি কমিশন গড়ে তোলার কোন প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেননি। অধ্যাপক সাহা'র বিরোধিতা কমিশন গঠনে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি বরং তিনিই অনেকটা এক ঘরে হয়ে গেছেন তাঁর সোজাসাপ্টা কথার জন্য। রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা অনুভব করে ১৯৫১ সালে সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলেন অধ্যাপক সাহা। কংগ্রেসের রাজনীতির কঠোর সমালোচক হয়ে ওই বছরেই নির্দল হিসাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ালেন এবং কংগ্রেসের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে উত্তর-পশ্চিম কলকাতা আসনে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন অধ্যাপক সাহা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লম্বা ছুটি নিলেন। লোকসভায় তিনি সক্রিয় সদস্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন - শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে, শিল্পনীতিতে, নদী

ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে এবং বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত নীতিতে। ১৯৫২ সালে ভারত সরকারের সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ কাউন্সিলের অধীনে পরিচালিত দিন পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক সাহা। সারা ভারতে তিরিশ রকমের ক্যালেন্ডার প্রচলিত ছিল সেই সময়। বিভিন্ন ধর্মের, সংস্কৃতির এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন ছিল এই দিন-পঞ্জিকা গুলোতে। এগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য প্রমিত দিন-পঞ্জিকা তৈরি করার দূরূহ কাজ সফল ভাবে সম্পাদনা করেছিলেন অধ্যাপক সাহা ও তাঁর কমিটি।[১৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে মেঘনাদ সাহা শুধুমাত্র একজন সফল বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা চিন্তাশীল সক্রিয় রাজনীতিবিদ। তিনি বরাবরই তার বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীদের কাছে জাতীয় পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শের বৈপরীত্য ছিল। তিনি দেখেছিলেন তৎকালীন সময়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা অনুযায়ী খাদি শিল্পের প্রতি আগ্রহ বেশি ছিল কিন্তু কোন পরিকল্পনা বা তারা বৃহৎ আকারে শিল্প স্থাপনের জন্য তেমন কোন আগ্রহ ছিল না এবং সেই সময় কংগ্রেস নেতারা বৃহৎ শিল্প ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক অধ্যক্ষতা গ্রহণ করতেই বেশি আগ্রহী ছিল। তিনি বৃহত্তর ভাবে শিল্পায়নের গুরুত্ব বুঝেছেন সেই কারণেই তিনি মহাত্মা গান্ধী চিন্তাধারার অন্ধ ভক্ত ছিলেন না এবং সেই একই কারণে রাজনৈতিকভাবে তিনি ও নেহেরুর মধ্যে দূরত্ব ছিল।তিনি রাজনীতির পথে না এসেও দেশের জন্য কাজ করতে পারতেন এবং বরাবরই তেমন ভাবেই আমৃত্যু দেশ ও জাতির স্বার্থে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজকর্মে সক্রিয় ভাবে সহযোগিতাকরেগেছেন। ১৯২০সালে মেঘনাদ সাহার তাপীয় আয়নায়নের সমীকরণ (আয়নাইজেশান ইকুয়েশান) প্রকাশিত হবার পর থেকে ১৯৩৮সাল পর্যন্ত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে যত গবেষণা হয়েছে তাদের প্রায় সবগুলোই সাহার সমীকরণ দ্বারা প্রভাবিত। নরওয়ের বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী সেভিন রোজল্যান্ড অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত "থিওরেটিক্যাল এস্ট্রোফিজিক্স" বইতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এ'কথা। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পারমাণবিক তত্ত্ব থেকে শুরু করে বিগ-ব্যাং তত্ত্বের পরীক্ষণ পর্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে যে যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে সেই সাইক্লোট্রনের উদ্ভাবক নোবেল বিজয়ী আর্নেস্ট লরেন্স সহ অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছেন মেঘনাদ সাহা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে।

সূত্র নির্দেশ

১. অরিন্দম, উপেক্ষিত ও বিস্মৃত বিজ্ঞানসাধক মেঘনাদ সাহা, ১লা নভেম্বর, ২০২০. https://www.4numberplatform.com/?p=21863
২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা নভেম্বর, ২০১৮.
৩. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য- Sur, Abha, Dispersed Radiance: Caste,

Gender & Modern Science in India, Navayana Publishers, New Delhi, 2012.
৪. Saha, M. N., Ionization in the solar chromosphere. Philosophical Magazine, 1920, p.472.
৫. বিস্তারিততথ্যেরজন্যদ্রষ্টব্য- Anderson,Robert S.,Building scientific institutions in India: Saha and Bhabha. Montreal: McGill University, 1975.
৬. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য- দেব,প্রদীপ,আইনস্টাইনের কাল, মীরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬.
৭.Saha, M. N., Versucheiner Theorie der Physikalischen Erscheinungen-beihohen Temperaturen, etc. Z. F. Physik, 1921. p.40.
৮. জ্যোতির্বিজ্ঞানের পণ্ডিত ডেভিড ডিভরকিন-এর সাক্ষাৎকার, দেশ পত্রিকা, অক্টোবর সংখ্যা, ৯ অক্টোবর ১৯৯৩.
৯. Kamal, A., A centenary tribute to Meghnad Saha, Bulletin of the Astronomical Society of India, V.22, 1994, pp.105 -110.
১০. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য- Chatterjee, Santimay, Gupta, Jyotirmoy(ed.), Meghnad Saha in parliament, Asiatic Society, Calcutta, 1993.
১১. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য- Naik,Pramod V., Meghnad Saha: His Life in Science and Politics, Switzerland: Springer International Publishing, 2017.
১২. Saha, M. N.,(Chairman), Calendar Reform Committee, Government of India, Report of the calendar reform committee, Council of Scientific and Industrial Research, 1955, New Delhi.
১৩. Vigyan Prasar, Saha, Meghnad: A Pioneer of Astrophysics, 8th September, 2019. <http://vigyanprasar.gov.in/saha-meghnad/
১৪. The Quint, Happy 'Saka' New Year 1941: Story Behind India's National Calendar, 22nd March, 2019. <https://www.thequint.com/news/india/indian-national-calendar-saka-calendar-new-year-22-march-1941>
১৫. দাশ,শ্যামলেশ,দূরদর্শী রাজনীতিক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৭,পৃ.৭২।
১৬. Sur, Abha, Scientism and social justice: Meghnad Saha's critique of the state of science in India, Historical Studies in the Natural Sciences, 2002. pp.87-105.

কাকমারা জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ড. কৃষ্ণ কুমার সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)
পশ্চিম মেদিনীপুর

সারাংশ

কাকমারারা ভ্রাম্যমান একটি জাতি। এরা মূলত মেদিনীপুর জেলায় বসবাস করেন। অস্থায়ী আস্তানা তৈরি করে তারা ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করেন। মেদিনীপুরে আনুমানিক প্রায় সাত-আটশো কাকমরা পরিবারের সন্ধান দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৫১ এর জনগণনায় এরা নিজেদের মাদ্রাজী বলে পরিচয় প্রদান করেছিলেন। তবে বর্তমানে তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। এখন তারা স্থায়ী ভাবে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছেন। তবে তারা রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক জীবনে অবহেলিত। তাদের জীবন যাত্রাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে একটি গল্প (আম্মা), একটি উপন্যাস (নীল দুঃখের ছবি) ও একটি চলচিত্র (দখল)। যেগুলি নাগরিক জীবনে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু কাকমারাদের আর্থ-সামাজিক জীবন প্রনালীতে তেমন কোন রকম পরিবর্তন ঘটেনি। আলোচ্য প্রবন্ধে কাকমারাদের জাতিপরিচিতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও চলচিত্রে বর্ণিত জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সূচক শব্দ: কাকমারা জাতি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, জীবন বৃত্তান্ত, ইত্যাদি।

ভূমিকা

কাকমারারা একটি যাযাবর গোষ্ঠী। মূলত খাদ্যসংগ্রহের কারণে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করে। এদের দেখতে পাওয়া যায় মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব সমতলে কাঁথি, তমলুক মহাকুমার বিভিন্ন স্থানে।[১] এদের এখনো সাত-আটশো পরিবারের অস্তিত্ব দেখা যায়। এদের জীবন যাত্রায় বিভিন্ন কৌতূহলোদ্দীপক আচরণের অনুপ্রবেশ দেখা যায়। এরা শ্মশানে ফেলে-দেওয়া হাঁড়ি-কলসী কুড়িয়ে নিজেদের রান্নার কাজে ব্যবহার করে, মড়াপোড়ানো অর্দ্ধদগ্ধ কাঠও দৈনন্দিন কাজের জন্য ব্যবহার করে। এদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান থাকে না। তবে তারা অস্থায়ী আস্তানা গড়ে তোলে। এই অস্থায়ী আস্তানাতে চলমান কাকমারারা বছরের কোন না কোন সময়ে ফিরে আসে। এই ক্রমচলিষ্ণুতা তাদের এক যাযাবর গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে।

কাকমারারা নিজেদের মধ্যে ভাঙ্গা তেলেগুতে কথা বলেন। তবে স্থানীয়দের মধ্যে তারা ভাঙ্গা বাংলাতেও কথা বলেন। ১৯৫১ সালের আদমসুমারিতে 'মাদ্রাজী' হিসেবে এরা নিজেদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।[২] যাযাবর হওয়ার কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের মধ্যে সমাজ বন্ধন বেশ শিথিল। সাধারণত বাজারের কাছে, বা কোন

মেলার ধারে বা বড় গাছের নীচে বা কোন পুষ্করিনীর পাড়ে এরা নিজেদের আস্তানা গড়ে তোলে। কেমন উপার্জন হচ্ছে তার পরিমানের উপর নির্ভর করে তারা সেখানে থাকার সময় সীমা নির্ধারণ করে। সাধারণত একনাগাড়ে দশ থেকে তিরিশ দিন পর্যন্ত তারা একস্থানে থাকেন। ভিক্ষাবৃত্তিই এদের প্রধান উপার্জনের উৎস। কাকমারারা অনেক সময় পরিত্যক্ত দোকানঘর বা বন্ধ থাকা স্কুল বাড়ির খালি ঘর দু-এক রাতের তাৎক্ষণিক আবাস হিসাবে ব্যবহার করেন। গাছতলায় থাকার সময় গাছের উঁচু ডালে কাকমারারা তাদের বিছানাপত্র রেখে দেয়। এর পাশাপাশি তারা অন্যান্য তৈজসপত্রও ঝুলিয়ে রাখে। যদিও তারা যাযাবর বৃত্তির মাধ্যমে ভ্রমণান্তে জীবিকা সম্পন্ন করেন তবুও মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে তাদের আধাস্থায়ী বাসস্থান দেখা যায়। এখানে মূলত তাদের পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ্যরা ও শিশুরা আশ্রয় নেয়। একটু সুস্থ হলেই তারা আবার যাযাবরের মত দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়। প্রবোধ কুমার ভৌমিক জানিয়ছেন, 'কাঁথি, তমলুক এবং সদর মহাকুমার নানা জায়গা এই যাযাবরদের প্রধান বিচরণ ভূমি। প্রতিবেশি রাজ্য ওড়িষ্যার বালেশ্বর ও পুরী জেলাতেও এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।' তিনি আরো জানিয়েছেন, 'এই কাকমারারা আজ প্রায় দুশো বছর মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় নিজেদের মৌল বৈশিষ্ট্যের অনেকখানিই হারিয়ে বসে আছে।'[৩] তবে ইদানিংকালে কাকমারারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আগ্রহী হয়েছেন।

জনসংখ্যা ও বাসস্থান

কাকমারারা যেহেতু যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করেন তাই তাদের প্রকৃত সংখ্যা জানা খুব দুরুহ ব্যপার। প্রবোধ কুমার ভৌমিক কাকমারাদের চারটি আস্তানাকে বেছে নিয়ে তাদের সংখ্যার একটা পরিচয় প্রদান করেছেন।[৪] তিনি মূলত কাকমারাদের বিচরণক্ষেত্র স্বরূপ কাঁথি মহাকুমার বিভিন্ন গ্রামকে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৫৮-৫৯ সালের তার ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক তথ্য থেকে আমরা কাকমারাদের ১৯টি পরিবারের সন্ধান পাই। কাঁথি শহরের কাছেই কৃষ্ণনগর গ্রামে ১৯৪২ সালের বিধ্বংসী ঝড়ের পর আটটি কাকমারা পরিবার এখানে অস্থায়ী আস্তানা গেড়ে ছিল। স্থানীয় জমিদার এদের কিছু নিষ্কর জমি দিয়ে এখানে বসবাস করার জন্য বিধিমত অনুমতি দিয়েছিলেন। ওদের আস্তানাটি ছিল গ্রামের এক কোণে বালিয়াড়ির ধারে। প্রবোধবাবু জানিয়েছেন তার ক্ষেত্র সমীক্ষার কালে আটটি পরিবারের মধ্যে পাঁচটি পরিবারই তাদের দৈনন্দিন জীবিকানুসন্ধানের কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলো। ডিঙ্গলবেড়িয়াতেও কাকমারাদের বস্তি দেখা যায়। এরপর বাজিতপুরের বস্তিতে কাকমারাদের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে কাঁথি জেলায় অবস্থিত খেজুরীর একটি গ্রাম চিঙ্গুরদন্যা। এখানে কাকমারাদের দেখতে পাওয়া যায়।[৫] এরা স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চাইছেন।

বৃত্তি বা জীবিকা

কাকমারারা প্রধানত ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমেই তাদের জীবন অতিবাহিত করেন।[৬] এদের বাৎসরিক ভ্রমণের সময় এলে দু একটি পরিবার একত্রে ঘুরে বেড়ায়। খুব ভোরে পান্তাভাত খেয়ে কাছাকাছি গ্রামে ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য তারা রওনা দেন। যে পরিবারের

যেমন লোকসংখ্যা, সেই অনুপাতে তারা দুই বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দল বেঁধে বেড়িয়ে পড়ে। এদের পুরুষদের পোশাক বড়ো বিচিত্র। ভিক্ষায় বেরোনোর আগে মাথায় একটা পাগড়ী বা রঙিন ফেট্টি বেধে নেয়—কপালে পরে সিঁদুরের টিপ, ডান হাতে লোহার বালা এবং আত্মরক্ষার জন্য হাতল-বিহীন একটা ধারালো ছুড়ি তারা সঙ্গে রাখে। এছাড়া তাদের সাথে থাকে তালপাতার তৈরি একটি ঝোলা, একটা চাটাই, আর পাখি মারার জন্য খুব ছোট ও সূচীমুখ বর্শা। সঙ্গের পোষা কুকুরগুলি গাছের ডালে ঝোলানো তাদের বিছানাপত্র ঐ তৈজসাদি পাহারা দেয়। মেয়েরা সবসময়েই তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়েই বাইরে বেরোয়। খুব ছোট শিশুদের কাপড়দিয়ে পিঠে বেঁধে নেয়। বেশি বেশি ভিক্ষা পাওয়ার জন্য এরা চুড়ে সুরে 'গোবিন্দ'/ভগবানের নাম কীর্তন করে এবং সাধারণত প্রত্যেক বারেই ভিক্ষা পাবে, এমন লোকের কাছেই আবেদন করে। যত্রতত্র থু থু ফেলে জায়গা অপরিষ্কার করার রেওয়াজ এদের মধ্যে দেখা যায়। মাঝে মাঝে শরীরের নানা জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে রক্তপাত ঘটিয়ে তারা সাধারণমানুষের সহানুভূতি আদায় করে প্রচুর পরিমানে ভিক্ষা, পুরানো কাপড় সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। কাকমারাদের অনেকে ছাগল, কুকুর এবং বেড়ালের নির্বীজকরণের কাজ করে থাকে। কেউ যদি এর জন্য তাদের সাহায্য চায়, তবে তারা কিছু অর্থের বিনিময়ে সেই কাজ করে দেয়। স্থানান্তরে যাতায়াত করলেও তারা শুয়োর প্রতিপালন করে। অনেকে দিনমজুরির কাজ বা রিক্সা চালিয়েও সংসার প্রতিপালন করেন।[৭]

যাযাবর বৃত্তির কারণ অন্বেষণ

কাকমারাদের যাযাবর বৃত্তির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। এরা নিজেদের অহির (?) বলে পরিচয় দিয়েছেন। অনেকদিন আগে তারা তাদের নিজের দেশ ত্যাগ করে বাংলার এই অঞ্চলে চলে এসেছে। নিজেদের দেশে গরু-ছাগল-শুয়োর চরাতো এবং কারো কারো ঐসব পোষবার খোঁয়াড়ও ছিল। দারিদ্র ও বারংবার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে তারা যাযাবরবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মেদিনীপুরে বসবাসরত স্থানগুলোকে তারা খাদ্য নিরাপত্তার কারণে বেশ পছন্দ করে। এখানে প্রয়োজনমতো খাদ্য সামগ্রী তারা জোগাড় করতে পারে। কিছু ঘাটতি থাকলে তারা সেটা ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করে নেয়। কৃষিকর্ম এদের কৌলিক পেশা নয়। মেদিনীপুরের কোথাও তাদের কৃষি শ্রমিক হিসাবে উল্লেখ করা হয় নি। এই জেলায় দীর্ঘদিন বসবাস করতে করতে মূল বাস-ভূমির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেলেও এরা নিজেদের মধ্যে ভাঙা তেলেগু ভাষায় কথা বলে। দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের ফলে তাদের মাতৃভাষা আর তারা বুঝতেও পারে না। মেদিনীপুরের বাইরে একমাত্র কাকদ্বীপে কিছু পরিমাণ কাকমারাদের দেখা যায়।[৮]

সামাজিক অবস্থান

সামাজিক স্তরবিন্যাস অনুযায়ী কাকমারাদের অবস্থান একেবারে নীচের থাকে। মূলস্রোতের মানুষজন তাদেরকে অচ্যুত হিসেবে গণ্য করেন। তাদের মধ্যে আইনগ্রাহ্য অপরাধ প্রবণতা খুব কম। তবে খাদ্যাভাবে তারা অনেকসময় খাদ্যদ্রব্য গোপনে সংগ্রহ করেন। অন্যান্য নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায়রা অনেক সময় তাদের কাছে আশ্রয় নিয়ে আর

তাদের বর্গে ফিরে যান নি। প্রবোধ বাবু এরকম পাঁচজন সদস্যের হদিশ পেয়েছিলেন। যারা দারিদ্রের কারণে কাকমারাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সদস্যদের নিজেদের পূর্বতন পরিচয় মনে থাকলেও তাদের পরিজনরা তাদের আর ফিরে পেতে চান না। বা আত্মীয় স্বজনরা আর তাদের খোঁজ খবর রাখেন না। স্থানীয় কোন স্থানে যদি দরিদ্র নরনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা হয় তাহলে কাকমারারাও সেখানে এসে সামিল হয়। তবে তাদের আহার গ্রহণের পর নিজদেরকেই সেই এঁটো পাতা তুলে খাওয়ার জায়গা পরিষ্কার করে দিতে হয়।[৯]

সামাজিক গঠন

কাকমারারদের সমাজ মূলত দুটি ভ্রাত্রীয় দলে বিভক্ত। নিজেদের ধর্মগুরু হিসেবে মান্য করে, এমন দুজন ব্যক্তির নামে এই ভাগটি হয়েছে। এই দুজন গুরু হলেন রাম সিং এবং নারায়ণ দাস। এই কারণে রাম সিং গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নামের শেষে 'সিং' এবং নারায়ণ এর দলের লোকেরা 'দাস' বা 'সরদার' পদবী গ্রহণ করে থাকে। সমস্ত কাকমারা পরিবারই এই দুই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এদের বক্তব্য হচ্ছে যে, এরা আদিতে সবাই রাম সিং গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু অনেককাল আগে ঘটনাচক্রে কেউ একজন অজ্ঞাতসারে নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই বিয়ে করে ফেলে। তখন সামাজিক নীতি অনুসারে ঐ ব্যক্তিকে তার গুরু পরিবর্তন করতে হয়। এই সময় থেকেই একদল রাম সিং এর দলে এবং বাকিরা নারায়ণ দাসের দলে বিভক্ত হয়ে যায়।[১০]

কাকমারাদের পরিবার গঠনে তিনটি ধাঁচ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্র, পরিবর্ধিত এবং যৌথ। যেখানে বিধবা মা বা বাবা তাঁর বিবাহিত পুত্রের সঙ্গে বসবাস করে, সেটি হলো বর্ধিত গোষ্ঠী। যৌথ পরিবারে বিবাহিত পুত্র তার অভিভাবকদের সঙ্গে একত্রে থাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে কাকমারাদের প্রচুর ক্ষুদ্র পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রবোধ কুমার ভৌমিক কৃষ্ণনগর এলাকায় ১৪টি ক্ষুদ্র কাকমারা পরিবারের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই পরিবারে চার ব্যক্তির বৃদ্ধা মা জীবিত ছিলেন এবং একজনের দুই বিবাহিত পুত্র সস্ত্রীক তার সঙ্গে বসবাস করতো। কাকমারাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সম্প্রদায়গত পঞ্চায়েত নেই। যখন কোন সমস্যা দেখা দেয় তখন তাদের সমাজের বয়স্করা একত্র হয়ে অপরাধীর বিচার করে। তারা অপরাধীকে প্রহার ও জরিমানা করে এমনকি অপরাধী মহিলাদের শারীরিক ক্ষতও করার রেওয়াজ আছে।[১১]

বস্তুগত সংস্কৃতি

কাকমারাদের বসতবাড়িগুলি আয়তক্ষেত্রাকৃতির হয়। গাছের ডাল পুঁতে তাতে গোবর-কাদা লেপে এরা ঘরের দেওয়াল তৈরি করে। পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে খড় সংগ্রহ করে তারা এই বাসগৃহের ছাউনি দেন। তাদের তৈরি বাড়ি গুলির দরজা খুবই নিচু। তাদের গৃহে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয় এবং তাতে কোন আগড় থাকে না। কোন পরিকল্পনা বা ধাঁচ এই সব কুঁড়ে তৈরিতে তারা ব্যবহার করেন না। কাকমারাদের ঘরের তৈজসপত্রাদি খুবই অকিঞ্চিৎকর। একটা বা দুটো লোহার বা জার্মান সিলভারের বা মাটির বাসন কোসন বা রাঁধবার হাঁড়ি-কুঁড়িই এদের সম্বল। খেজুর পাতার চেটাই এদের বিছানা।

পোশাক বা গহনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরা একেবারে হতদরিদ্র। সম্ভাদরের পুঁতির মালা ও চুড়ি এরা ব্যবহার করে। মেয়েরা কপালে এবং ওপর হাতে উল্কি ব্যবহার করে থাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে জানাগেছে অনেকের কিছু কিছু সোনা ও রুপোর গহনা থাকে। অনেকের আবাদী জমিও থাকে। কাকমারাদের প্রধান খাদ্য ভাত। বাজার বা স্থানীয় জনপদ থেকে ভিক্ষাকরা তরি তরকারি এবং সব ধরনের মাছ তারা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। এরা বেঁজি, ভোঁদোড়, ধেড়ে ইঁদুর, কাকশিকার করে তাদের মাংস ভক্ষন করে।[১২] মাছ ধরার জন্য এরা খুব কম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। এরা মাছ ধরার জন্য ছিপ ও নেট জাল ব্যবহার করেন। অনেকে আবার জলে নেমে শুধুমাত্র হাতরিয়ে হাতরিয়ে মাছ ধরেন। অনেকে আবার ছিপ বঁড়শি দিয়েও মাছ ধরে। কাকমারাদের বেশির ভাগ সদস্যরাই মদ্যপানে বিশেষভাবে আসক্ত। কাকমারারা খেজুরের রস গেঁজিয়ে মদ তৈরি করে তা পান করেন। নারী-পুরুষ একত্রে তারা মদ্যপান করেন। পানদোক্তা তাদের অতি প্রিয় নেশা।

আচার অনুষ্ঠান

কাকমারাদের জীবন প্রবাহের আচার অনুষ্ঠান খুবই সামান্য; যেমনও- শিশুর জন্ম, যৌবন প্রাপ্তি, বিবাহ এবং মৃত্যু সংস্কার। কোন মেয়ে সন্তান সম্ভব্য হলে তাদের খাওয়া দাওয়া ও চলাফেরা সম্পর্কে সামান্য কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। সন্তান প্রসবের পর পরিবারের কোন বর্ষীয়ান মহিলা বা কোন কোন ক্ষেত্রে সদ্য সন্তান প্রসবকারী মা নিজেই শামুকের খোলা দিয়ে শিশুর নাড়ি ছেদন করে। এরপর এক কলসী জল দিয়ে নব জাতককে ধোওয়া হয় এবং তিনদিন ঐ শিশুটিকে শুধু মধু খাইয়ে রাখা হয়। এরপর প্রসূতি শুধু নিজের হাত পা ধুইয়ে নেয় এবং তিনদিনের দিন ভালোভাবে স্নান করে। তিনদিন ঐ প্রসূতিকে শুধু আলুভাজা, কলা এবং তরল খাদ্য দেওয়া হয়। একুশ দিনের দিন আত্মীয়-স্বজনকে তাদের সাধ্য মতো কিছু ভালো খাবার দিয়ে আপ্যায়নের মাধ্যমে ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান করা হয়। নামকরণ বা অন্নপ্রাশনের কোন অনুষ্ঠান হয় না।[১৩]

যৌনতা প্রাপ্তির আচার

কাকমারা সমাজে মেয়েদের প্রথম ঋতু আরম্ভের অনুষ্ঠান বেশ মনোযোগের সঙ্গে পালন করা হয় এবং প্রথম ঋতুমতী হওয়ার সঙ্গে মেয়েরা তাদের মাকে স্বাগত জানায়। তখন তার জন্য বাড়ি থেকে একটু দূরে পৃথকভাবে খেজুর বা তালপাতা দিয়ে পশ্চিম খোলা একটি ছোট্ট কুঁড়ে তৈরি করে দেওয়া হয়। সেখানে তাকে তিন দিন থাকতে হয়। প্রত্যেকদিন বিকেলে তাকে তেল-হলুদ মাখিয়ে স্নান করানো হয় এবং খাদ্য হিসেবে দেওয়া হয় চালের তৈরি মিষ্টি লপ্‌সি। চারদিনের দিন অবগাহন স্নান করে সে বাড়ি ফিরে আসে। নির্জনপাতার কুঁড়েতে ঋতুমতী সদ্যযুবতী যদি একা থাকতে ভয় পায়, তবে সে সমবয়স্কা একজনকে সঙ্গী হিসাবে নিতে পারে।[১৪]

বিবাহ ব্যবস্থা

কাকমারাদের মধ্যে সাধারণত এক বিবাহের প্রচলন রয়েছে। বিধবা বিবাহ বা বিবাহ

বিচ্ছেদ তাদের মধ্যে অপ্রচলিত নয়। এরা এদের সমাজে বিভাজিত দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ করে থাকে। এদের মধ্যে আন্তর আত্মীয় বিবাহ (পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকেই) দেখা যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে কাকমারাদের পিসতুতো, মামাতো ভাইয়ের মেয়ে বা ছেলের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়।[১৫] পণ নিয়ে তাদের মধ্যে বিয়ের প্রচলন থাকলেও তাদের মধ্যে কন্যাপণ দেওয়ার কোন রীতি দেখা যায় না। এদের সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা বিধবা-বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছিন্নকারীদের মধ্যে বিবাহের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যেখানে স্ত্রী অলস বা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম বা দম্পতির মধ্যে যেকোন একপক্ষ দাম্পত্য পবিত্রতা নষ্ট করে, সেখানেই মাত্র বিবাহ-বিচ্ছেদ গৃহীত হয়।

বিবাহ-সংক্রান্ত আচার

ঋতুমতী হওয়ার পরেই সাধারণত মেয়েদের বিয়ে হয়। দূর আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে হলেও উভয় পক্ষের বয়স্কদের মধ্যে আগে বিয়ের আলোচনা করা হয়। বরযাত্রীসহ বর নির্দিষ্ট দিনে কনেকে বিয়ে করতে আসে। বাড়ির বয়জ্যেষ্ঠরাই বিয়ের দিন ঠিক করে। ভাদ্র ও চৈত্র মাস এদের পক্ষে অশুভ মাস। বর নতুন ঝুড়ি করে কনের কাপড়-চোপড়, একটি কাঠের জপ-মালা, একটি লোহার বালা, সিঁদুর, পান সুপারি এবং অল্প পরিমানে চাল নিয়ে আসে। বরের সঙ্গে থাকে একটি তালপাতার চাটাই। বরযাত্রীরা ওটিকে আসন হিসেবে গ্রহণ করে। এরপর একটি থালায় কিছু চাল, নটি পান, নটি সুপারি চারটি নগদ টাকা রেখে পাত্রের বাবা বা অভিভাবক পাত্রীর বাবাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। ঐগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার পর কনের বাবা তিনবার ঐগুলি বরকে ফেরৎ দিয়ে অবশেষে একেবারে নিয়ে নেয়। এরপরের অনুষ্ঠান হলো কনের বাবা বরের অভিভাবক ও সমাগত আত্মীয়দের অনুমতি নিয়ে বর কনেকে স্নান করাতে নিয়ে যায় ও স্নানের পর নতুন কাপড় পড়িয়ে বিবাহ স্থানে ফিরিয়ে আনে। কনের বাবাকে 'বাউর্দি' নামে একজন 'প্রধান বিবাহ পরিচালক' ঐসব কাজে সাহায্য করে থাকে। সে বরের কনের কাপড়ের আঁচলে গিঁট বেঁধে দেওয়ার পর বর-কনেকে উপস্থিত সকলকে নমষ্কার জানাতে এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে বলে। প্রধান বিবাহ পরিচালক উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এমন মত দেওয়ার এবং এই বিয়ের সাক্ষী থাকার কথা বলে বিবাহকার্যে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্য দম্পতিকে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে কনের ভাই চিৎকার করে দম্পতিকে বলে যে, 'তোমাদের যদি কোন মেয়ে হয় আমাকে দেবে তো?' দম্পত্তি উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ দেবো।' এরপর বর কনেকে দুটি পৃথক পাত্রে খেতে দেওয়ার পরই বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হয়।[১৬] এদের মধ্যে একটা সাধারণ রীতি আছে যে, দুটি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত বরকে ঘর-জামাই হয়ে থাকতে হয়। অন্যথায় শ্বশুরকে আরও চারটি টাকা দিতে হয়।

মৃত্যু সংস্কার

কাকমারাদের মৃত্যু হলে মৃতের মাথাটিকে উত্তর মুখো করে কবর দিতে হয় এবং এই কাজে সাহায্যের জন্য আত্মীয়-বান্ধবদের সংবাদ দিতে হয়। মৃতদেহকে কবর দেওয়াই এদের প্রচলিত প্রথা।[১৭] মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কবর দেওয়ার আগে মৃতদেহটিকে ভালো করে ধুয়ে

তেল-হলুদ মাখিয়ে নেওয়া হয়। তিনদিন তিনরাত্রি ঐ কবরটিকে পাহারা দেওয়া হয়। চতুর্থ দিন বুক-সমান উঁচু একটি মাটির স্তূপ ঐ কবরের ওপর তৈরি করে দেওয়া হয়। এরা দশদিন ধরে অশৌচ পালন করে এবং এগারো দিনের মাথায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। এই অনুষ্ঠান করানোর জন্য তারা তাদের একজন আত্মীয়কে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে পরিচালনার জন্য ডেকে আনে। সে এসে প্রথমে প্রধান শ্রাদ্ধাধিকারীসহ পরিবারের সমস্ত সদস্যের ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন করে। এর জন্য তিনি পারিশ্রমিক নেন। মৃত ব্যক্তি যেখানে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেখানটা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনটে কলাপাতা বিছিয়ে তার কাছে ঐ মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত সমস্ত সামগ্রী যেমন, মাথার পাগড়ী, লোহার বালা, গলার মালা, ছুরি ইত্যাদি জড় করে রাখে এবং ঐ তিনটি পাতার মধ্যে দুটির ওপর বাজার থেকে কিনে আনা ফলমূল, তরিতরকারী বিছিয়ে দেয়। আর তৃতীয় পাতাটির ওপর কিছু ভাত ও গুড় রাখে। এরপর একটি শুয়োরের বুকে চারজন যুবক সাতবার লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে তার শরীর থেকে পা ছিঁড়ে নেয়। একটা মুরগী বলি দিয়ে সেটিকে আলাদাভাবে রাখা হয়। মাটিতে আছাড় মেরে একটি কুমড়ো ফাটিয়ে সেটিকে রান্না করা হয়। এরপর আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখা চাল ও গুড় রান্না করার জন্য একটি মাত্র গাছ থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আনতে হয়। ঐ সমস্ত উপকরণই মৃতের আত্মাকে উৎসর্গ করা হয়। এরই মধ্যে ভাতের তিনটি নাড়ু করে একটি কবরের ওপর রেখে দিয়ে আসতে হয়। এইভাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আত্মীয়-পরিজনেরা ভোজে যোগদান করে।

ধর্ম ও উৎসব

এরা নিজেদের হিন্দু হিসাবে পরিচয় দেয়। কাজেই প্রতিবেশীদের দেখাদেখি এরা কালী-শীতলা ও মনসার পুজো করে।[১৮] নিজেদের সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ লোকেরাই পুরোহিত, ধোপা, নাপিতের আনুষ্ঠানিক কাজগুলি করে থাকে। অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক লোকেরা যে পৌরোহিত্যের কাজ করে, তাতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মতো মন্ত্র-তন্ত্র নেই। এরা কখনো কখনো পাঠা বলি দিয়ে থাকে। ঠাকুর-দেবতার আকার বা প্রকৃতি সম্পর্কে কোন স্থায়ী মানসিকতা বা বিচারবোধ গড়ে ওঠে নি। তাই একটা অস্পষ্ট ধারণা তাদের মন ও মানসিকতাকে সাময়িকভাবে ঘিরে রাখে। অবশ্য এরা কোন দেবতার প্রচণ্ড শক্তি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা পোষণ করে থাকে। তাই তাদের প্রীতি পাবার জন্যই উক্তবলির ব্যবস্থা। সমস্ত রকম রোগ দূরীকরণ বা আপেক্ষিক শান্তির জন্য তারা ঐসব ভীষণ দেবদেবীর পুজো করে। এই পুজো উপলক্ষে এরা ভাত পচিয়ে তাড়ি করে এবং পুজোর প্রসাদ হিসাবে তা গ্রহণ করে।

লোকসংগীত

গান কাকমারা জীবনের নিত্য সঙ্গী। তাদের সুখ, দুঃখের সাথে গান ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ভিক্ষা থেকে বিবাহ, প্রেম, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের বিবৃতি তারা গানের মাধ্যমেই প্রকাশ করেন।[১৯]

কাকমারারা যখন ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে যান, তখন তারা গান পরিবেশন করেন।

যেমন-

ওউম্ নুএ সিনি তুলছি মানু মাড়ানা পায়া
রামা-যেই যেই রামা।
বুঁউ এলি নাই ভুলোক দান্যম্
রামা যেই যেই রামা।
নিতি সোভো কাল্লা নুয়া।
নিতি সোভো কাল্লা নুয়া?
আদুয়ানাম্ মালা অঁউ
রামা—যেই যেই রামা
বল্ বলো তাল্লারা—
কুলি কুড়ি কুসা
ইঙ্কা নান্না লেগ বাইয়োয়
নামুদ্দু কৃষ্ণা
ইঙ্কা নান্না লেগ বাইয়োয়।।

অনুবাদ: ঈশ্বরের নাম নিয়ে এই ঘরে প্রবেশ করলাম। যেই রাম সেই রাম। হে রাম, তোমার নাম নিয়ে এই ঘরের দাতাকে আহ্বান করছি। এখন তাঁর নাম নিয়ে গান আরম্ভ হল। যাঁর নাম রামচন্দ্র, তিনি আমাদের ইষ্ট দেবতা। সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সারাদিনই আমাদের এই গান চলবে। হে ঈশ্বর, আপনি ভিক্ষাদানের জন্য দাতাকে নির্দেশ দিন এবং আমরা যেন ভিক্ষা পাই।

পথ চলতে চলতে কাকমারা যুবক যবতীদের দেখা হলে তারা গানের মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করে-

না আণ্টা রায়ে গল পড়সা-
উণ্টিকি রাইখালো ইচ্ছেনু গানি
না আণ্টা রায়ে গল পড়সা-
সেতি কু মুরগুল ইচ্ছেনু গানি
না অণ্টা রায়ে গল পড়সা
নেত্তি কু সাঁ উঁরু ইচ্ছেনু গানি
না আণ্টা রায়ে গল পড়সা

অনুবাদ: হে সুন্দরী তুমি আমার সাথে চলে এসো। আমি তোমার গায়ে চমৎকার জামা করে দিচ্ছি -তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো। তোমার হাতে সুন্দর চুড়ি দেব, তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো। তোমার মাথার জন্যে আতরের তেল এনে দেব। তুমি আমার সঙ্গে চলো এসো।

ঐ সুন্দরীও পথ চলতে চলতে উত্তর দেয়-

আসমাণ্টি রাইখালু
না খাড়া উণ্ডাই

পারোরি এরি গলা
তুম্ ম্যা খলু
পারোরি এরি গলা
তুম্ ম্যা খলু
আসমাণ্টি কাড়ি আলু
না খাড়া উণ্ডাই।
পারোরি এরি গলা
তুম্ ম্যা খলু।
পারোরি এরি গলা
তুম্ ম্যা খলু।।
আসমাণ্টি মুরণ্ডলু
না খাড়া উণ্ডাই
পারোরি এরি গলা-
তুম্ স্যা খলু।।

অনুবাদ: ঐরকম অনেক জামা আমার ঘরে পড়ে আছে। কেন তুমি আমাকে ডাকছো। ঐ রকম অনেক চুড়ি আমার পড়ে আছে—কেন তুমি আমাকে ডাকছো। ঐরকম অনেক সুগন্ধি আতর আমার পড়ে আছে—কেন তুমি আমাকে ডাকছো।

কাকমারারাদের বিবাহ যোগাযোগের গান-

সালুগা রাচ্চায়লু সাউরাঙ্গা দুন্নি।
এলুগা রাচ্চায়লু এক রঙ্গা দুন্নি।
পেল বিচ্চু মা-সেতা পিল্পু সদামা
নাড়ি পিচ্চু মা-সেতা নাড়াকা সদামা।
পিল্পু এনি সদামা সেলখা পালখলু।
নারোখে এমি সু সেউ আমসা নাড় খালু।।
ওলি এন্তা সাল এন্তাও পেদ্দা লা-লা।
আয় গুণা আর ওয়াই ওলি ডাব্বাই।
আখোনা তটাল্ল আরাইয়া উন্দি।।
শেষখুনা তটাল্ল আরাইয়া আমি উন্দি।।

অনুবাদ: তোমার মেয়েকা আনাও আমরা দেখবো। আমরা তার কণ্ঠস্বর শুনবো। আর তার চলবার ঢঙও আমরা দেখবো। তোমার কন্যাপন কত?

কন্যার পিতার উত্তর: তোমার পুত্র এখন কি কাজ করে?

আমার পুত্র ভিক্ষা করে জীবন কাটায়—অর্থাৎ যাযাবর জীবন কাটায়।

আচ্ছা, তোমার মেয়ের- বা জীবিকা কি?

আমার কন্যাও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়।

মন্ত্রে তন্ত্রে বিশ্বাস

কাকমারারা মন্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাস করে। সাপে কাটলে তারা নিজেরাই চিকিৎসা করে। এক্ষেত্রে তারা ঝাঁড়ফুঁক ও মন্ত্রের ওপর বিশ্বাস রাখে। বিষ নামাবার জন্য তাদের মন্ত্র[২০]-

তরু কাট্টানু ওঁত্রোঁ কাট্টানু
শালা মাণ্টা শালা কাট্টানু
ডাবু এঁড় সামদ্রোঁও
আরদি কাট্টানু
নাগ সেধেনি নাগ রডু
পাঁদ্দ ও সল্লাগা দিগু
স্যা—সা দিগু দিগু
দিগু না -গা
দুগু স্যা—সা
দিয়া সুন্দরী নাগাড়া দিগুরা

অনুবাদ: আমি মাথার দিকে বাঁধন দিচ্ছি। তার চার পায়ে যেন বাঁধন পড়ে। সর্বাঙ্গের বিষ যেন নেমে আসে। যেখানে তুমি খেয়ছ, হে নাগ, তুমি সেখানে এসে উপস্থিত হও। যদি না শোন, তবে মনসার মাথা খাও। মনসার দয়ায় যেন ভালভাবে বিষ নেমে আসে।

সাহিত্যে বর্ণিত কাকামারাদের জীবন-সংগ্রাম

কথাসাহিত্যিক সুশীল জানা (১৯১৬--২০০৮) মেদিনীপুরের এক কাকমারা পরিবারের জীবন কাহিনীর ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন তার 'আম্মা' নামক ছোটগল্পে।[২১] আম্মা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আন্দি। তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে আরো কয়েকটি চরিত্র। আন্দি কাকমারা জাতির মেয়ে। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সচ্চাষী জগা পাইককে। ফলে দুজনই পরিত্যক্ত হয়েছিল স্ব-স্ব সমাজ থেকে। নতুন চড়ে তারা জীবন কাটাতে শুরু করে। সেখানে পড়ে কুচক্রী গোবিন্দ তশীলদারের নজর। জগার অকাল মৃত্যুর পর আন্দি কিভাবে তার বসত ভিটে ও চাষযোগ্য জমি আগলে রাখতে পারবে তাই নিয়েই এই গল্প। একদিকে আন্দি যেমন তিন সন্তানের জননী, তেমনি সে আবাদ করা জমিগুলিরও জননী। সে যেন তাদের মা—'আম্মা'। কিন্তু বর্ণহিন্দু গোবিন্দ চক্কোত্তি সুকৌশলে তার জমিজমা হাতিয়ে নিতে চায়। আন্দি ভ্রাম্যমান কাকমারা জাতির মেয়ে। সে জানে লড়াই কিভাবে করতে হয়। এখন সে তিন সন্তানের জননী। কোনভাবেই সে এজমির ওপর তার অধিকার ছাড়বে না। আন্দির জীবনের আনুপূর্বিক ঘটনাপ্রবাহই এই গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু। আন্দির সাথে কাকমারা জাতির অনুষঙ্গ জড়িত। তাই এই আখ্যানের মধ্যদিয়ে আমরা কাকমারা পরিবারের জীবন সংগ্রামের চিত্র পাবো। গল্পে ভ্রাম্যমান একটি কাকমারা পরিবারের পরিচয় আমরা পাই। গল্পের শুরুটা হচ্ছে ভ্রাম্যমান কাকমারা জাতির একটি দলের এক স্থান থেকে অন্য আজানা স্থানে পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে--

> *"দলটিতে প্রায় মেয়ে মরদ ক'রে জনা দশেক হবে—চলেছে কোন নতুন হাট-খোলার উদ্দেশে পুরান কোন হাট-খোলা ছেড়ে। মাথায় পিঠে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে ঘর-সংসার-হাঁড়িকুড়ি কাঁথা চ্যাটাই—মায় টঙ বাঁধার বাঁশ-বাখারিটি পর্যন্ত।*
>
> *জাতে ওদের বলে 'কাকমারা'—কোন্ বুনো পূজোর পদ্ধতিতে কাক*

ধরে ধরে বলি দেয়, কাকের মাংস খায় পরম তৃপ্তিতে।...”[২২]

কাকমারা বেদের মতো ঘুড়ে বেড়ায় এক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তারা অস্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলেন হাট-চালার আশেপাশে। এটাই তাদের জীবন ধারণের স্বাভাবিক রীতি। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ অদ্ভুদ ধরণের। মূলস্রোতের অধিবাসীদের কাছে সেগুলি আকর্ষণের সাথে সাথে যথেষ্ঠ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তারা গলায় লাল নীল কাঁচের মালা পরিধান করেন। কাকমারা জাতির পুরুষ সদস্যরা পাখি শিকার করে, ভেলিক ভোজবাজী দেখায়। মেয়েরা ঝুড়িতে করে সস্তা দামের সাবান, তেল, আয়না ইত্যাদি বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বিক্রি করে। যখন কোন স্থানে এগুলি তারা সহজে বিক্রি করতে পারে তাহলে তারা সেখানে অস্থায়ী আস্তানা গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে তারা নিজেরা টঙ বাঁধে হাট-খোলার আশপাশেই। তাদের প্রকৃত মাতৃভাষা তেলেগু। কিন্তু বহুবছর আগেই তারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে অনর্গলে স্থানীয় বাংলা ভাষা বলতে পারে। তারা কবে তাদের মাতৃভূমি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে এসেছিল তার সঠিক দিনক্ষণ জানা যায় না। তারা মূলত দল বেধে ঘুরে বেড়ায় দক্ষিন-পশ্চিম বাংলার সীমান্তের অঞ্চল থেকে অঞ্চলে। সুশীল জানা এরকম কাকমারা পরিবারের স্থানান্তরের বর্ণনা দিয়েই গল্পের ভিত রচনা করেছেন।

গল্পে বর্ণিত কাকমারা দলের প্রধান সর্দার বৃদ্ধ বাগাম্বর। দলের যুবা, বৃদ্ধ, আবাল-বণিতা সকলে তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। রাতকানা গোবনার অসহায়তার কথা ভেবে দলপতি বাগাম্বর সিদ্ধান্ত নেয় ঐ স্থানের পাশের গ্রামেই তারা থাকবেন। যেখানে তাদের জাতের এক বেটির (আন্দির) ঘর-সংসার। দলের অন্য সদ্যস্যদের প্রশ্নের উত্তরে বাগম্বরের বিবৃতির মাধ্যমে আমরা আন্দির পূর্বকালের পরিচয় পায়-

> *‘....মোদের জাতের মেয়া। দল ছেড়ে চলে গেল একদিন সে একটা উদো চাষীর সঙ্গে। তার ঘর এই জালপাই মহালে।’ বাগাম্বরই বললে, ‘জমিন গোরু ছাগল হাঁস মুরগী—ঘরদোর সব জমজমাট। মেয়েটা মোদের ভারী পয়মন্ত কি—না।*
> *‘কে বল দিকিন।’*
> *‘আন্দি। মোর এক স্যাঙাতের বেটি। চিনবেনি তোমরা’*[২৩]

বাগাম্বরেরে নেতৃত্বে এই ভ্রাম্যমান দলটি আন্দির বাড়ি আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানে রাত্রি যাপনে যে ভুরিভোজ হবে তার ইঙ্গিত পেয়ে সকলে দ্রুত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। এমনকি রাতকান গোবনার পর্যন্ত হাঁটার গতি বৃদ্ধি পায়। পথে পরিত্যক্ত শ্মশান থেকে তারা হাঁড়ি তুলে নেয়। গল্পকার তাদের জীবনের বর্ণনায় লিখছেন-

> *“শ্মশানের মড়া ফেলা হাঁড়ি কলসীর জন্যে ওদের ঘৃণাও নেই --- ভয় সংকোচও নেই। তাইতে গুষ্টিশুদ্ধ রাঁধে-বাড়ে খায় আর গাছ তলায় শোয়। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তল্লাটে থেকে তল্লাটে। মরে আর জন্মায় বংশ পরম্পরায়। এই ওদের জীবন।”*[২৪]

তবে তাদের চিরাচরিত জীবনের মধ্যে ব্যতিক্রম জীবন পেয়েছেন আন্দি। যিনি এই গল্পের ‘নাম’ ভূমিকায়। তিনিই আম্মা। উদো চাষী জগার বিধবা। তিনটে নাবালক ছেলে

রেখে সাপের কামড়ে প্রাণ গেছে জগার। কিন্তু তার সে জমি জায়গা অটুট আছে আন্দির কাছেই। আন্দি মেয়ে হয়েও বলদ হাঁকিয়ে নিজেই সে চাষ-আবাদ করে একটা জোয়ান মরদের মত। আখ্যানে তার পরিচয় আমরা পাচ্ছি এইভাবে-

> *"তিন ছেলের মা কিন্তু এখনও সে ভরাযৌবনা, বেদের মেয়ের নির্ভীকতার সঙ্গে মিশেছে কিসান বউয়ের লক্ষ্মীশ্রী। ঝকঝক তক্‌তক্‌ করছে ঘরদোর উঠোন দাওয়া।"*[২৫]

বাগাম্বরের বুনো কাকমারার দল আন্দির উঠোনের সামনে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আন্দি তাদের সাজ পোশাক দেখে বুজতে পারে কারা এসেছে তার অতিথি হয়ে। আন্দি ঝাঁটা দিয়ে তাঁদের বিদায় করতে চাইলে বাগাম্বর জানায় তারা শুধু ঐ রাতটুকু থেকেই চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় তারা আন্দির দাওয়ায় পড়ে থাকবে । ভাত পাবে না, খাবার হিসেবে মুড়ি পাবে তারা। আর একটা বিধান দেয় আন্দি-

> *"রাত থাকতে পালাতে পাবে না কেউ—যাওয়ার সময় ঝোলাঝুলি সব খুলে দেখিয়ে যেতে হবে আন্দিকে। হাঁস মুরগীর একোটা কোন কিছুতে হাত দেবেত বেধড়ক্কা ঝাঁটা খাবে সবাই। মাথা দুলিয়ে তাতে সায় দিল বাগাম্বর।"*[২৬]

আন্দি নিজে কাকমারা জাতির মেয়ে হয়েও কাকামারাদের প্রতি তার সহানুভুতি কাজ করে নি। এখন সে পুরো দস্তুর কিসান বধু, কিসান জননী। জগার অবর্তমানে এই জমি জায়গা দখল রাখাই তার প্রধান কাজ। কারণ তার এই জমিতে নজর পড়েছে গোবিন্দ তশীলদারের। আন্দির এই জমি দখলের লড়াইয়ে একমাত্র তার সঙ্গে আছে মাগন মণ্ডল। সে এসে আন্দিকে জানায় তশীলদার ঘুষ দিয়ে জরিপ সাহেব ও আমিনকে হাত করে ফেলেছে। মাগন বলল, 'জগার সব জমি - মায় ভিটে পর্যন্ত খাস হয়ে গেল জমিদারের নামে। জগার কোনো ওয়ারিশ নাই—এই কথা মেনে নিল জরিপ সাহেব।'[২৭] আন্দি প্রশ্ন তোলে তার তিন তিনটে ছেলে আর সে তাহলে কোথায় যাবে? তার মনে হয় মাগন সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পারে নি। সে বার বার প্রশ্ন তোলে-

> *'বলেছ সব? বলেছ, কেমন করে আবাদ করেছিলাম চর, কেমন করে গতর দিয়ে করেছিলাম একে সোনার মাটি। বলেছ? -মোর মনে হয় বুঝিয়ে বলতে পারোনি সব।'*[২৮]

আন্দি নিজের স্বামীর তৈরি আবাদী জমি ঘরদোর কিভাবে রক্ষা করবে কুচক্রী তশীলদারের হাত থেকে এই কথা চিন্তা করতে থাকে রাত্রি জেগে। ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে। বাগাম্বরের দল তল্পিতল্পা বেঁধে যাওয়ার তোড়জোর শুরু করে দেয়। কিন্তু আন্দি ওদের দেখে বলে ওঠে 'ঝোলাঝুলি না দেখিয়ে যাচ্ছা যে বড় সব!' এই অংশের বর্ণনা—

> *"হকচকিয়ে তাকাল সবাই। দেখতে দেখতে বিভ্রাট বেধে গেল একটা। এর ওর ঝোলাঝুলি থেকে কক্‌ কক্‌ করে উড়ে বেরিয়ে এল মুরগীর বাচ্চা, কার কাপড়ের তলা থেকে প্যাঁক প্যাঁক করে উঠল*

ধাড়ি হাঁস। গোব্না বিপদ বুঝে ঝোলা চেপে বসে পড়ল মাটিতে— মড় মড় করে ভেঙে গেল ডিমের কাঁড়ি, উঠোন ভেসে গেল ভাঙা ডিমের কুসুমে। রাত-কানা বেচারী অন্ধকারে হাঁস মুরগী ধরতে পারেনি—হাতড়ে কিছু ডিম সটকেছিল ঝোলায়। কাঠ মেরে দাঁড়াল বুড়ো বাগাম্বর। আন্দির হাতে ঘন ঘন ঝাঁটার আস্ফালন।"[২৯]

আন্দি কাকমারাদের স্বভাব জানতো। তারা একটু হাতচোরা গোছের। আসলে অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। তাই অনেকসময় তারা খাদ্যসামগ্রী দেখলে লোভ সংবরণ করতে পারেন না। ভালোমন্দ, হিতাহিত জ্ঞান তারা হারিয়ে ফেলেন।

শেষপর্যন্ত মুখ বুজে অনেক গালাগালি হজম করে, নাকে খৎ দিয়ে বাগাম্বরের দল আন্দির বাড়ি থেকে অন্য গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়। শ্মশান পেরিয়ে একটা বাঁক নিতেই দলটা এসে পড়ে একেবারে মালিকের কাছারি বাড়ির কাছে। গোবিন্দ তশীলদার তাদের দেখে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলো এবং তাদের এই চড়ে ডেরা বাঁধার আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু বাগাম্বর একগাল হেসে মাথা নেড়ে বললে, 'বেটি কুটুমের ঘরের কাছে থাকলে মোদের কি আর ইজ্জৎ থাকবে হুজুর। বাগাম্বরের কাছে সেটি হবে না কখনো। এই মোরা চলে যাচ্ছি।'[৩০] কিন্তু গোবিন্দ তশীলদার তাদের ছাড়বার পাত্র নন। তিনি কৌশলে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন তার কাছারির অতিথ্শালায়—

"ভোজের হৈ চৈ পড়ে গেল কাছারি বাড়িতে। তিন তিনটে চাকর ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে গোবিন্দ চক্কোত্তির ফরমাসে। পুকুরে পড়ল জাল, গাঁজা এলো ভরি ভরি, নিজে তদারক করতে লাগল গোবিন্দ। কাকমারার দল দিব্যি বসে বসে খেতে লাগল শুধু একদিন নয়—পুরো দুটো দিন। চরের চাষাভুসোরা অবাক হল প্রথমে— তারপর কানাঘুষো করতে লাগলো এই বলে, 'ও আর কিছু লয়— দলে চেংড়ি যুবতী আছে কটা, তশীলদারের নজর পড়েছে সেই দিকে। শালা চরে এবার কাকমারা বসাবে গো'।"[৩১]

বাগাম্বর ভাবতে থাকে এত খাতির যত্ন সবই তাদের 'পয়মন্ত বেটি' আন্দির কারনেই। কিন্তু গোবিন্দ তশীলদারের মতলব ছিল অন্য। তিনি কাকমারাদের নিজের দলে রেখে আন্দির বিপরীতে তাদেরকে স্বাক্ষ্য হিসেবে কাজে লাগাতে চান। সেই অনুযায়ী হাকিমের সামনে মাগন যখন আন্দিকে 'জগার বউ' বলে পরিচয় দিলেন তখন তিনি আন্দিকে 'জগার রক্ষিতা' বলে পরিচয় দিলেন। হাকিম আন্দিকে জগার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করলে গোবিন্দ রসিকতার সুরে বললে,

'কাকমারা মাগীর সঙ্গে সচ্চাযীর বিয়ে সাদি হুজুর।' আন্দি অবাক হতে লাগলো। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই গোবিন্দ তার চাকরকে দিয়ে ডেকে পাঠায় বাগাম্বরকে। বাগাম্বর কাকমারাদের অদ্ভুদ সুসজ্জিত পোশাক পরিধান করে এসে হাজির হয়। মাথায় কাকের পালক গোঁজা, লাল শালুর পাগড়ী, গলায় লাল নীল কাঁচের মালা, হাতে লোহার বালা আর কানে কুন্ডুল। গোবিন্দ তাকে দেখিয়ে হাকিমকে বললে, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন হুজুর। ওদেরি জাত।' হাকিম আন্দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেসে করলে, 'ওকে তুমি চেন?'

বাগাম্বর আভূমি সেলাম করে বললে, 'হাঁ হুজুর—মোদের বেটি, খুব পয়মন্ত বেটি।'—[৩২]

এরপর গোবিন্দ চিত্রনাট্য অনুযায়ী হাকিমকে জানায় কিভাবে জগা এই কাকমারা মেয়েকে নিয়ে চরে এসে ঘর বেঁধেছিল, সেই সব কথা। তারপর সে জানায়, 'এরকম একছার হয়হুজুর। উদো চাষাভূসো যেমন ফাঁদে পড়ে তেমন ও মাগীরাও একটা থেকে আর একটার কাঁধে চাপে। সব বেশ্যার সামিল।'[৩৩] আন্দি তীব্র প্রতিবাদ করে। কিন্তু গোবিন্দ তার নিজের কর্মচারী হারাধনকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করায় যে জগা মরে যাওয়ার দুমাস পর থেকেই আন্দির সাথে তার সম্পর্ক। আন্দি এসব শুনে কোলের ছেলেটাকে নামিয়ে ছুটে গেল হারাধনের দিকে। এক লহমায় গিয়ে চেপে ধরল তার গলাঃ

'হারামির বাচ্চা।'—

হৈ-চৈ করে উঠল গোবিন্দ। হারাধন চেঁচাতে লাগলো প্রাণপণে। ছুটে এল পেয়াদারা। ধরাধরি করে ছাড়িয়ে দিল হারাধনকে। বোকার মতো খাপছাড়া ভাবে হাকিমের দিকে চেয়ে আবার চিৎকার করে উঠল আন্দি নিজের তিনটে ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে, 'ওরা মোর ব্যাটা-হোই দ্যাখ অবোধ বালকরা মোর। ওরা পাবে না তার বাপের হাঁসিল করা জমিন! বল—বল—আমি ওদের আম্মা! বল মোকে'—

গোবিন্দ ভেংচি কেটে বলল, 'রক্ষিতার বাচ্চা, সে আবার ওয়ারিশ! তোর জাতের দল বসে আছে হোই বাইরে—চলে যা তাদের সঙ্গে।'

'তোকে মেরে ফেলাব—মেরে ফেলাব হারামি'—গর্জেও উঠে ছুটে গেল আন্দি গোবিন্দের দিকে।

গোবিন্দ টপ্ করে লাফ দিয়ে হুজুরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখুন জুজুর—ছোট জাতের স্বভাব। বেদিনী হারামজাদী সাক্ষাৎ চামুণ্ডা হুজুর।'

'ত্তোর ভদ্দরলোকের মুখে মারি লাথ!'[৩৪]

এরকম প্রেক্ষাপটে আন্দির কঁড়েতে আগুন লাগিয়ে দেয় কে বা কারা। কিন্তু পাঠকদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এখানেও সেই উচ্চবর্গীয় শোষক গোবিন্দ তশীলদারের হাত আছে। তার অঙ্গুলিহেলনেই ঘটছে সব। চাষীর কুঁড়ে। পুড়ে শেষ হতে আর কতক্ষণই বা লাগে। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে আগুন ধরে জ্বলে শেষ হয়ে গেল। কেরোসিন তেল চুম্বকের মত টেনে নিল আগুনকে। দড়ি ছিঁড়ে গরুগুলো পালালো কোথায় বনে বাদাড়ে, দম বন্ধ হয়ে মরে গেল কটা ছাগল, পুড়ে মরে গেল প্রায় সব হাঁস মুরগীগুলো। সেই ছাই ভস্মের পাশে তিনটে ছেলেকে নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল আন্দি। ঘটনার গভীরতা না বুঝে বুড়ো বাগাম্বর আন্দিকে সান্তনা দিয়ে বলে,

'ও সব ঝুটমুটের জন্যে দুখ্ করিসনি বেটি! মোরা কাকমারার

জাত! ওরা যখন তাড়াবেই তো চল মোদের সঙ্গে। দল বসে আছে তোর জন্যে। কেউ যাইনি মোরা—চল।'[৩৫]

কিন্তু আন্দি সেই নোংড়া ছেঁড়া জীবনে আর ফিরে যেতে চাইলো না। সে মনে মনে সংকল্প করলো যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কেন সে তার ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবে না। তাই মাগন যখন আন্দির একটা হাত চেপে ধরে বললে,

'চল আন্দি—সরে চ'—আর এক দণ্ড হেথা লয়।'

'না।'—

হঠাৎ ফেটে পড়া একটা সবল কণ্ঠ নিস্তরঙ্গ মরা অন্ধকারকে যেন আলোড়িত কম্পিত করে তোলে মুহূর্তে, 'আসুক কে লড়াবে মোকে।'

তিনটে ছেলেকে ঘিরে অটোল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল আন্দি—নড়ল না এক পা।

একটা রাঙা আভা ঝলমল করছে অন্ধকারে—সেটা যেন নিভন্ত খড়কুটোর নয়, সে ঐ বাঘিনী মেয়েটার রাঙা চোখের আগুন, ওর সর্বাঙ্গের ক্রুদ্ধ দ্যুতি।-[৩৬]

কাকমারাদের নিয়ে রচিত প্রথম আখ্যান আম্মা গল্পে আমরা তাদের জীবন-যাপনের রীতি, স্বভাব, আচার-আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদের শৈলী, তাদের খ্যাদ্যাভাষ সবকিছুরই স্পষ্ট পরিচয় পেয়েছি। একবিংশ শতকেও কাকমারা জীবন নিয়ে সাহিত্যিকদের কৌতুহলের অন্ত ছিল না। কথাসাহিত্যিক অনিল ঘড়াই ২০০১ এ রচনা করেন 'নীল দুঃখের ছবি' নামক একটি উপন্যাস।[৩৭] কার্যত এই উপন্যাসটি ছিল কাকমারা জাতির জীবন ও জীবিকার দলিল। এই উপন্যাসটি পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা-২ থানার অন্তর্গত বালিঘাই ও তার পার্শ্ববর্তী মাঠপুকুরকে পটভূমি করে গড়ে উঠেছে। ঘটনার প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে আরো কয়েকটি স্থানের নাম- তাজপুর বস্তি, সাহাড়দা হাট, এগরা, ভবানীচক, কেঁউটগড়িয়া, কেলেঘাই নদী ইত্যাদি। ভ্রাম্যমান একটি কাকমারা সম্প্রদায়ের চলমান ভাষ্য এই উপন্যাস। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায়-

"একপাল শুয়োর, দুটো লেজকাটা কুকুর আর বাঁকে ঝালোন হাঁড়িকুড়ি কাথাকানি নিয়ে মাঠ পুকুরের পাড়ে উঠে এল কাকমারার দলটা।"[৩৮]

তাজপুরের বস্তি ছেড়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে এসেছে দশজন কাকমারার দল- ভিক্ষাম্বর, দিগম্বর, নীতাম্বর, বিন্দিয়া, ঝুমরি, মন্থরাবুড়ি প্রমুখরা। গ্রাম থেকে দূরবর্তী মাঠপুকুরের তাদের তাঁবু বসে। অনিলবাবু লিখেছেন-

"ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনীর ভয় নেই ওদের। ওদের যত ভয় মানুষকে। বিন্দিয়ার কাঁচাবয়স, শরীরের গড়নও ভালো। নোনা

খালের মাটির মতো গায়ের রঙ। হাসলে ফুল যেন পাপড়ি মেলে। মেয়েটাকে সাবধানে রাখতে হবে। গাঁয়ের মানুষকে বিশ্বাস নেই। ওরা ছায়া মাড়ায় না অথচ শরীর চাটতে ভালোবাসে।" [৩৯]

উদকাঠি, নজরকাঠি, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ বিক্রি করে বা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ানোই তাদের জীবিকা। তাই দাঁড়িয়ে থাকা নয় বরং চলাই ওদের জীবন। তাই বর্ষা আসার আগেই ভিক্ষা করে কিছু সঞ্চয় করে নিতে চায়। বর্ষায় কেউ ভিক্ষা দেয় না। অনেকেই বলে জনমজুর খাটতে। কিন্তু ওরা কর্মবিমুখ। পরের কাজে ওদের তেমন কোনো উৎসাহ নেই। কোনমতে দিনটা চলে গেলেই হলো। শিব দুর্গা, ব্রহ্মা, মহেশ্বরের উপাসক হলেও ভিক্ষার সময় রাম-সীতার বন্দনা সবার উর্ধে। রাম সীতা ছাড়া তাদের দৈনন্দিন জীবন বন্দনার সমাপ্তি হয় না। তবুও গ্রামের সব বাড়িতে হাত পেতেও তারা ভিক্ষা পায় না। ভিক্ষা না পেয়ে তারা রাগান্বিত হয়ে অনেকসময় গৃহস্থের বাড়ির উঠানে কুকাজ করেন। উপন্যাসে দেখা গেছে ভিক্ষাম্বর ভিক্ষা না পেয়ে রাগে অভিমানে—

"চাওড়া হাতের পাঞ্জা জড়িবুটিতে বশ মানা জাতসাপের ফনার চেয়েও জড়োসড়ো হয়ে আসে। আঙ্গুল সমেত হাতের কবজি জোর করে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় নিজের মুখের ভেতর। 'ওয়াক ওয়াক' বমি ঠেলে আসে। হড়হড়িয়ে বমি ঠেলে দেয় সে বাবুর নিকোন উঠোনে। অজীর্ণ ভাতের টুকরো গড়িয়ে যায় উঠোনে। চোখ মোছে না, ভিক্ষাম্বর জলভরা চোখে ফিরে আসে ধুলো পথে।" [৪০]

কঠিন অনুশাসনে ঘেরা কাকমারা সমাজ। বহুবিবাহপ্রথা এই সমাজে প্রচলিত থাকলেও তা সহজে ফলপ্রসূ হয়নি দিগম্বরের জীবনে। বরং এর জন্য দিগম্বরের স্ত্রী যমুনাবতীকে আত্মহত্যা করতে হয়। অন্যদিকে কাকমারাদের স্বামী তাড়ানো মেয়ে বিন্দিয়াকে রক্ষা করার জন্য গ্রামের ছেলে জটায়ু তার হাত ধরলে -পাপ লাগে গায়ে। যদিও জটায়ু গ্রামের মানুষের এই রায়ের প্রতিবাদে বলে—"মানুষের হাত ধরলে মানুষের কি জাত যায় কখনও?" এইটুকুই। এর বেশি কিছু সম্পর্কের দিশা ভয়ংকর সামাজিক বৈষম্যের ঊর্ধে দেখাতে পারেননি ঔপন্যাসিক।

চলচিত্রে কাকমারা জীবন

আম্মা গল্পের আন্দির জীবনের কাহিনী নিয়েই পরিচালক গৌতম ঘোষ ১৯৮১তে নির্মাণ করলেন দখল চলচিত্রটি।[৪১] আন্দি চরিত্রে রূপদান করেছিলেন মমতা শঙ্কর।[৪২] আন্দি (মমতাশঙ্কর) যাযাবর, হতদরিদ্র কাকমারা সম্প্রদায়ের এক মেয়ে, ভালোবেসে বিয়ে করে উঁচুজাতের জগা পাইককে। সম্প্রদায় তাদের একঘরে করে দেয়। তাদের শ্রম দিয়ে চরা জমিকে তারা পরিণত করে চাষযোগ্য, উর্বর জমিতে। কাকমারা'রা একদিন তাদের দল (সুনীল মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য) নিয়ে আসে আন্দি'র বাড়িতে। কিন্তু আন্দি দেখে তাদের স্বভাব বদলায়নি, তাই তাড়িয়ে দেয় ওদের। গ্রামের জমিদার তার খাজনা আদায়কারী গোবিন্দ'র (বিমল দেব) সহযোগিতায় আন্দি'র জমি দখল করার চেষ্টা করে। গোবিন্দ'র লোকেরা আন্দি'র বাড়িতে আগুনও লাগিয়ে দেয়। এবার, কাকমারা

সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আন্দি'র পাশে থাকতে চায়। কিন্তু আন্দি একাই জমির লড়াইয়ের কথা বলে। এই ঘটনা নিয়েই নির্মিত দখল চলচিত্র।[৪৩] ভ্রাম্যমান কাকমারা জীবনের সংগ্রাম নিয়ে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি স্বর্ণকমল পুরস্কার লাভ করে।

পর্যবেক্ষণ

বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় কাকমারারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে ধাবমান। আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের ফলে কাকমারা সমাজ প্রভাবিত হয়েছে। ফলে তারা তাদের চিরাচরিত পেশা 'ভিক্ষাবৃত্তি' থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছে। সনাতনী ভিক্ষাবৃত্তির পেশা ছেড়ে অনেকে কৃষিকাজ, শিক্ষাগত পেশা ও চিকিৎসা পরিষেবার সাথে যুক্ত হয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। বর্তমানে তাদের পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে। তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর বিদ্যায়তনিক চর্চায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসাবে কাকমারারা অবহেলিত। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় এদের যৎসামান্য উল্লেখ থাকলেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্র প্রদত্ত কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা থেকে এরা বঞ্চিত। রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে এরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলেই অচিরেই এই জনগোষ্ঠী বাংলার বিলুপ্ত জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিগণিত হবে। কাজেই তাদেরকে মূলস্রোতের সাথে একাত্ম করে রাখতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও সহনাগরিকদের সহযোগিতাই একান্ত কাম্য।

সূত্র নির্দেশ

১. ভৌমিক, প্রবোধ কুমার, 'কাকমারা', রায়, প্রণব (সম্পা.), মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্যলোক, পৃ. ৪৩৮।
২. Mitra, A, Census 1951, West Bengal: District Handbooks Midnapur, Alipore: West Bengal Government Press, 1953, p. 142.
৩. ভৌমিক, প্রবোধ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮।
৪. তদেব, পৃ. ৪৩৯।
৫. জানা, সন্দীপ, যাযাবর সমাজের পাশে সমাজ সেবা ভারতী, সেনগুপ্ত, রত্নিদেব (সম্পা.), স্বস্তিকা, ৭৩ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, কলকাতা: ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন, ২৬ জুলাই, ২০২১, পৃ. ৭।
৬. কুণ্ডু, সন্তোষ কুমার, বাঙালী হিন্দু জাতি পরিচয়, কলকাতা: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ২০০৮, পৃ. ২৯৯।
৭. ক্ষেত্রসমীক্ষা (০৭.০৫.২০২৩), চিঙ্গুরদন্যা, খেজুরী, মেদিনীপুর। লেখক নিজে এই এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।
৮. ভৌমিক, সুহৃদ কুমার, বাংলা ভাষার গঠন, কলকাতা: মনফকিরা, ২০১৩, পৃ. ৫১।
৯. ভৌমিক, প্রবোধ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩।

১০. মণ্ডল, উত্তম, কাক নেই, কাকমারাও নেই, (https://risingbengal.in/history-of-india/no-crow-no-crow-access date: 18.01.2022)
১১. ভৌমিক, প্রবোধ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬।
১২. মণ্ডল, উত্তম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।
১৩. ক্ষেত্রসমীক্ষা (১৪.০৫.২০২৩), গাংরা, সোনাচুরা, নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর। লেখক নিজে এই এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।
১৪. ভৌমিক, প্রবোধ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫।
১৫. ক্ষেত্রসমীক্ষা (০৭.০৫.২০২৩), চিঙ্গুরদন্যা, খেজুরী, মেদিনীপুর। লেখক নিজে এই এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।
১৬. ভৌমিক, প্রবোধ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬।
১৭. ক্ষেত্রসমীক্ষা (০৭.০৫.২০২৩), চিঙ্গুরদন্যা, খেজুরী, মেদিনীপুর। লেখক নিজে এই এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।
১৮. মান্না, অসীম কুমার, দক্ষিণের জানালা: দক্ষিণবঙ্গের লোকভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবন, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: রেঁনেসা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ.পৃ. ৫০-৫৯।
১৯. ভৌমিক, সুহৃদ কুমার, বঙ্গ সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য, কলকাতা: মনফকিরা, ২০১৩, পৃ.পৃ. ৪৬-৫২।
২০. ভৌমিক, সুহৃদ কুমার, জেলার উপভাষায় দ্রাবিড় উপাদান ও কাকমারাদের ভূমিকা, রায়, প্রণব (সম্পা.), মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্যলোক, পৃ. ৪৫৫।
২১. সুশীল জানার শ্রেষ্ঠগল্প, কলকাতা: বুকমার্ক, ১৯৬৩, পৃ.পৃ. ১২৩-১২৯।
২২. তদেব, পৃ. ১২৩।
২৩. তদেব, পৃ. ১২৪।
২৪. তদেব, পৃ. ১২৫।
২৫. তদেব, পৃ. ১২৬।
২৬. তদেব, পৃ. ১২৭।
২৭. তদেব, পৃ. ১২৯।
২৮. তদেব, পৃ. ১৩০।
২৯. তদেব, পৃ. ১৩১।
৩০. তদেব, পৃ. ১৩২।
৩১. তদেব, পৃ. ১৩২।
৩২. তদেব, পৃ. ১৩৩।
৩৩.তদেব, পৃ. ১৩৩।
৩৪. তদেব, পৃ. ১৩৪।
৩৫. তদেব, পৃ. ১৩৫।
৩৬. তদেব, পৃ. ১৩৬।
৩৭. ঘড়াই, অনিল, নীল দুঃখের ছবি, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০১, পৃ.পৃ. ১-২২৪।

৩৮. তদেব, পৃ. ৯।
৩৯. তদেব, পৃ. ১০।
৪০. তদেব, পৃ. ২২।
৪১. ঘোষ,গৌতম, দখল, ১৯৮১, (https://www.youtube.com/watch?v=A3uWngNsx0o, access date: 10.05.2023).
৪২. শঙ্কর, মমতা, 'গৌতম ঘোষ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা', প্রাকাশিত, বিশেষ ক্রোড়পত্র - গৌতম ঘোষ, (https://rritobak.blogspot.com/2021/07/blog-post_0.html, access date: 14.06.2023)
৪৩. Bengali Cinema Celebrating 100 Years, (https://banglacinema100.com/movie-details/mRVdzRkWGQwTkdWVlMwOXdiMW96TnpGc1p6MDk%3D, access date: 14.06.2023).

লিঙ্গগত উন্নয়ন: একটি অলীক ভাবনা?

সোমদত্তা ভট্টাচার্য
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষমতায়নের পথে নারীদের সে কাল ও একাল - এরকম একটি চিত্র যদি খোঁজার চেষ্টা করা হয় তাহলে তার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকের ই সন্ধান মেলে। সে এক নারীদের আলোক বৃত্তে কেন্দ্রিভূত হবার গল্প যা আমাদের মনে সাহসের সঞ্চার করে, সাধুবাদ জানাই মেয়েদের। তারা এগিয়েছে তো নিশ্চয়ই, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা তার প্রমাণ পাই; শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, রাজনীতির অঙ্গনে ও চিন্তায় তার প্রকাশ পাই। কিন্তু "ক্ষমতায়ন" শব্দটিকে যদি আমরা খেয়াল করে দেখি তাহলে প্রশ্ন ওঠে ক্ষমতায়ন অর্থাৎ এমপাওয়ারমেন্ট কি নারীদের সেভাবে হয়েছে? নারী তথা 'ওমেন' এই ক্যাটিগরির দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহলে সামগ্রিকভাবে ক্ষমতায়নের চিত্রটি কি মেলে? সদর্থক রূপটি কি সর্বাঙ্গীন নাকি সেটি খন্ড চিত্র? ক্ষমতায়নের সাথে উন্নয়নের একটি গভীরতার সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ empowerment ঘটলে development হবার কথা এটি বোঝা যায়। যদি জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্টের কথা বলা যায়, ভাবা যায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে ডেভেলপমেন্ট কি সে অর্থে নারীদের ঘটেছে নাকি এখনো বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে?

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় অর্থাৎ ১৯৫০ ও তৎপরবর্তী সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র গুলি পরিকল্পিত উন্নয়নের (planned development) পথে পা বাড়ায়, সামনে রেখে পাশ্চাত্যের মডেল। নারীদের কিভাবে পেলাম আমরা উন্নয়নের সেই পরিকল্পনায়? ১৯৬০-১৯৭০ এর দশকে নারীবাদী গবেষক ও অন্যান্য চিন্তাবিদরা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন যে এই ডেভেলপমেন্ট প্লানিং এ নারীদের কিন্তু যথেষ্ট অবহেলা করা হয়েছে। এটি সমগ্র বিশ্বের চিত্র, ভারতে তো বটেই। ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিংয়ের রূপকাররা মনে করেছিলেন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলি সমগ্র সম্প্রদায়ের এক সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটাবে, যেটি পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হলো। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা গেল যারা পিছিয়ে ছিল তারা এগলো না এক পা বরং আরো পিছিয়ে গেল এক দুই কদম। কি রকম সেটি? আর্থিকভাবে অনুন্নত দরিদ্র সম্প্রদায় (Poor) ও নারী (Women) এই দুই প্রান্তিক গোষ্ঠী (Marginal group) পিছিয়ে পড়ল আরো বেশি। অমর্ত্য সেন ও জাঁ দ্রোজে পরবর্তীতে যে যুগ্ম গবেষণা করেছিলেন তাতে এর প্রতিফলন আমরা সবিশেষ ভাবে পাই।[১] এর কারণ কি? প্লানার্স তথা পরিকল্পকেরা মনে করেছিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ও মডার্ন এগ্রিকালচার এর দিকে নজর দিলেই সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন হবে। সেই জন্য পাদপ্রদীপের আলোয় এলো শিল্পপতি, জমির মালিক, সমৃদ্ধ কৃষক ও ব্যবসায় উদ্যোগকারীরা। সরকার মনে করলেন, এই অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালি গোষ্ঠীর প্রতি নজর দিলেই তার প্রভাব 'ট্রিকল ডাউন' পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র যারা তারাও পাবেন

এবং এভাবেই সামগ্রিক রূপে সম্প্রদায় সমৃদ্ধি লাভ করবে। কিন্তু দেখা গেল বাস্তবে তা হলো না। দরিদ্র সম্প্রদায় ও মহিলারা এর সুপ্রভাব থেকে বঞ্চিত হলো। গার্হস্থ্য, সমাজ ও অর্থনীতিতে নারীদের যে অবদান তাকে মূল্য ও মর্যাদা দেওয়া হল না। নারীরা সেই সময় যে গার্হস্থ্যের সাথে বাহ্য জগতে অর্থাৎ কর্ম ক্ষেত্রে ও বাইরের দুনিয়াতে পা রাখল। দেখা গেল, এই দুইয়ের মেলবন্ধন করে সমন্বয় করে তাল মিলিয়ে চলা দুষ্কর ও কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। এই যে প্রাইভেট ও পাবলিকের একটা বিভাগ তৈরি হলো এটিকে নারীবাদী চিন্তাবিদরা সমালোচনা করলেন। কারণ এই অবস্থানটিতে পুরুষতন্ত্র তথা Patriarchy- র প্রাধান্য দেখা গেল। উন্নয়নের প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে যখন কৃষির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে তখন দেখা গেল যে, এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষেত্রগুলি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পুরুষের স্বরের প্রাধান্যই দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৮০ সালে ভারতে কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক অনুদানে যে বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম ও প্রজেক্টগুলি হচ্ছিল সেখানে নারীদের একেবারেই দূরে রাখা হয়েছিল, তাদের এক প্রকার অগ্রাহ্য করেই ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল নারীরা কৃষি কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, শস্য উৎপাদন করতেন। কিন্তু তারা কখনোই জমির মালিকানা পেতেন না। শ্রীলঙ্কায় মহাভেলী প্রকল্পে দেখা যায়, বিবাহিত নারীরা জমি পাবার অধিকারী নন, উত্তরাধিকার সূত্রে তা পুত্র পেয়ে থাকেন। এভাবে দেখা যায় যে, সে সময় উন্নয়নের নামে যে ঘটনাটি ঘটলো তার ফলে মহিলারা মেন স্ট্রিম এগ্রিকালচার থেকে একরকম বাদ পড়ে গেল, তাদের উপার্জনের হ্রাস ঘটলো, আর্থিক দুরবস্থা তৈরি হলো। এভাবে শিল্পের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা গেল। যেমন ভারতবর্ষে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে অর্থাৎ বস্ত্রশিল্পে মহিলারা ব্যাপকহারে কাজ থেকে ছাঁটাই হল, তাদের কাজ চলে গেল ও দুর্দশা গ্রস্থ হয়ে পড়ল তথাকথিত যান্ত্রিক উন্নতি ও আধুনিকীকরণের হাত ধরে। ফলতঃ সর্বাঙ্গীণভাবে নারীদের অবস্থার অবনতি ঘটলো এবং সমাজে পণপ্রথা কন্যা ভ্রুণ হত্যা, ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসার বাড়বাড়ন্ত দেখা গেল।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আমরা পাই এই বিষয়ে অমর্ত্য সেন ও জা ড্রোজে[২] এর গবেষণাকে কেন্দ্র করে। দেখা যাচ্ছে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র গোষ্ঠীর থেকে সম্পন্ন গোষ্ঠীতে পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের প্রাবল্য অধিক। জেন্ডার রিলেশন তথা লিঙ্গগত সম্পর্ক দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে অনেকটা দৃঢ় ধনিগোষ্ঠীর তুলনায়, যে ক্ষেত্রে জীবন যাপন পারস্পরিক কোঅপারেশন তথা সহযোগিতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু সম্পন্ন গোষ্ঠীতে অর্থাৎ প্রিভিলেজড নারীদের অবস্থান অনেকটাই নির্ভরশীল ও প্রতীকী।তাহলে এই সময়কাল অবধি যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে কি বলা যায় যে নারীদের ক্ষমতায়ন ঘটছে এবং তার সাথে তাদের উন্নয়নও হচ্ছে? এখন প্রশ্ন হল, তাহলে নারীদের অবস্থার প্রতি কি কোনই নজর দেওয়া হলো না? ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড প্ল্যানিং থেকে কি নারীরা পুরোটা বাদই থেকে গেল? ১৯৯০ ও তারপরের সময়টায় দেখা যায় যে, মহিলাদের অবস্থানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প ট্রেনিং প্রোগ্রাম, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইত্যাদি সংঘটিত হতে শুরু করলো। নারী শিক্ষার যে হার তাতে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হল। কিন্তু নারীবাদীরা মনে করলেন সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য রোজকারের ব্যবস্থাও

যদি না হয় তাহলেও সেই অর্থে ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন হওয়া সম্ভব নয়। WID(Women In Development), WAD(Women and Development), GAD(Gender and Development) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রূপরেখা আমরা পাই 'women and development' এর ক্ষেত্রে। কিন্তু আবারো সেই একই প্রশ্নের অবতারণা। 1990 থেকে 2023, আজও নারীরা কি স্বাধীন চিন্তার প্রতিফলন প্রকাশ করতে পারে? তাহলে অসুবিধা কোথায় থেকে যাচ্ছে? ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন যদি হয় তাহলে কিছু বা আংশিক নয়, সামগ্রিকভাবেই নারীরা চিন্তা ও মত প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু মেয়েরা আজও কি সেভাবে নিজের কথা বলে? যদি না বলে তাহলে কি তারা অন্যের কথা বলে? অর্থাৎ অন্যের চিন্তাভাবনা, মতের প্রতিফলন করে থাকে?

এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ইউএনও র যে থিম থাকে সেগুলির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। 2020 র থিম ছিল, "I am generation equality: realising women's right", 2021 এর হলো, "Women in leadership" aims towards a more equal COVID19 world, 2022 এর ছিল "Gender Equality today for a sustainable tomorrow"। 2020 সালের থিম এ যা বলা হলো তার মূল কথা হলো, "The emerging global consensus is that despite some progress real change has been agonizingly slow for the majority of women and girls in the world.Today not a single country can claim to have achieved gender equality. Multiple obstacles remain unchanged in law and in culture. Women and girls continue to be undervalued; they work more and earn less and have fewer choices; and experience multiple forms of violence at home and in public spaces. Furthermore there is a significant threat of rollback of hardwon feminist gains. The year 2020 represents an unmissable opportunity to mobilize global action, achieve gender equality and gender rights of all women and girls." এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম জেন্ডার গ্যাপ বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ২০২৩ এ তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের স্থান ১৪৬ টি দেশের মধ্যে ১২৭ তম, যা খুব একটা আশা ব্যঞ্জক নয়। এটিও কিন্তু ভারতের তুলনায় অগ্রগতি, কারণ এর আগের রিপোর্টে ভারত আরো আটটি স্থান পিছনে ছিল। এই মূল্যায়নটি হয় যে বিষয়গুলি বা ইনডেক্স গুলির উপরে নির্ভর করে সেগুলি হল-Economic Participation and Opportunity, Educational Attainment, Health and Survival and Political Empowerment। লিঙ্গগত সাম্যের নিরিখে আইসল্যান্ড গত চৌদ্দ বছর ধরে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে।

এই বক্তব্যের দিকে তাকিয়ে বোঝার দরকার যে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি ব্যবহারিক জীবনে কেন সোনার পাথরবাটির মতোই থেকে গেল। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া প্রয়োজন ফেমিনিজমের দুটি দিক আছে একটি অ্যাক্টিভিজম এবং অন্যটি তাত্ত্বিক দিক। প্রথমটি নারীবাদী আন্দোলনের সরাসরি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি। যেমন বর্তমান নিরিখে এর উদাহণস্বরূপ বলা যায়, নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওগুলি কতটা কি ভূমিকা নিয়েছে,

আরো কি করার দরকার আছে, অথবা গভর্নমেন্ট পলিসি কি কি হয়েছে তার রূপরেখা ইত্যাদি। আরেকটি দিক হলো, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যেখানে মূলত আলোচনা হয়ে থাকে কার্যকারণের দিকগুলি। দর্শনের দায়িত্ব হল এই দিকটি নিয়ে আলোচনা করা; অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়ন কেন প্রয়োজন এবং তা অর্জন করতে যদি ব্যর্থতা থেকে যায় তাহলে তার মূল কারণ কতটা গভীরে কোথায় নিহিত সেটি যদি বিশ্লেষণ না করা যায় তাহলে ব্যর্থতা কিভাবে সার্থকতায় পর্যবসিত হবে?

একটু ফিরে দেখা যাক। ২০০১ সালে যখন ভারত সরকার মেয়েদের জন্য দুটি প্রকল্প প্রদান করলেন, স্বয়ংসিদ্ধা এবং দ্যা ন্যাশনাল পলিসি ফর দা ইমপরটান্স অফ উইমেন। দুটি প্রকল্পেই নারীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেবার পাশাপাশি সামাজিক চর্যায় স্থান দেবার নির্দেশ ছিল। তাহলে প্রশ্ন হল, ২০২০ সালে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সমস্ত নারীদের ক্ষমতায়ন সেভাবে হয়নি বলে UN ও অন্যান্য চিন্তাবিদদের মনে হচ্ছে কেন? এখানে যে শব্দ তথা ধারণাটির উপর বিশেষ জোর দিতে চাইবো সেটি হল 'রিয়ালাইজিং উইমেন্স রাইটস'। ব্যর্থতা কি তাহলে এখানেই লুকিয়ে আছে? এই 'রিয়ালাইজেশন' ও 'উইমেন্স রাইট' এই দুটি খুবই জরুরী ধারণা। নারীবাদী আন্দোলনের শুরুটাই হয়েছিল অধিকারের প্রশ্নে এবং একথা স্মরণে রেখেই এই আন্দোলনে এগিয়েছিল যে অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য রক্ষারও দায় আছে। আর সেই দায় নারীবাদীরা অস্বীকার করেননি কোনদিন। কিন্তু কর্তব্য রক্ষা করার দায় কোন এক পক্ষে বর্তায় না তা দ্বিপাক্ষিক। উল্লেখ্য নারীবাদীদের অধিকার রক্ষার লড়াই কিন্তু পুরুষদের বিরুদ্ধে নয়, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেটি ভিন্ন একটি চর্চার বিষয়। যে অধিকার মেয়েদের তৎকালীন সমাজ দেয়নি সেই অধিকার আদায়ের প্রশ্নেই (যেমন সম শ্রমে সমমজুরি, শিক্ষার, কর্মের অধিকার, ভোটাধিকার ইত্যাদি) পাশ্চাত্যে মেরি ওলস্টোনক্রাফট, ভারতে রমাবাঈয়ের মত মহিলারা সোচ্চার হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রাক স্বাধীনতা সময়ে মহারাষ্ট্রে রমাবাঈয়ের বাল বিধবাদের দুরবস্থা প্রসঙ্গে বক্তৃতা এবং সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান পরিধাণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ রমাবাঈয়ের বক্তব্যের কঠিন সমালোচনা করেছিলেন। সে দিক থেকে সেই সময়ে তার মনোভাব নারীদের প্রতি অত্যন্ত নঞর্থক বলা যেতে পারে, যদিও পরবর্তীতে তার অভিমত এর মোড় অন্যদিকে ধাবিত হয় ও তার বক্তব্যে নারী স্বাধীনতার সমর্থন মেলে। একসময়ে তার নিজের আত্মীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর কাজের প্রশংসা না করাও দুর্ভাগ্যজনক, যদিও পরবর্তী পর্যায়ে এই সংকীর্ণতার স্থান নেয় প্রগতিশীল ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "মেয়েদের একরকম গ্রহণ শক্তি ধারণা শক্তি আছে কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই মেয়েদের একরকম চটপটে বুদ্ধি আছে। কিন্তু সাধারণ পুরুষদের মতো বলিষ্ঠ বুদ্ধি নেই"[৩]। তার মতে পুরুষের আশ্রয় অবলম্বনে থাকাটাই নারীর ধর্ম, এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু তা সাধারণ নিয়ম নয়। পরবর্তীতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর এহেন মনোভাব থেকে সরে এসে নারীদের মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে অনেক সংগ্রাম করে গেছেন কথায় ও কাজে। সেটি অবশ্যই অন্য আলোচনার বিষয় ও তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

কথা হচ্ছিল অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে সম্বন্ধে। ফিরে আসা যাক সেই প্রশ্নে যে, তবু সম অধিকার এলো না কেন? এ প্রসঙ্গে যেটি জরুরী সেটি হল, কোন ভাবনার থেকে মেয়েদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তুলে ধরল,

সেটি খুঁজে দেখা। এই প্রশ্নের কারণ স্বরূপ নারীবাদী দার্শনিক শেফালী মৈত্র বলেছেন যে, "আমাদের দেশের যোজনা গুলির পিছনে যে চিন্তাভাবনা কাজ করে চলেছে তা যেন অনেকটা এরকম মেয়েরা যেন আইনের অপ্রণীধান তাদের স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে কখনো আবার আইনের অপ প্রয়োগের ফলে তারা দুর্বল রয়ে গেছে, এবার প্রয়োজন প্রায়শ্চিত্তের কারণ সমাজ যে মেয়েদের নামিয়ে রেখেছে তারা আজ সমাজকে নামাচ্ছে। এই বোধ থেকে ২০০১ এর পলিসিতে বলা হচ্ছে, নারীকে সব মানব অধিকারের ডি জুড়ে বা আইনি অধিকার এবং ডি ফ্যাক্টো অর্থাৎ কার্যকরি অধিকার দিতে হবে। এও বলা হচ্ছে যে মেয়েদের বিরুদ্ধে সব রকম বৈষম্য দূর করার জন্য আইন আদালতে উপযুক্ত পরিবর্তন আনতে হবে"[৪]। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মেয়েদের জন্য আইন করে সম অধিকার আনয়ন করার প্রক্রিয়াটি বেশ। তাতেই অসাম্য দূর হবে, বৈষম্য থাকবে না, মেয়েদের ক্ষমতায়ন হতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু এভাবে দেখায় গলদ আছে। অসাম্য ও বৈষম্যের চিন্তা যদি মানুষের মন মানসিকতায় থেকে যায় তাহলে শুধুমাত্র আইন করে নারী-পুরুষের যুগ যুগ ধরে চলে আসা বৈষম্যকে দূর করা সম্ভব নয়। এটি শুধু কথার কথা নয় এর পিছনে যুক্তি আছে। দুটি বিষয় এখানে দেখা প্রয়োজন। প্রথমটি হল, কোন মানসিকতা থেকে আইনটি করা হচ্ছে, দ্বিতীয়টি হল আইন প্রণয়ন করার সাথে সমাজের বুকে সেটি বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখা। প্রথমটির দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে বলতে হবে আইন করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি যে ভঙ্গিতে দেখা হয়েছে সেটি ঠিক নয়। লক্ষ্যণীয় এখানে বলা হচ্ছে যেন মেয়েদের জন্য বিশেষ কোনো আইন না থাকার ফলেই এখানে বৈষম্য তথা শোষণ ও ক্ষেত্রবিশেষে মেয়েদের প্রতি অত্যাচারের, যেমন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বা গার্হস্থ হিংসার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু বিষয়টি সত্যি কি তাই? পুরুষদের অধিকারের জন্য আলাদা করে কোন আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছিল কি? তাহলে কি কারণে বৈষম্য ও তার থেকে মেয়েদের প্রতি অন্যায়, অনৈতিক আচরণ তা বোঝা বিশেষ প্রয়োজন। এটি বুঝতে গিয়েই দ্বিতীয় প্রশ্নটি উঠে আসে ও তার তাৎপর্য বোঝা যায়। অর্থাৎ শুধু আইনের অভাবে, প্রকল্পের অভাবে যদি মেয়েরা সম অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতো, ক্ষমতায়ন না হতো তাহলে ডি জুড়ে এর সাথে ডি ফ্যাক্টো অর্থাৎ আইন কার্যকরী করার অধিকার দেওয়া মাত্রই বিশ্বের বুকে নারী পুরুষের ব্যবধান লোপ পাওয়ার পথে অনেকটা এগোতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি, কারণ তত্ত্ব ও প্রয়োগের অনেকটা ফারাক আমাদের সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে দেয়নি অর্থাৎ বাস্তব অন্য কথা বলে।

আইন প্রণীত হবার পরে সেগুলি বাস্তবায়িত হয় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। যথা পরিবার, সমাজ, পুলিশি ব্যবস্থা ইত্যাদি। এগুলি জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনচর্যার সাথে।এগুলি একত্রে কাজ করে চলে। এগুলির সাথে সমমানসিকতা সম্পন্ন হয়ে থাকলে ব্যক্তি ক্ষমতার কেন্দ্রে বা ক্ষমতার বলয়ে থাকতে পারবে, না থাকলে ক্ষমতার সেই বলয় থেকে ছিটকে পড়বে, পিছিয়ে যাবে। অর্থাৎ এখানে আবার ঘুরে ফিরে গল্পটি একই আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকবে। এর মানে হল, যেন পরিবার ও সমাজের বুকেই তো লিঙ্গ বৈষম্যের বীজটি প্রথিত আছে। সেখানেই তো জারি আছে পিছিয়ে থাকা, পিছিয়ে রাখার খেলা, পুলিশি ব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয় একেবারে। সেখানেও তাই

পুরুষতন্ত্র বা patiarchy তার কর্তৃত্বের স্বর জারি রাখে। যার উদাহরণ আমরা দেখি যে ধর্ষণ, যৌন হেনস্থা, গার্হস্থ্য হিংসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মেয়েরা পুলিশী ব্যবস্থার সহায়তা নিয়ে কেস ফাইল করতে গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাহায্য তো পায় না, উল্টে যেন আবার নতুন করে আরেকভাগ হেনস্থার শিকার হতে হয়। লজ্জাই যে সমাজে নারীর ভূষণ সেই সমাজে লজ্জা, লোকনিন্দা, অপবাদের ভয় - এগুলিকে পিছনে রেখে তবেই মেয়েদের আইন তথা পুলিশি ব্যবস্থার সাহায্য নেবার জন্য এগিয়ে যেতে হয়। এগুলোই তো একে খুব কঠিন কাজ, তার উপর যদি নতুন করে উপরি পাওনা হয় সহযোগিতার বদলে পরিহাস, তাহলে বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে -একথাই তো প্রতিষ্ঠিত হয় জোরদার ভাবে। আর এখানে যে কথাটি স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসে তা হল, পুলিশের দরজায় গিয়ে কেন এই হেনস্থা? কারণ, পরিবার হোক বা সমাজ কিম্বা পুলিশি ব্যবস্থা- সকল ক্ষেত্রেই মনমানসিকতার গভীরে প্রবেশ করে আছে যে, নারীদের পিছিয়ে থাকাই এক স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ তারা দুর্বল, আবেগপ্রবণ যুক্তি-বুদ্ধির অভাব আছে, তাদের মূল কাজ ঘরটি সামলানো। এই মেয়ে ওভাবে তাকাও কেন? মেনে নিতে শেখো। আর আপামর সমাজের এহেন মানসিকতার ফলেই আইন প্রণয়ন হলেও বাস্তবায়িত হবার পথে বাধা পেতে থাকে পদে পদে। তাই শিক্ষা, কর্ম, শ্রমের মূল্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইন থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায় না; গার্হস্থ্য হিংসা জনিত বা মানসিকতার অমিলের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের আইন প্রণীত হলেও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করতে এই সমাজের বুকে একক একটি মেয়ের সংগ্রাম আজও খুব কঠিন জায়াগায় দাঁড়িয়ে। বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাকে বাড়ি ভাড়া পাওয়া থেকে শুরু করে সন্তানকে বড় করার ক্ষেত্রে, স্কুলে ভর্তি করানো ইত্যাদি নিয়ে বহু অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় একক মা ও তার সন্তান কে। পিতার এরকম ক্ষেত্রে জৈবিক ভূমিকা ছাড়া সন্তান লালন পালনের আর কোন ভূমিকা না থাকলেও পিতৃ পরিচয় ছাড়া সন্তানের জীবনধারণ বাস্তবে খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ শুধুমাত্র মাতৃ পরিচয় এই সমাজ স্বীকার করে না; বাবার নাম কি আর বাবা কি করেন - এ দুটি প্রশ্নের হাত না ধরে কোন সন্তান এই সমাজে পথ হাঁটতেই যে পারে না তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, বিভিন্ন পরিচয়পত্র, ফর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে একসময় মায়ের নাম বাধ্যতামূলক ছিল না, বর্তমানে মায়ের নাম সংযোজিত হলেও অভিভাবকত্বের প্রশ্নে পিতাই অগ্রাধিকার পায়। ২০০৫ সাল অবধি মাকে ন্যাচারাল গার্জিয়ান বলে মনে করাই হতো না। সম্প্রতি পাসপোর্ট, ভোটার আইডি এই ক্ষেত্রগুলিতে পিতৃ পরিচয় আর বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু গ্যাস পরিষেবার মত কিছু জায়গা এখনো আছে যেখানে পিতার নাম একটি বাধ্যতামূলক জায়গা, এখানে নাম দর্জ না করলে ফর্ম ফিলাপ এর অনলাইন পদ্ধতিতে আর এগুলোই যায় না। কিন্তু যে সন্তানকে পিতা পরিত্যাগ করেছে সে মায়ের পরিচয় যদি বাঁচতে নাই পারল তাহলে বলা যায় কি নারীদের ক্ষমতায়ন হয়েছে? আর শুধু বিবাহবিচ্ছেদ প্রাপ্ত মায়েদের সন্তান কেন, যে কোন সন্তানের ক্ষেত্রেই অভিভাবকত্বের প্রশ্নে মা-বাবার সমান দাবি হওয়ায় কি কাম্য নয়? আইন তো এখন তার স্বীকৃতি দিয়েছে, সমাজ কি বলে? এত বছর ধরে এত জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা, এত প্রতিবাদ, লড়াই - এত প্রচেষ্টা, তবু মেয়েদের সক্ষম করে গড়ে তোলা গেল না কেন, কেনই বা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা জয় করে নিতে তারা

পারল না।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। বিবাহ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এ ধরনের সমস্যা নিয়ে একজন পুরুষও পুলিশ, আইনি ব্যবস্থা তথা সমাজের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে হেনস্থার শিকার হচ্ছে, এরকম দৃষ্টান্ত বর্তমানে কিন্তু মেলে। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে কম হলেও সেই নিগৃহীত ব্যক্তির যে মানসিক যন্ত্রণা তা কোনো মতেই অবহেলা করা চলে না। এক্ষেত্রে বিষয়টি কি তাহলে? কি ঘটছে এখানে? এই বিশ্লেষণটি স্বতন্ত্র একটি আলোচনার বিষয়। কিন্তু সংক্ষেপে মন্তব্য করা যায় যে, এখানে সমাজ যে পুরুষের প্রতিপক্ষ তার কোথাও প্রান্তিকীকরণ ঘটছে, অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের যে স্বর তার প্রভাব পড়ছে এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ আমরা আগেই বলেছি পুরুষতান্ত্রিক স্বর যে কেবলমাত্র সকল পুরুষেরই থাকবে এমনটা নয়, এক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক ভাবনার শিকার একজন পুরুষ যিনি সেই পরিস্থিতিতে সমাজের মূল স্রোতের ব্যতিক্রমী ধারায় অবস্থান করছেন, সেই মুহূর্তে তিনি সবল নন, ফলতো তার প্রান্তিকীকরণ ঘটছে। এই বিশ্লেষণ অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক, বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, এটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি লিঙ্গ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিভাবে নারী, আর্থসামাজিক স্তরে পিছিয়ে পড়া মানুষ এদের সামগ্রিক শোষণ হচ্ছে এবং ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন অধরা থেকে যাচ্ছে। উপরে উল্লিখিত কেস স্টাডিতে আমরা আরো একটি ধারা দেখতে পাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমরা মনে করে নিতে পারি, জেন্ডার এমন একটি ক্যাটেগরি যেখানে নারী, পুরুষ, তৃতীয় লিঙ্গ সবার অধিকার এর প্রসঙ্গ আসার কথা। তা না হলে 'জেন্ডার ইকুয়ালিটি' শব্দবন্ধটি তাৎপর্যহীন ও অর্থহীন হয়ে পড়বে।

এখানে উল্লেখ্য, নারী আন্দোলনের মাধ্যমে নারীরা কিন্তু পুরুষের সাথে সম্পর্কের থেকে মুক্তি চাইছে না তারা সম্পর্কের মধ্যে থেকেই ক্ষমতায়নের পথে যেতে চাইছে। অনেকে মনে করেন মেয়েদের ক্ষমতা অর্জনের প্রক্রিয়াটি একটি ভিতর থেকে হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি নিজের মধ্যে থেকে নিজে শক্তি সঞ্চয় করার প্রক্রিয়া। ক্ষমতা কেউ কাউকে পুরোটা দিয়ে উঠতে পারে না বলেও অনেকে মনে করেন, ক্ষমতা নিজেকেই তৈরি করতে হয়। সরকার বা আইন বা পুলিশি ব্যবস্থা সেই ক্ষমতার ভিতকে দৃঢ় করতে পারে মাত্র। সঠিকও তা কিছুটা। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন, নারী জাগরণের লক্ষ্যে পুরুষদের সাহায্য নয়, নারী নিজেই তার পথ খুঁজে নেবে[৫]। যথার্থ কথা। কিন্তু এ পরসঙ্গে যে কথাটি বলা খুবই জরুরী তা হল, নারী নিজেদের মধ্যে থেকে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে ওঠার জন্যেও স্থান-কাল অর্থাৎ পরিবেশের একটা যথাযথ সঙ্গত প্রয়োজন হয়ে থাকে। পরিবেশ যদি সাথ না দেয় তাহলে কোন মতেই একক প্রচেষ্টায় নারীর ক্ষমতা অর্জন করা হয়ে ওঠে না বা উঠবে না। আর এখানেই আমরা দেখতে পাই প্রবল বিরুদ্ধতা। চাপে পড়ে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেরা নিজেদের কথা বলে উঠতে পারে না, তার মধ্যে তৈরি হয় এক ধরনের Learned helplessness[৬], সে অনেক ক্ষেত্রে একরকম প্লিজ ডিজিজ সিনড্রমে[৬] ভোগে। কাউন্সেলিং সেশন এও কাপল থেরাপির ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় মেয়েটি তার কথা বলে উঠতে পারছে না স্পষ্ট করে। উপসংহারে বলা যায়, তবু যাওয়া আসা তবু পথ চলা, তবু চেষ্টা জারি রাখা কথা বলার, কথা বলানোর। আর এই কাজে দায়িত্ব সেই নারীদের বেশি যারা কিছুটা হলেও

সমাজে আলোকবৃত্তের ছোঁয়া পেয়েছে, ক্ষমতায়ন যাদের হয়েছে কিছুটা হলেও বেশি। এগুলি যদিও নতুন কথা নয় তবু বারবার বলার দরকার, শোনারও। কারণ শোনার অভ্যাস অর্থাৎ গুড লিসেনিং এর সাহায্যে গুড লিসেনার হয়ে ওঠা অত্যন্ত দরকারি সহমরমিতা বা এম্পাথি দেখানোর জন্য, যেটি না থাকলে নারী বা পুরুষ এর মধ্যে একে অপরকে বোঝা অর্থাৎ 'আন্ডারস্ট্যান্ড' (understanding method) করা খুবই দুষ্কর। আর পারস্পরিক বোঝাপড়া তথা বন্ধুত্বই বা নারীবাদী দর্শন মতে কেয়ার বা দরদের প্রদর্শন লিঙ্গগত বৈষম্যের মোকাবিলা করতে সমর্থ হতে পারে ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে সামাজিক ন্যায়ের যা একটি আদর্শ কিন্তু যার বাস্তবায়ন আজও অধরা।

গ্রন্থসূত্র:

১. ভাসিন, কমলা, আন্ডারস্ট্যান্ডিং জেন্ডার, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫, ওমেন আনলিমিটেড, নিউ দিল্লী, ২০০৮।
২. তদেব।
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রমাবাই এর বক্তৃতা- উপলক্ষে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৪৫১।
৪. মৈত্র, শেফালী, নৈতিকতা ও নারীবাদ, পৃষ্ঠা ১৫৫, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭।

টীকা:

৫. লার্নড হেলপ্লেসনেস: এই সমাজ এবং পুরুষতন্ত্র মেয়েদের বোঝাতে চেষ্টা করে যেহেতু তারা আবেগপ্রবণ তাই মেয়েরা সেভাবে বৌদ্ধিক চর্চা করতে পারে না, তাদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাও নেই। তারা অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত এবং শারীরিক ও স্বভাবগতভাবে দুর্বল। নিজেদের যাপনের ভিতর দিয়ে মেয়েরা এই কথাটাই বিশ্বাস করে আত্মস্থ করে নেয় এবং নিজেদের অসহায় বলে বুঝতে শেখে। একে লার্নড হেলপ্লেসনেস বলে।
৬. প্লিজ ডিজিজ সিনড্রোম: জ্ঞান হবার পর থেকেই মেয়েরা শেখে যে, তাদের কে সকলের মন জুগিয়ে চলতে হবে। এতে তাদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ বাধা প্রাপ্ত হয় এবং তারা নিজের কথা না ভেবে সকলকে সন্তুষ্ট করে চলার চেষ্টা করে। এটিকেই প্লিজ ডিজিজ সিনড্রোম বলে।

ভারতে নারীর ওপর হিংস্রতা অধ্যয়ন : মধ্যস্থতার কৌশল ও চ্যালেঞ্জ

সুদর্শনা সেন
সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

নারীর উপর হিংস্রতা অনেক রকম ভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা হলেও এই অপরাধকে কোনোভাবেই হ্রাস করা যাচ্ছে না। নারীর ওপর হিংস্রতার খবর ক্রমবর্ধমান। এর একটা কারণ অবশ্যই সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নারীর প্রতি জীবনমুখী প্রকল্প গ্রহণ। কিন্তু এই প্রকল্পগুলি গ্রহণ ও তার প্রণয়ন সর্বক্ষেত্রে নারীর প্রতি হিংস্রতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। তার অন্যতম কারণ হলো নারীকে সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে পুরুষপ্রধান সাংস্কৃতিক আবহ। পুরুষ প্রধান সংস্কৃতি চায় নারীকে অবদমিত রাখতে, তাকে পুরুষের সমমর্যাদায় উন্নীত হতে বাধা প্রদান করে। ফলে একই সমাজে আধুনিকতার সংস্কৃতি যেমন সাম্যের বক্তব্য সামনে নিয়ে আসে ঠিক একইভাবে এই সমাজের পুরুষ প্রধান সংস্কৃতি সেই চেষ্টাকে বাঁধা দেয়। এই দ্বান্দ্বিকতায় সমস্যাটির সমাধানের অনুসন্ধানও বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকল্পের মূল আলোচনার বিষয় হলো, দেখা যে নারীর প্রতি হিংস্রতা রুখতে সামাজিক কর্ম (Social Work) কিভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে এবং একটি সাম্য নির্ভর সমাজ করতে তা কেন প্রয়োজন। এই প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনার মাধ্যমে যুক্তি সাজায় যে কিভাবে এই চ্যালেঞ্জটি মোকাবিলা করা যায়।

শব্দসূচক (Key Words) : নারীর প্রতি হিংস্রতা, পুরুষ প্রধান সংস্কৃতি ও নারীর প্রতি হিংস্রতা, সামাজিক কর্ম, নারী আন্দোলন।

ভূমিকা

নারীর প্রতি হিংস্রতা সর্বব্যাপক। এই বিষয় নিয়ে অনেকদিন ধরে আলোচনা শুরু হলেও নারীর প্রতি হিংস্রতার ধরন ক্রমশ বিভিন্ন নতুন রূপ নিচ্ছে ও ধারাবাহিকভাবে গভীরতর সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। নারীর প্রতি হিংস্রতার প্রতিকার হিসাবে আইন প্রণয়ন, তার পরিবর্তন, পরিমার্জন ঘটালেও এই ঘটনার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলত: আইনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিও প্রয়োজন। এই সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে সামাজিক সংবেদনশীলতা একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এক এক করে বিষয়গুলিকে বোঝা যাক যাতে নারীর উপর হিংস্রতাকে মোকাবিলা করার কৌশল সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি।

সামাজিক লিঙ্গ সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা বলতে বোঝায় সামাজিক লিঙ্গ সাম্য সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করে আমাদের ব্যবহারে পরিবর্তন নিয়ে আসা। কিন্তু এই

বিষয়ে আলাদা করে জানার দরকার কি? তার উত্তর হলো- লিঙ্গ সংবেদনশীলতা হলো একটি লিঙ্গকে জানার ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা, যাতে সেই লিঙ্গের সংবেদনশীল প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে অন্যরাও জানতে পারে। তার ফলে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহার, বিশ্বাসগুলিকে প্রশ্ন করতে পারি এবং আমাদের চারিপাশের যে বাস্তবতা যা আমরা মনে করি 'আমরা জানি' ও 'চিনি' - তাকে প্রশ্ন করতে পারি। সামাজিক লিঙ্গ সংবেদনশীলতার লক্ষ্য হলো পুরুষ ও নারীর সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহন সম্বন্ধে সাম্য রক্ষা করা। নারী ও পুরুষের সমান স্বাধীনতা, ও যে কোনো ধরনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের সমানভাবে সুরক্ষিত করা হলো সামাজিক লিঙ্গ সংবেদনশীলতার উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে তাহলে নারীর প্রতি হিংস্রতার সম্পর্ক কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের আরো একটু গভীরে যেতে হবে।

নারীর ওপর হিংস্রতা : ধরণ ও বিস্তার

প্রতিবছর ২৫ শে নভেম্বর দিনটি নারীর ওপর হিংস্রতা অবসানের জন্য নিবেদিত আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালিত হয়। রাষ্ট্রসংঘ, হিংস্রতার শিকার হয়েছেন এমন নারীর সঙ্গে সামাজিক কর্মী, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও জীবনের নানা ক্ষেত্রের মানুষের হাতে হাত মিলিয়ে এই দিনটিকে ঘিরে আক্রান্ত নারীর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়। কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা কি? নারীর প্রতি হিংস্রতা হলো যত ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের রূপ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত অবিরাম, বিরতিহীন, ধ্বংসাত্মক একটি রূপ। বেশিরভাগ সময় এই হিংস্রতার কোন লিখিত রিপোর্ট থাকে না তার কারণ হলো দায়মুক্তি (impurity), স্তব্ধতা (silence), কলঙ্ক (stigma) ও লজ্জার ভয় (shame) যা নারীকে সহ্য করতে বাধ্য করা হয় (Ahuja, 2003, 1-12)। সাধারণভাবে, এই হিংস্রতা শারীরিক, যৌন ও মানসিক ভাবে প্রকাশ পায়। এই তিনভাবে প্রকাশিত হলেও যে যে ভাবে নারীর প্রতি হিংস্রতাকে ভাগ করা যেতে পারে সেগুলি হল- প্রথমতঃ অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা হিংস্রতা (Intimate Partner Violence)**:** যেমন প্রহার করা, মানসিক অপব্যবহার, বৈবাহিক ধর্ষণ, স্ত্রীলিঙ্গ হত্যা - নারী বলেই নারীকে হত্যা ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ যৌন সহিংসতা ও হেনস্থা, ধর্ষণ (Sexual violence and harassment, rape)**:** বাধ্যতামূলক যৌনক্রিয়া, অবাঞ্ছিত যৌন আগ্রাসন, জোর করে বিয়ে দেওয়া, রাস্তায় হেনস্তা, অবাঞ্ছিত ভাবে নারীর শরীর স্পর্শ করা, - সাইবার হয়রানি। তৃতীয়তঃ মানুষ পাচার করা (দাসত্ব, যৌন শোষন)**:** নারীকে পাচার করা, তাকে দাসী হিসেবে বহাল করা ও যৌন শোষণ। চতুর্থতঃ নারীর যৌনাঙ্গ বিকৃতি ঘটানো। পঞ্চমতঃ বাল্যবিবাহ**:** বিবাহের স্বীকৃত বয়সের নিচে তাকে বিবাহ দেওয়া (VWI, 2014)।

নারীর ওপর হিংস্রতা আদতে সাম্য রক্ষার লক্ষ্যে একটি বাঁধা, তাদের উন্নতির ক্ষেত্রে বাঁধা, নারীর মানবাধিকারের একটি কোপ, টেকসই উন্নয়ন (sustainable development)- র লক্ষ্যে কাউকেই পিছিয়ে পড়তে না দিয়ে নারীর ওপর হিংস্রতার অবসান ঘটানো জরুরী বলে মনে করা হয়। এই জন্য চাই সংবেদনশীল একটি সমাজ যেখানে এই লক্ষ্যপূরণ সম্ভবপর হবে। এই কারণে এই দুটি বিষয়কে এক সঙ্গে আলোচনায় রাখা দরকার বলে আমি মনে করি।

একটু ঘটনার বিস্তারে আসা যাক, আমরা বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকেই জানি যে তিনজন নারীর মধ্যে অন্তত একজন তার জীবদকালে এই হিংস্রতার শিকার হন, বেশিরভাগ সময়ই অন্তরঙ্গ (intimate) সঙ্গীর কাছ থেকে। Covid-19 -র প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিসংখ্যান বলছে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়েরা বিশ্বজুড়ে (প্রায় তাদের সংখ্যা ১৫ মিলিয়ন) যারা নিজেদের জীবনে কখনো না কখনো জোর করে যৌন ক্রিয়ার অংশগ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। ৪৫ থেকে ৫৫ শতাংশ মেয়েরা ১৫ বছর বয়স থেকে যৌন হেনস্তার শিকার হন (NRDR, 2012)।

সারা বিশ্বের যারা পাচার হয় তাদের মধ্যে ৭২% ই নারী। ৫ জন পাচার হওয়া নারীর মধ্যে ৪ জনের ক্ষেত্রেই যৌন শোষণের ঘটনা ঘটে থাকে। ৬৫০ মিলিয়ন নারীকে তাদের ১৮ বছর বয়সের আগেই জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। ভারতে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্ট দেখাচ্ছে প্রতিদিন ভারতে ৪৪ টি ধর্ষনের ঘটনা ঘটে (২০১৯)। আবার ২০১৯ এর তথ্য অনুযায়ী মোট ৩২,০৩৩ বত্রিশ হাজারের বেশী সংখ্যক ধর্ষণের ক্ষেত্রে তার ১১% সংগঠিত হয় দলিত নারীর ওপর। শুধুমাত্র ধর্ষণ নয়, তার ওপর নারীর শরীর জ্বালিয়ে দেওয়া, তাকে খুন করার ঘটনাও আমরা দেখি। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় প্রথমত যারা হিংস্রতার শিকার হন, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তার ওপর ঘটে যাওয়া হিংস্রতার কোনো রিপোর্ট লেখা হয় না। এবং দ্বিতীয়ত যে কটি হয় তাদের মধ্যে মাত্র ২৭% কেসগুলির নিষ্পত্তি হয় (২০১৯)। ফলে আমরা যতটুকু এই পরিসংখ্যানে পেলাম তার থেকে বেশী সংখ্যক নারীই মুখ বুজে, চাপা যন্ত্রণায় এই হিংস্রতা সহ্য করে।

ফলে এই হিংস্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং উন্নয়নে প্রত্যেককে শামিল করতে হলে লিঙ্গ সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা গড়ে তোলা জরুরী। এবার আমি আসব আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় ভাগে- এবং এটিই আজকের আলোচনায় আমার অবদান। অর্থাৎ এই লিঙ্গ সাম্য নির্ভর সমাজ গঠনে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করার জন্য আমি নারীবাদী আন্দোলন ও সামগ্রিক প্রেক্ষিতের মধ্যে সম্পর্ককে এই আলোচনার প্রেক্ষিত করব। তার কারণ নারীর উপর হিংস্রতার বিরুদ্ধে প্রথম সরব হন তারাই। তাদের মধ্যস্থতা ও কার্যকরী প্রতিবাদের ফলে রাষ্ট্র নড়ে চড়ে বসে।

১৯৭০ ও ৮০ -র দশক ভারতে নারী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত। অর্থাৎ এই সময়ের নারী আন্দোলনের ফলে সামাজিক পরিবর্তন দেখা যায়, বিশেষত নগর-জীবনে এর বিশেষ প্রভাব পড়ে। একদিকে শিল্পের অবনতি সত্ত্বেও কাজের খোঁজে শহরের দিকে পরিযানের ফলে শহরের আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বেকারত্ব, শহরের মানুষের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষার ধরন পাল্টাতে থাকে। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে নারীর উপর হিংস্রতার খবর ক্রমশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। একদিকে গণমাধ্যমে এই ধরনের খবর প্রকাশ পেতে থাকে আবার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোতে মেয়েদের অংশগ্রহণ ও সামাজিক কর্মী হিসাবে ক্রমশ মেয়েদের স্বর জোরালো আওয়াজ তুলতে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক পুরুষতান্ত্রিক আবহের বিরুদ্ধে এই আওয়াজ ক্রমশ জোরালো ও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এছাড়াও কিছু আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নারীর প্রতি হিংস্রতার বিরুদ্ধে মানুষের মতও তাদের একত্রীকরণে সাহায্য করে (Johnson,

1998, 23-31)।

নারীর ওপর হিংস্রতার বিরুদ্ধে সমস্যা, আন্দোলন ও সামাজিক কর্ম

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কনভেন্শন্ অন দি এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস্ অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন (CEDAW) সংগঠিত হয় যা ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীর বছরের বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত হয়। ভারতেও শ্রেণি-জাতি নির্বিশেষে সচেতন নারী যারা শহুরে, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির তারা তৃণমূল স্তরে কিছু সংগঠন স্থাপন করেন এবং তাদের প্রতিবাদী আওয়াজকে আরও জোরালো করে তোলেন। এই সময়ই এই নারী সংগঠনগুলি রাষ্ট্রের কার্যকারিতার বিভিন্ন ফাঁকগুলিকে চিহ্নিত করতে শুরু করে। যেমন- পুলিশের ও কোর্টের কার্যাবলী এই ধরনের বিষয়গুলিকে তারা জনসমক্ষে নিয়ে আসে। ১৯৭৪ সালে নারী গোষ্ঠীগুলি একত্রিত ভাবে পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকার দাবী করেন। এইটিই নারীর প্রতি হিংস্রতার বিরুদ্ধে প্রথম বৃহৎ আকারে সংগঠিত জনপ্রতিবাদ।

অধ্যাপক মীনাক্ষী আপ্তে (বিভাগীয় প্রধান, ফ্যামিলি ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার, টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সাইন্সেস) পুলিশ ও সমাজকর্মী এবং শিক্ষাবিদদের মধ্যে এক বিশেষ সংযোগ গড়ে তোলেন যার ফলে পুলিশ স্টেশনে হিংস্রতার শিকার যারা তাদের মানসিক-সামাজিক ও আইনি সহায়তা দান করার প্রস্তাব ওঠে। অপরাধী বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যেই ঐতিহাসিকভাবে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল সেই সম্বন্ধে প্রথম এই উদ্যোগই আমাদের সচেতন করে। আজ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে নারী আন্দোলনের বৃহৎ প্রেক্ষিতের মধ্যে একটি বিতর্ক চলছেই যে অপরাধী বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা কর্তৃত্বকারী কি না এবং এই ব্যবস্থা কখনো হিংস্রতার শিকার হওয়া নারীদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম কি না? এই বিতর্কের জেরে পুলিশ স্টেশনকে মহিলাদের ওপর হিংস্রতার কেন্দ্রীয় স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়- এখানেই মেয়েরা হিংসার শিকার হলে প্রথমে সাহায্যের জন্য যান। এই পুলিশিব্যবস্থাকে সামাজিক লিঙ্গ সচেতন ও সংবেদনশীল করে তোলার লক্ষ্যে নারী সংগঠনগুলি আওয়াজ তোলেন (Wickramasinghe, 2014, 245-257)।

চ্যালেঞ্জ কোথায়?

নারীবাদীরা গার্হস্থ্য হিংসা বা বিস্তারিতভাবে নারীর ওপর হিংস্রতা কেন ঘটছে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যেই রাজনীতি (Personal is political)- বিভিন্ন নারী সংগঠন গুলির কাজ হল নারীকে তার জৈবিক লিঙ্গ আরোপিত ভূমিকা পালনের মধ্যে কোথায় ও কিভাবে হিংস্রতা লুকিয়ে থাকে সেই সম্বন্ধে সচেতন করা। তাদের এই বিষয়ে বিশ্বাস জাগানো যে তাদের মধ্যে কোনো ত্রুটির জন্য তারা হিংসার শিকার হন তা নয় বরং পুরুষের হাতে হিংস্রতা একটি মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে পুরুষ তার স্থিতিশীলতা(Status quo) বজায় রাখে। দ্বিতীয়তঃ মানসিক কষ্টের মোকাবিলা করা (Dealing with psychological distress)- শুধুমাত্র কেন মেয়েরা পরিবারের মধ্যে ও বাইরে হিংস্রতার শিকার হন তা নয় হিংস্রতার শিকার হওয়ার ফলে তাদের মানসিক অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করাও দরকার। সেই বিষয়টির সম্বন্ধেও এই

সংগঠনগুলি সচেষ্ট। তৃতীয়তঃ অস্পষ্টতাকে মেনে নেওয়া (Accepting ambiguity)- যখন কোন মহিলা counselling center এ আসেন তখন হিংস্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার ওপরেই তারা জোর দেন এবং এমন সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চান কিন্তু কিছুদিন পর আবারো সেই সম্পর্কের মধ্যে তারা মানিয়ে নিতে চান। নারীবাদীরা মনে করেন এই অস্পষ্টতা থাকতে পারে, যে কারণে নারীকে তার অবস্থার সঙ্গে সমঝোতা নয় বরং বুঝতে সাহায্য করা দরকার যাতে সে একধারে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হয়ে ওঠেন এবং শোষনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন। নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। চতুর্থতঃ সচেতনতা বৃদ্ধি করা (Consciousness raising)- নারীবাদী সংগঠনগুলি সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয় যাতে পরিবার বিবাহ ও তার মধ্যে নিহিত দ্বন্দ্ব (Contradiction) গুলি তারা চিনতে পারেন ও সে বিষয়ে সচেতন হয় (Ibid, 142-161)।

কিন্তু এবার প্রশ্ন হলো নারী সংগঠন যে কাজগুলি করেছেন তার মধ্যে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে?

মেয়েদের জীবনে হিংস্রতার ঘটনা দৈনন্দিনের। তারা এতটাই হিংস্রতার সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে থাকেন যে সেই ঘটনাগুলি অনেকাংশেই 'স্বাভাবিক' এমনটাই মনে হয়, এমন ধারণা তারা গড়ে নেন। এই জন্য যা কিছু তারা স্বাভাবিক বলে ধরে নেন সেই সব ঘটনাকে তারা কখনো প্রশ্ন করেন না। যে কারণে হিংস্রতার ঘটনা ঘটার পরও কোনো counselling centre এ উপস্থিত হয়ে তারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বচ্ছন্দ থাকেন না। তারা স্পর্শকাতর প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চান এবং বেশিরভাগ সময়ই চুপ করে থাকেন। তারা স্বামীর কাছ থেকে অভব্য আচরণ ও প্রহৃত হলেও মনে করেন স্বামীর কাছ থেকে এটিও স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্য সুতরাং তারা এই বিষয়ে মুখ খুলতে চান না। আবার এমন কিছু হিংস্রতা আছে যা 'অপরাধ' হিসাবে চিহ্নিত হয় সেগুলি সম্বন্ধেও অসচেতনতা থাকে। এমন কোনো ঘটনাকে তারা তাদের ওপর ঘটা হিংস্র ঘটনা হিসাবেও দেখতে চান না। নারীবাদী মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি স্বীকার করেন যে নারীর ওপর হিংস্রতা আদতে একটি জটিল বহুমুখী বিষয় যা কোনো সামাজিক প্রেক্ষিতে ঘটে যা আবার লিঙ্গ বিশেষ নিয়মতান্ত্রিকতার দ্বারা গঠিত। যেমন সব সময়ই খুব কাছের নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা যা সবার সামনে নিয়ে আনলে নারীর নিজের পক্ষেও অবমাননা মনে হয়। এর সঙ্গে আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে এমন ঘটনা কখনোই লিখিত হয় না। সে কারণে যখন ঘটনা ঘটবে তখন এগিয়ে আসার থেকেও আগে থেকে সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া দরকার।

কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়েরাই ব্যক্তিগত জীবনের বিষয় সামনে নিয়ে আনতে চান না। সে কারণে কোন সময়টি আদর্শ সময় সেটির নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মধ্যস্থতাকারীর ক্ষেত্রে। আবার মনে রাখতে হবে অনেক ধরনের হিংস্রতাই ঘটে বন্ধ দরজায় ভেতরে সেজন্য এই ঘটনার সম্বন্ধে জানতে হলে সেই সম্বন্ধে মূল্যায়ন করতে হলে নৈর্ব্যক্তিকভাবে তা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সে কারণে আমাদের মনে রাখতে হয় যে হিংস্রতা সম্বন্ধে আলোচনায় কোনটি হিংস্রতা বা কে অপরাধী (offender) এবং কার জীবনের অধিকারে হিংস্রতার মধ্যে দিয়ে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বা অধিকার লংঘন করা

হচ্ছে সেগুলি সম্বন্ধে স্পষ্টতা থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন ধরনের হিংস্রতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে যাতে অপরাধী যিনি অপরাধের শিকার হয়েছেন এবং কোন স্থানে অপরাধটি / হিংস্রতা ঘটেছে তা জানতে হবে। তৃতীয়ত মনে রাখতে হবে স্থান যাই হোক নারীর উপর হিংস্রতার মধ্যে সামাজিক লিঙ্গ- ক্ষমতা- কর্তৃত্বের সম্পর্ক আছে। শুধু তাই নয় তার সঙ্গে জড়িত জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, মর্যাদা ও যৌন অভিমুখ (orientation)। তার কারণ নারীর ওপর হিংস্রতার বিভিন্ন ধরন কখনো 'স্বাভাবিক' কখনো 'অপরাধ' আবার কখনো দুটিই। ফলে এই ধাঁধাটির সমাধানের জন্য প্রয়োজন লিঙ্গ সংবেদনশীল সমাজ, সমাজ-কর্মী, এবং রাষ্ট্র।

কৌশল

এই সামাজিক কাজের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল- প্রথমতঃ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও এমন বিশ্বাস যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ক্ষমতা আছে নিজেকে পরিবর্তন করার। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি স্তরে এবং কাঠামোগতভাবে ও পরিকল্পনার সাহায্যে পরিবর্তন আনা সম্ভব। তৃতীয়তঃ সমাজে প্রান্তিক যারা তাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা জরুরি। চতুর্থতঃ হিংস্রতার পরে বেঁচে আছেন এমন মানুষের সঙ্গে কাজ করার সময়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, গ্রহণযোগ্যতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। Feminist Social Work বা নারীবাদী সামাজিক কাজ এক ধরনের সামাজিক কাজ যা নারীর কল্যাণের জন্য সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে চায় এবং তার জন্য হস্তক্ষেপ দাবী করে। এই কাজের জন্য শিক্ষিত, দক্ষ কর্মী প্রয়োজন যারা সংবেদনশীল ও সচেতন। এরা একধারে যেমন নারীকে সমর্থন করবেন তেমনি সর্বক্ষণ চ্যালেঞ্জ করবেন পুলিশি ও পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে যাতে ব্যক্তি ও ব্যবস্থা দুটিকেই ক্ষমতায়িত করা যায়। এই সামাজিক কর্মী হিংস্রতার শিকার হয়েছেন এমন নারীর সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথা বলেন, তাকে আবেগের সঙ্গে সমর্থন করেন, তাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা করেন এবং তিনি যাতে বহিরাগত সমর্থনকারী ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে নিজেকে ক্ষমতায়িত করতে পারেন সেই চেষ্টা করেন (Kelly and Radford, 1998, 63-76)। যেমন হিংস্রতার শিকার হয়েছেন এমন নারী কে বিভিন্ন ধরনের ফোরাম ও গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় যাতে তার সামাজিক বিশ্বের বিস্তৃতি ঘটে । তাছাড়াও যাতে তার স্ব-সংকল্প গড়ে ওঠে তার চেষ্টা করা হয়। এই স্ব-সংকল্প তাকে দৃঢ়চেতা করে এবং হিংস্রতার আবহে সে নিজের সঙ্গে অন্য এমন নারীর অবস্থানের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারেন, তা দেখা হয়। নারীবাদীরা নারীর ওপর হিংস্রতার বিষয়ে শুধুমাত্র এটুকুতে থেমে থাকেননি। তারা গার্হস্থ্য হিংসা বিষয়টিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। ৮০- র দশকে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন হিংস্রতার বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি আইনের পরিমার্জনও ঘটে। নারীবাদীরা এইসময় থেকে মনে করেন যে শুধুমাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বিষয়টিকে নিয়ে ভাবলে বা সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। ফলে তারা আইনের পরিবর্তনের জন্য সরব হন। যেকোনো ধরনের ঘটনা ঘটলেই তারা সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের আন্দোলন ও প্রতিবাদকে আরো জোরালো করে তুলেছেন। এই সময় থেকেই তারা শিকার (victim) ও যিনি

বেঁচে যা(survivor) তাদের জন্য সংগঠনের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদানে উৎসাহী হন। এই সময়ের কতগুলি উল্লেখযোগ্য নারী সংগঠন হলো- ভিমোচনা, সহেলী, স্ত্রী সংঘর্ষ, জাগোরী, কর্মীকা, আওয়াজ, শহীয়র ইত্যাদি। তাদের প্রাথমিক চেষ্টা ছিল, যে মেয়েরা প্রতিদিন গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হচ্ছেন তাদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের সমর্থনের পেছনে এই নারীবাদী কর্মীদের বিশ্বাস ছিল যে, যেহেতু তারাও একই সামাজিক পরিবেশে থাকেন সেহেতু তারা নিজেরাও কোন ধরনের অপব্যবহার (abuse) -এর অভিজ্ঞতা থেকে সুরক্ষিত নন। সেজন্যই এই সংগঠন গুলির মধ্যে অনেকগুলি তাদের মধ্যস্থতাকে 'কাউনসেলিং' বলতেন না। তার কারণ 'counselling' বলতে সেই সময় মনস্তত্ত্বে ব্যবহৃত একটি বিষয় বোঝানো হত যার অর্থ ছিল নারীকে বোঝানো কিন্তু ধারণাটির অপব্যবহারের সঙ্গে কিভাবে যুঝতে হবে তার বিষয় কোনো ধারণা নয়। এই ধারণাটির ব্যাপ্তিকে আরো বিস্তৃত করে ধারণাটির ব্যবহারের ওপর আরো জোর দেওয়া হয়। এই সময়ে এই ধরনের মধ্যস্থতায় হিংস্রতার শিকার হওয়া নারী শুধুমাত্র যে তার নিজের জীবনে অপব্যবহৃত হওয়ার বিষয়কে প্রশ্ন করবেন-সেই বিষয়ে সচেতনতা তৈরীই শুধু নয় বরং তিনি কিভাবে অন্যের জীবনে অন্যের জন্য এই ধরনের সমর্থন গড়ে তুলতে পারবেন সেই বিষয়ে তাকে ক্ষমতায়িত করে তোলা। সেই থেকে ব্যক্তিগতভাবে অপব্যবহৃত হওয়ার বর্ননাকে একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা শুরু হয় যাতে নারী একই ধরনের অবস্থা বা পরিস্থিতিতে এই পদ্ধতির সাহায্যে অন্যের পাশে, সমর্থনে দাঁড়াতে সক্ষম হন এবং তার সামাজিক বিশ্বকে বিস্তৃত করতে পারেন। এই সময় থেকে ভগিনীদল(Sisterhood) ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় স্লোগান বা ধারণা হয়ে ওঠে। ৮০ র দশকের পরবর্তী সময় থেকে নারী আন্দোলন আইনী ব্যবস্থায় সংস্কার (reform) নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হলো ফ্যামিলি কোর্টের গঠন। এক সামাজিক লিঙ্গ সাম্যের লক্ষ্যে একটি বিধিবদ্ধ এই কাঠামোর গঠনের মাধ্যমে গার্হস্থ্য হিংসার বিষয়গুলিকে এখানে আলোচনা ও নিষ্পত্তির কথা ওঠে। এই সময়ে 498A (IPC) র গঠনের মাধ্যমে নারীও যে গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে পারে তার বৈধতা কায়েম হয়। ৯০ র দশকের মধ্যে নারী সংগঠনগুলো সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গার্হস্থ্য হিংসায় আক্রান্ত নারী ও শিশুর জন্য দৈনন্দিন যত্নের সুবিধাজনক কেন্দ্র শুরু করে। পুনায় 'সুসংবাদ', গুজরাটে 'ওলাখ', কলকাতায় 'স্বয়ম' এই ধরনের পরিষেবাদানে সক্ষম হয়ে ওঠে। দূরাভাষের মাধ্যমে আক্রান্ত নারীর সঙ্গে কথা বলার প্রয়াসে ১৯৯৯-এ 'তর্ষী' নামের সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজন হয়ে ওঠে। হিংস্রতার বিরুদ্ধে ১৯৮৪ এ গঠিত The Resource Centre for Interventions on Violence Against Women ও 2000 সালে 'দিলাশা' গঠিত হয়। টাটা ইনস্টিটিউটে গঠিত এই কেন্দ্র গার্হস্থ্য হিংসায় আক্রান্ত নারীরা যখন পুলিশের কাছে যান তখন তাদের সমর্থন করেন এবং 'দিলাশা' হল একটি হাসপাতাল কেন্দ্রিক মধ্যস্থতাকারী সংস্থা। 'দিলাশা' গঠনের উদ্দেশ্য হলো হিংস্রতার শিকার হওয়া মেয়েরা যখন হাসপাতালে যাবেন তখন তাদের স্বাস্থ্য বিষয়টি সম্বন্ধে এঁরা সমর্থন ও সাহায্য করেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের এই বিষয়ে সংবেদনশীল করে তোলার কাজও করবেন। ২০১৪ সালে গঠিত অন্বেষী (কেরালা), 'সখ্য' ও 'স্বাতী' (গুজরাট) সংগঠনগুলিও নারীর ওপর হিংস্রতার গুরুত্বপূর্ণ

সমর্থন ও সাহায্য করে থাকে। তাহলে নারীর উপর হিংস্রতার যেমন প্রমাণ পেলাম, তেমন দেখলাম লিঙ্গ সংবেদনশীলতার প্রয়োজন কোথায় আবার দেখলাম নারীর ওপর হিংস্রতার বিরুদ্ধে নারী আন্দোলন কিভাবে একদিকে সচেতনতা তৈরি ও অন্যদিকে নারীর জন্য ভাবনার দীপ্তির ওপর কিভাবে কাজ করছে।

উপসংহার

নারীর ওপর হিংস্রতা দৈনন্দিন ঘটছে বললে ভুল হবে। এই ঘটনা ধারাবাহিকভাবে নারীর জীবনকে দমিত রাখে, তাকে প্রান্তিক করে তোলে এবং সমাজে সে দয়ার পাত্রী হয়ে ওঠে। এই ঘটনার বিস্তার ও গভীরতা ব্যাপক। আমাদের জীবনে নারীকে কেন্দ্র করে যে পুরুষপ্রধান ভাবনার জাল বোনা হয় তার থেকে মুক্তি পেতে নারীর জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তার মধ্যে নারীবাদী ভাবনা অন্যতম। নারী হিংস্রতার শিকার হয়ে অথবা হিংস্রতার মধ্যে বেঁচে থেকে মানসিকভাবে যতটা ধাক্কা খায় তার প্রতিকার কখনোই আইনী পরিমার্জন, পরিবর্তন বা প্রণয়ন সম্পূর্ণ করতে পারে না। নারীর সক্ষম হওয়া, নিজেকে বঞ্চিত মনে না করে পুরুষপ্রধান ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে সশক্ত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিও খুব জরুরী। নিজেকে নারী হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে দেখার, সেই মত বাঁচতে শেখা এই পুরুষপ্রধান সমাজে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সুতরাং রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির জীবনের সংযোগে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারীর উপস্থিতি এই চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রক্রিয়ায় খুব জরুরী। নারীবাদী সংগঠনগুলি এই কাজটি করছেন। এই কৌশল কিছু ক্ষেত্রে কার্যকরও হচ্ছে। তবে সামগ্রিক ভাবে এই কৌশল কার্যকর হওয়ার জন্য দরকার সামাজিকভাবে সংবেদনশীল একটি সমাজ। এই সংবেদনশীল সমাজই পারবে ভবিষ্যতে সাম্য নির্ভর সমাজ গড়ে তুলতে। এই সাম্য নির্ভর সমাজের লক্ষ্যে আমাদের হাতে হাত রেখে এগোতে হবে। এক সাম্য নির্ভর সমাজ পুরুষকর্তৃত্ব নয় মানবতার আলোকে নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা দেবে এবং এই সমাজেই নারীর ওপর হিংস্রতার ঘটনা কমবে এই আশা আমাদের সকলের।

References

Johnson, Holly., 'Rethinking Survey Research on Violence against Women' in R. E. Dobash and R. Dobash (Ed), Rethinking Violence Against Women, Sage, Thousand Oaks, (1998)

Kelly, Liz., and Radford, Jill., 'Sexual Violence against Women and Girls: An Approach to International Overview', in R. E. Dobash and R. Dobash (Ed), Rethinking Violence against Women, Sage, Thousand Oaks, (1998)

National Record Bureau Report, 2012

Ahuja, Ram., Violence against Women in India, Rawat, New Delhi, (2003)

Violence against Women in India: A Review of Trends, Patterns and

Responses, ICRW for UNFPA, India, April 2004
Wickramasinghe, Maithree., Feminist Methodology: Makings, Meanings of Meaning-making, Zuban, New Delhi, (2014)

জয়া মিত্রের 'দ্রৌপদী' : পৌরাণিক রূপকল্পের নবনির্মাণ?

ইন্দ্রানী রুজ
গবেষক (পি এইচ ডি), বাংলা বিভাগ,
বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ :
বাংলা সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যদ্বয়ের উপস্থিতি অমোঘ। কালপরম্পরা ক্রমে তা প্রজন্মবাহিত হয়ে আসছে। এই দুই কাব্যের মধ্যে মহাভারতের বিস্তৃতি, জটিলতা এবং নিহিত সমাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা বেশি এবং তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। জনসাধারণের নিকট আদৃত এই কাব্যের মূল টেক্সট অধিকাংশ মানুষের অপঠিত অথচ মূল ঘটনার সংক্রম, চরিত্র-পাত্রদের ক্রিয়াকলাপ শ্রুতি-দৃশ্যবাহিত হয়ে উঠেছে অতি চেনা। ফলে লোককথা, বাগধারা, প্রবাদ, প্রবচন জুড়ে রয়েছে মহাভারতের বিশ্রুত উল্লেখ। সমগ্র ভারতবর্ষের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিমে মহাভারতের অজস্র অধিগ্রহণ ঘটেছে সাহিত্যের নানা সংরূপে। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। মহাভারতের যে চরিত্রগুলি সর্বাধিক চর্চিত তা হল কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী। দ্রৌপদী তার স্বকীয় কিছু চিহ্ন রেখেছেন এই মহাকাব্যে, যা পরবর্তীকালে সাহিত্যিকদের ভাবিয়েছে। নারীবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতির ঘরানা নতুনভাবে নির্মাণ করেছে চরিত্রটিকে। প্রগতিশীল গল্পকার জয়া মিত্রের লেখাপত্রের মধ্যে পৌরাণিক মোটিফের ব্যবহার স্বল্প। তারমধ্যে একটি হল 'দ্রৌপদী'। নামকরণে মহাকাব্যের চরিত্রের সঙ্গে মিল থাকলেও সমগ্র গল্পের অবয়বে কোথাও এর উল্লেখ মাত্র নেই, এমনকি প্রোটাগোনিস্ট চরিত্রটির নামও ভিন্ন। তাহলে এই অ্যালিউশনের মধ্যে দিয়ে কি পৌরাণিক রূপকল্পের নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন তিনি? প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তার উত্তর অন্বেষণ এই প্রবন্ধের বক্ষ্যমাণ বিষয়।

সূচক শব্দ : দ্রৌপদী, অ্যালিউশন, পুরাণ, রূপকল্প, নবনির্মাণ, নারীবাদ।

''যা দেখেছি যা পেয়েছি' তার অর্থ আমার নিজের বোধের দর্পণে প্রতিফলিত হবে কোথা দিয়ে যদি দেখার চোখের সঙ্গে সঙ্গে দেখার অর্থকে মিলিয়ে নিতে না পারি অভিজ্ঞতায়? চলার পথে জীবন হাত ধরে শেখায় সেই দৃষ্টি। হয়তো সর্বদা সুখের নয় সে জানা, কিন্তু সেও তো পথ। চলারই অংশ। সে পথের ভাঙা মানুষ, ঝরা মানুষ, পড়তে পড়তেও অন্যের হাত ধরে তুলে দেওয়া মানুষ - এঁরা আমার গল্প জুড়ে বসেছেন।''[১] এই 'এঁরা' যাঁর গল্প-জুড়ে বিস্তার পেয়েছে, তিনি জয়া মিত্র। একুশ শতকের একজন অন্যতম পরিচিত কথাসাহিত্যিক। সাহিত্যের সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতা, মেয়েদের প্রতি মনস্কতা ও রাজনৈতিক মত-স্বাতন্ত্র্য জয়াকে সমকালীনদের থেকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বিগত শতাব্দীর আটের দশকে জয়া মিত্রের সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ। "তার পর তিন দশকেরও বেশি সময় বয়ে গেছে। জীবনের পরিক্রমাও কম ঘটেনি। বেনারস থেকে কার্শিয়াং, কলকাতা, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও আসানসোল। মাঝের একটি জেলপর্বও রয়েছে। এসব মিলেই লেখা ও লেখক দু'য়েরই নির্মাণ।''[২] সঙ্গত কারণেই রামকুমার

মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''এ স্বরে রাজনীতি আছে, নাটুকেপনা নেই।''[৩]

নাটুকেপনাহীন স্পষ্ট সেই স্বর কীভাবে তাঁরই লেখা একটি গল্পে জড়িত ও জারিত হয়েছে তা ভাববার অবকাশ তৈরি করেছে। গল্পের নাম 'দ্রৌপদী'। সময় ১৯৮৭। গল্পসংগ্রহের তৃতীয় এই গল্পটির নাম পৌরাণিক মহাকাব্য মহাভারতের একটি চরিত্রর অনুসরণে নির্মিত। বামপন্থী, একদা নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সংলগ্ন জয়া তাঁর প্রায় ঊনপঞ্চাশটি গল্পের মধ্যে মাত্র দুটি গল্প পৌরাণিক আখ্যানের আধারে লিখেছেন। দুটিই মহাভারত উৎসজাত। একটি 'কুরুক্ষেত্রের আগে' এবং অন্যটি 'দ্রৌপদী'।

মহাভারতের দ্রৌপদী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞ থেকে উদ্ভূতা মেয়ে। যজ্ঞসেনের কন্যা। তাই তাঁর আর এক নাম যাজ্ঞসেনী। পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী। প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাদের[৪] অন্যতমা পাঞ্চাল-দুহিতা পাঞ্চালী[৫]। কৃষ্ণা, সৈরিন্ধ্রী[৬] প্রভৃতি বহুনামে পরিচিতা। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও কৌরব বংশ ধ্বংসের অন্যতম কারণ হলেন এই দ্রৌপদী। প্রতিবাদিনী, তেজস্বিনী, স্বয়ম্বরা এই চরিত্রটি সমস্ত মহাকাব্য জুড়ে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য ও অসামান্য দৃঢ়তার সাক্ষ্য রাখলেও মূলত পাঁচ স্বামীর কারণেই তিনি অধিক চর্চিত। দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে অর্জুনকে বরমাল্য প্রদান করলেও অর্জুন-মাতা কুন্তীর অসতর্ক নির্দেশে অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠসহ পাঁচ ভাইকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হন। মহাভারত এমনকী রামায়ণে এক পুরুষের একাধিক স্ত্রীর প্রভূত দৃষ্টান্ত থাকলেও এক নারীর একাধিক স্বামীর উদাহরণ কার্যত দুর্লভ। যে কারণে দ্রৌপদী সীতার মতো আদর্শ ভারতীয় নারীর তকমা পাননি। জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে বাজি রাখেন। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র ও শকুনির কাছে পরাজিত হলে রাজসভায় জনসমক্ষে পঞ্চস্বামীত্বের কারণে তাঁকে 'বেশ্যা' বলে অপমান করা হয় এবং রজঃস্বলা অবস্থায় বস্ত্রহরণের মতো কদর্য ঘটনা ঘটে। যদিও সমূহ অসম্মান ও অস্বীকৃতির মূল উৎস 'বিজেতা' নারীকে 'পরম রমণীয় বস্তু' হিসেবে কুন্তি পুত্রের দ্রৌপদীকে মায়ের কাছে উপস্থাপন। ফলশ্রুতিতে কুন্তির বিভ্রান্তকারী আদেশ এবং তার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ পরবর্তীকালে সত্যরক্ষার্থে পাঁচ ভাই সেই আদেশ পালন। পূরবী বসুর একটি লেখার সূত্রে জানা যায়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যালি সাদারল্যাণ্ড ২০০৫ সালে উত্তরপ্রদেশে কৃত একটি জনসমীক্ষায় দেখেছেন প্রাচ্য মিথোলজির সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র হলেন রামায়ণের সীতা।[৭] অথচ দ্রৌপদী সীতা অপেক্ষা অনেক বেশি সবল, সজীব, ক্রিয়াশীল ও বাস্তবানুগ! মূলত এই যুক্তিতেই সীতা সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠেছেন। আপাত শক্তিশালী এই চরিত্রের ট্র্যাজিক দিকটি অগোচরে থেকেছে। ফলত পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে সাহিত্যিক-শিল্পীরা দ্রৌপদীকে নির্মাণ ও বিনির্মাণ করেছেন। জয়া মিত্রের 'দ্রৌপদী' গল্পটি কি সেই পৌরাণিক রূপকল্পের নবনির্মাণ? নাকি ভিন্নতর কিছু? এসমস্ত পরিপ্রশ্ন ও তার সাম্ভাব্য উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো আমরা।

তবে তার আগে মহাভারত ছাড়াও কয়েকটি পুরাণে দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ এসেছে; সেই প্রসঙ্গগুলি উপস্থাপনার সাহায্যে দ্রৌপদী চরিত্রের একটি সামগ্রিক আভাস পাওয়া যেতে পারে। যেমন 'নারদ পুরাণ' ও 'বায়ু পুরাণ' অনুযায়ী দ্রৌপদী একাধারে ধর্ম-পত্নী শ্যামলা, বায়ু পত্নী ভারতী, ইন্দ্র পত্নী শচী, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পত্নী ঊষা ও শিব পত্নী পার্বতী। সত্যযুগে বেদবতী রূপে তিনি রাবণকে অভিশাপ দেন। ত্রেতাযুগে সীতা

হিসেবে আবির্ভূতা হন এবং ছায়ারূপে নারায়ণ সরোবরে শিবের কাছে পাঁচবার স্বামী প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন্মে যথাক্রমে দময়ন্তী ও দয়মন্তী কন্যা নলযানী রূপে আবির্ভূতা হন। পঞ্চম জন্ম বা দ্বাপরযুগে ইনিই হলেন দ্রৌপদী। পূর্ব জন্মে দ্রৌপদী চোদ্দগুণসম্পন্ন স্বামী প্রার্থনা করলে শিব তাঁকে পাঁচ ব্যক্তির আধারে আধারিত চোদ্দো গুণ সম্পন্ন স্বামী উপহার দেন, যে-কারণে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী। এ-সমস্ত যুক্তি দিয়ে বস্তুত বহুগামিতা (এখানে polyandry)-কে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকী মহাভারতেও পঞ্চস্বামিত্বের প্রসঙ্গটিকে বৈধতা দিতে দশ প্রচেতার এক নারীকে বিবাহ কিংবা মুনি গৌতমের বংশে সাত ঋষির এক কন্যাকে বিবাহের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এসবের মধ্যে দ্রৌপদীর মতামত সম্পূর্ণ অশ্রুত থেকে যায়! প্রতিভা বসু তাই ব্যঙ্গ করে বলেছেন, ''নারীদেহ তো নয়, যেন খেলার বল। একের কাছ থেকে অপরের কাছে।''[৮]

পুরাণকে নবরূপে পরিবেশন একটি স্বীকৃত ও নান্দনিক রীতি। পৌরাণিক বিভিন্ন চরিত্রের মতো দ্রৌপদী চরিত্রের মোটিফগুলি সাহিত্যে নানাভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। 'দ্রৌপদী'-কে উপলক্ষ্য করে নাটক-কবিতা-গল্পের সংখ্যা কম নয়! আশি পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী চিন্তাচেতনার যে ক্রমবিকাশ তার সূত্র ধরেই দৃশ্য মাধ্যমগুলিতেও দ্রৌপদী চরিত্রটির জনপ্রিয়তা লক্ষ করার মতো (প্রসঙ্গত, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বলদেব রাজ চোপড়া প্রযোজিত ভারতীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত 'মহাভারত' সিরিজে 'দৌপদী' চরিত্রে অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থাপনা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাধারণের মধ্যে দ্রৌপদী একটি আইকনিক চরিত্রে পরিণত হয়ে ওঠে।)। দৃশ্য মাধ্যম ছাড়াও এই চরিত্রের মোটিফ ব্যবহার করে বাংলাতেও বহু গল্প লেখা হয়েছে। জয়া মিত্রের 'দ্রৌপদী' গল্পের নিবিড় পাঠ থেকেই এই মোটিফ অনুসন্ধান করা সম্ভব।

গল্পটি শুরু হয়েছে একটি নির্দেশক বাক্য দিয়ে, "আজ রবিদা ফিরে এলেন।"[৯] বর্তমান-অতীত-বর্তমান - এই ক্রমে গল্পটিকে বিস্তার দিয়েছেন গল্পকার। গল্পে একজন 'আমি' তার চিন্তাসূত্র ব্যক্ত করে চলে বর্তমান প্রেক্ষিত এবং ফ্ল্যাশব্যাকে সুদূর অতীত থেকে সাম্প্রতিক অতীতের কার্য-কারণের মধ্য দিয়ে। এই 'আমি' চরিত্রটির নাম ঝুমলা। তার সঙ্গে সম্পর্কসূত্রেই বাকি চরিত্রগুলি গ্রন্থিত। 'দ্রৌপদী' গল্পের প্রোটাগনিস্ট ঝুমলা। সেই অর্থে কাহিনিক্রম খুব জটিল নয়, তবে এর বিস্তার প্রায় একযুগব্যাপী সময় ধরে। চার মেয়ে ও এক ছেলেসহ একটি স্বচ্ছল ব্যবসায়ী পরিবারকে কেন্দ্র করে আখ্যানটি বিন্যস্ত। পরিবারের চতুর্থ সন্তান ঝুমলা তার বড় দিদির থেকে বারো বছরের ছোট। তার আট বছর বয়সেই বড় দিদির বিবাহ হয়ে যায় চাকুরিজীবী রবির সঙ্গে; যিনি এই গল্পে ঝুমলার 'রবিদা'। কিন্তু দিদির বিবাহের এক বছর পর ঝুমলার বাবা ও দাদা ব্যবসার কাজে কোডারমা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন এবং তাঁরা মারা যান। এরপর রবিদাই হয়ে ওঠেন তাদের একমাত্র অবলম্বন। ঝুমলার কথায়, ''আস্তে আস্তে কখন যেন রবিদা আমাদের দাদা আর বাবা দুটো জায়গাই নিয়ে নিল।''[১০] অতীতের পাঠ চুকিয়ে অসহায় এই পরিবারটিকে হাজারিবাগে নিয়ে আসেন রবিদা। ঝুমলাদের স্কুলে ভর্তি করান। তার মেজদি স্কুল ফাইনাল পাশ করে ভালো কলেজে অ্যাডমিশন নিয়ে চলে যায় হোস্টেলে। অন্যদিকে মুষড়ে পড়া ঝুমলার মা রবিদা-বড়দির সাহচর্যে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। ঝুমলা বলে, ''এমন হৈ চৈ করে মজা করে আমরা

থাকতাম যেন বরাবর আমরা এরকমই আছি।"[১১] যদিও পরবর্তীকালে এই 'এত যত্ন, এত আনন্দ' নিয়েই আক্ষেপের সুর শোনা যায় তার গলায়। প্রসঙ্গত রবিদার সঙ্গে ঝুমলার রসায়নটি ফুটে উঠেছে ঝুমলারই কিছু স্মৃতিচারণায়। হোস্টেলে চলে যেতে হবে এই আশঙ্কায় ভীত, অসুস্থ হয়ে পড়ে ঝুমলা। মা কিংবা দিদি-বোনদের কাউকে লজ্জায় সেকথা বলতে না পারলেও রবিদা "...চেয়ারের কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বর আছে কিনা তারপর খাটের ওপর বসে খুব আদর করে বললেন, 'তোর শরীরটা কেন এত খারাপ হচ্ছে বলত?"[১২] ঝুমলা জানায়, "আস্তে আস্তে একটুও না বকে রবিদা সেদিন আমার সবকথা জেনে নিয়েছিলেন, ভয়ের কথা, অসুখের কথা, পরীক্ষা খারাপ হবার কথা। হাসেনও নি।"[১৩] এভাবেই ঝুমলার বাচনে রবিদা চরিত্রটি সংবেদনশীল পিতৃপ্রতিম ব্যক্তিত্বরূপে চিত্রিত হয়ে উঠেছে। সানন্দ এবং ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠা পরিবারটি আবারও আকস্মিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় ঝুমলার বড়দির একরাতেই টিটেনাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটায়। মানালি ও কুকু - দুই শিশুকন্যা নিয়ে রবিদার নিঃস্ব পিতৃসত্তাকে সহায়তা দিতে এগিয়ে আসে ঝুমলা। অন্যদিকে মেজদির বিবাহ হয়ে যায় তারই সহপাঠী সুরঞ্জনের সঙ্গে। এখানেও অনিবার্যভাবে নেপথ্যে থাকেন রবিদা। ঝুমলা জানায়, "সবই সামনে একরকম চলছিল আবার। কেবল এক একদিন সকালে রবিদার মুখ দেখে কষ্ট হয়। বোঝা যায় ঘুমোননি রাত্রে।"[১৪] স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতাবশত দুই সন্তান-স্বামীকে হারানো ঝুমলার মায়ের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার থেকেও প্রকট হয়ে ওঠে রবিদার জন্য দুশ্চিন্তা। যে সংসার রবিদাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, তাঁর কাছে কৃতাজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ - তাঁরই প্রতি সহজাত কর্তব্যবোধে ঝুমলার মা বলেন, "রবিকে নিয়েই তো ভাবনা। ওর দিকে তাকিয়ে দেখেছিস কখনো? সবারটা করে যাচ্ছে একভাবে, আমি মা বসে বসে দেখি - ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে ছেলেটার - ...এই বয়সের একটা পুরুষমানুষ এরকম ভাবে থাকতে পারে কখনো? তারপর ওই বাচ্চাদুটো? ...কোথা থেকে বাইরের মেয়ে আসবে, সে কি কখনো ওদের তোর মতো ভালোবাসবে? আর তার সংসারে তুই কি পরিচয়ে থাকবি? আমিই বা থাকব কোন পরিচয়ে?"[১৫] অতএব, 'সবদিক রক্ষা' করতে ও যাতে সবাই 'খুশি থাকে শান্তিতে থাকে' তার জন্য নিদান আসে, "রবিকে বিয়ে করো তুমি।"[১৬] ঝুমলার মনে হতে থাকে, যেন হঠাৎ হাতুড়ি দিয়ে জোরে কেউ তাকে আঘাত করল। বস্তুত এসবের মধ্যেও ঝুমলার ভরসা ছিল রবিদা। গল্পে ঝুমলার প্রত্যাশা মতোই রবিদাও এই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। ঝুমলার মা ও মেজদির দেওয়া বিবাহের প্রস্তাব শুনে রবিদা বলেন, "ঝুমলাকে কোন বাচ্চা বয়স থেকে দেখছি আমি! ও আমাকে কি চোখে দেখে জান না তোমরা?"[১৭] পরিণতিতে পরিস্থিতি বিশেষে 'শালী'-কে বিবাহের শাস্ত্রীয় অকাট্য যুক্তির কাছে রবিদাকেও হার মানতে হয়। রবিদা সাময়িক স্বেচ্ছানির্বাসন এবং মনের সমস্ত দ্বন্দ্ব কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ঝুমলাকে বলেন, "ওদের মা হয়ে থাকতে কি সত্যি খুব আপত্তি করবে তুমি?"[১৮] এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ঝুমলার কাছে নেই। গল্প শেষ হয়। ঝুমলা জানায়, "সোজা হয়ে বসে তাকিয়ে আছি। আমার ঠিক পেছনেই সাদা দেওয়াল। আমি জানি।"[১৯] পরিণতি ব্যঞ্জনায় আভাসিত।

গল্পের নাম জয়া দিয়েছেন 'দ্রৌপদী'। অথচ গল্পের টেক্সট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে পৌরাণিক কাহিনি-অনুষঙ্গের বিন্দুমাত্র আভাস নেই। গল্পের কোনো

চরিত্রের নামও 'দ্রৌপদী' নয়; এমনকী দ্রৌপদী চরিত্র নির্মাণের যে মূল মোটিফ অর্থাৎ পঞ্চস্বামী অথবা বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গের প্রত্যক্ষ কোনো উল্লেখ নেই। তাহলে কেন এই উল্লিখন? তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে আমরা একটু সচেতনভাবে লক্ষ করলে দেখব গল্পে ঝুমলা চরিত্রটি তার অনিবার্য পরিণতির পথে যাত্রা করলেও কিছু প্রশ্ন রেখে যায়।

> *প্রথমত, ''কেন জন্মালাম মেয়ে হয়ে? আমার চিন্তা আমার বড়ো হবার ধরন আমার অনুভূতি কোনও কিছুরই কোনো মানে নেই? কেন এত জটিল হয়ে ওঠে সব কিছু? মেয়েদের সঙ্গের লোকটা যদি মরে যায়, যত কষ্টই হোক যত অসুবিধে হোক তার তো বিয়ের কথা ওঠে না আর?''*[২০]

> *দ্বিতীয়ত, ''শালী নাকি আমরা রবিদার? তো আগে কেন খেয়াল করায়নি সে কথা? আর 'শালী' যদি একটা সম্পর্কের নাম হয় তাতে কি খুশিমতো মানুষের চিন্তা ভাবনাকে পালটে ফেলা যায় নাকি?''*[২১]

> *তৃতীয়ত, ''আচ্ছা বলো, একটা মেয়ে কি একটা দড়ি নাকি যে তাকে দিয়ে সংসার বেঁধে রাখতে হবে?''*[২২]

ঝুমলার এই প্রশ্নগুলোয় মানসিক অনুভূতির সঙ্গে শারীরিক সংবেদন রয়েছে। যেমন গল্পের প্রথমেই আছে, ''শীলা রবিদার প্রায় পিঠের ওপর চড়ে গল্প শুনছে... পাঁচবছর আগে আমিও ঠিক ওরকম করতাম।''[২৩] আবার ঝুমলার হোস্টেলে যাওয়ার ভীতি প্রসঙ্গে রয়েছে, ''আমার চেয়ারের কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বর আছে কিনা তারপর খাটের ওপর বসে খুব আদর করে বললেন,...''[২৪] ইত্যাদি। রবিদার সঙ্গে ঝুমলার যে শারীরিক স্পর্শ এবং আদরের উল্লেখ গল্পে আছে সেটি সম্পূর্ণই স্নেহসম্বধীয়। দীর্ঘ সময়ের স্নেহ সম্বন্ধকে যৌনতার সম্বন্ধে পরিবর্তিত করার যে প্রয়াস এসেছে বাইরের থেকে, সেখানে এই প্রশ্নগুলো সহজাত।

এই প্রশ্নগুলিরই কোনও উত্তর ঝুমলা পায়নি। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নগুলো কি ঝুমলার একান্ত ব্যক্তিগত? কেবলই তার মা ও মেজদির কাছে? সমষ্টির 'সুখ' প্রত্যাশায় একজন মানুষের, বিশেষত ক্রমাগত মেয়েদের যৌন ইচ্ছে, তার মানসিক অনুভূতিকে অস্বীকার করে যখন প্রয়োজনমতো একটি প্রোটোটাইপে বেঁধে ফেলা হয়, তখন বোধহয় প্রশ্নগুলোও আর ব্যক্তিগত থাকে না। সমস্যাটা সমাজ-মানসিকতায়। তাই ঝুমলা প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে এখানে সমষ্টির কাছে প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করেছে। জয়া দেখিয়েছেন, এহেন আরোপিত যৌন সম্পর্কের রেফারেন্স খুঁজে পাওয়া যাবে সুদূর অতীতের এক মহাকাব্যেও। ঠিক যেভাবে পাণ্ডুবংশের হিতার্থে দ্রৌপদীর অনুভূতি, তাঁর যৌন ইচ্ছে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাবে প্রতিভা বসুর তোলা পরিপ্রশ্নের কথা। প্রতিভা লিখেছেন, ''দ্রৌপদী কি সত্যিই বস্তু? তার কি মন প্রাণ ব'লে কিছু নেই? তিনি কি মানবকন্যা নন? ইচ্ছে হোক না হোক, শ্রদ্ধা করুন বা না-ই করুন, ভালোবাসুন আর না-ই বাসুন, যে কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হ'তে পারেন তিনি? তাঁর মতামতের কি মূল্য নেই?''[২৫] এভাবেই শুধুমাত্র শিরোনামে 'allusion' (উল্লিখন)-এর মধ্য দিয়ে পাঠকের স্মরণশক্তির পরীক্ষা নিয়েছেন গল্পকার। তাই শিরোনাম কতকটা

'paradoxical'। যে জিজ্ঞাসা দিয়ে এই প্রবন্ধের শিরোনাম অর্থাৎ জয়া মিত্রের 'দ্রৌপদী' কি পৌরাণিক রূপকল্পের নবনির্মাণ? উত্তর দেওয়ার আগে কবি মনজুরে মওলার একটি উদ্ধৃতি আলোচক পূরবী বসুর লেখা থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরাণ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, ''পুরাণ ব্যবহার করার স্বাধীনতা যেমন সব শিল্পীরই আছে, পুরাণ থেকে সরে আসার অধিকারও তেমনি সব শিল্পীর আছে। পুরাণে বা ইতিহাসে যা আছে, তাকে ঠিক তেমনি করে তুলে ধরার দায় শিল্পীর নেই। সত্যি বলতে কি, পুরাণে বা ইতিহাসে যা আছে, তা ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করলে শিল্প রচনার কোনও মানে থাকে না, যদি না, যা আছে, তার কোনও বদল না করেও শিল্পী তার মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করতে পারেন, তাকে নতুন অর্থ দিতে পারেন, তাকে সমকালীন করে তুলতে পারেন। জীবনকে তিনি নিজের মতো করে যেভাবে দেখেন, সেভাবে তুলে ধরতে পারেন। উৎসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু বিশ্বস্ত থেকে তাকে নতুন করে তোলা সহজ নয়।''[২৬] জয়া মিত্র তাঁর গল্পে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে সেই আয়াসসাধ্য কাজটিই করেছেন। ফলত, নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে আখ্যানের ব্যঞ্জনায় গল্পের সূত্রে পুরাণের বিনির্মাণ ঘটেছে। বস্তুত, জয়া তাঁর গল্পে পৌরাণিক দ্রৌপদী রূপকল্পেরই নবনির্মাণ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে 'দ্রৌপদী' ভাবনার নানা অভিমুখ দেখা যায়। যেমন, পদ্মশ্রী লেখক ইয়ারলাগাড্ডা লক্ষ্মী প্রসাদ (Yarlagadda Lakshmi Prasad) খুব সম্প্রতি ২০১১ সালে তেলেগু ভাষায় 'দ্রৌপদী' নামের একটি উপন্যাস লিখেছেন। যেখানে তিনি তাঁর কল্পনায় দ্রৌপদীর যৌন আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ-অপছন্দ, এমনকী কর্ণের প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথাও বিধৃত করেছেন। চর্চিত এই বইটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেলেও ভারতীয় জনমানসে বইটি প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। অথচ মেয়েদের একাধিক স্বামীর প্রথার কথা পাওয়া যায় ভারতেরই উত্তরে খাম্পা জনগোষ্ঠীর মধ্যে।[২৭] দ্রৌপদী কেন্দ্রিক ভাবনার অভিনবত্ব পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যের অজস্র 'genre'-এ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য', বুদ্ধদেব বসুর 'দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর শাড়ি', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'যাজ্ঞসেনী', 'হোমাগ্নিসম্ভবা' এমনকী সাম্প্রতিককালের শাঁওলি মিত্রের নাটক 'নাথবতী অনাথবৎ'-এ দ্রৌপদী মোটিফের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার ঘটেছে। ছোটগল্পে পূর্ণেন্দু পত্রীর 'দ্রৌপদী', মাহবুব সাদিকের 'দ্রৌপদীর শাড়ি' এবং বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্রৌপদী' উল্লেখযোগ্য। বরেনের গল্পে পাঁচ বন্ধুর এক নারীকে কামনা দ্রৌপদীর ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। গল্পে তার উল্লেখও আচ্ছে। অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' বাংলা সাহিত্যে 'কাল্ট' হয়ে গিয়েছে! দোপদী মেঝেন শাসকের সামনে নিজেকে নগ্ন করে যে প্রতিবাদ সূচিত করেছে তা মহাভারতের দ্রৌপদীর প্রতি হওয়া অন্যায়কেই কার্যত সোচ্চার করে তুলেছে। এবং আরও লক্ষণীয়, মহাকাব্যের ন্যায় কোনও প্রিয়সখা পুরুষ তাকে আরক্ষা দেয়নি, নিজেকে নগ্ন করে যে বিপ্লব অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করে তুলেছে দোপদী মেজেন, তা প্রাতিস্বিকতায় ভাস্বর! নিম্নবর্গের শাসক-শাসিত সমীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নারীবাদের পাঠও তৈরি করে দেয় মহাশ্বেতার এই গল্প। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করে শাসক ও পুরুষের প্রতি একজন আদিবাসী মেয়ের শাণিত অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। যা সেই সময়ানুগ সমাজবাস্তবতারই বস্তুনিষ্ঠ অভিমুখ। মহাশ্বেতার এই 'কাল্ট' গল্পটিতে 'দ্রৌপদী' উল্লিখন অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু জয়ার অভিনবত্ব হল গল্পের প্রেক্ষাপট

নির্বাচনে। যেটি আদ্যন্ত নাগরিক। সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নাগরিক সম্প্রদায়ের পটভূমিকা থেকে 'দ্রৌপদী' মোটিফটি বিগত সময়ের আখ্যান হিসেবে চিহ্নিত শুধু নয়, তা সুদূরপরাহত। তথাকথিত সভ্য সমাজব্যবস্থায় পশ্চাদ্‌বর্তী জনজাতির মহিলার অবস্থান, বঞ্চনার উপাখ্যান আলোচিত। কিন্তু নাগরিক শিক্ষিত সমাজে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও সুবিধা বিবেচনায় দৃশ্যত 'ক্ষতিহীন' ব্যবস্থাপনায় আরোপিত যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত অনালোচিত শুধু নয়, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বসম্মত এবং অভাবিতও! অন্যান্য স্বল্প আলোচিত ও প্রায় অদৃষ্টপূর্ব উল্লিখিত সমস্ত ছোটগল্প, আলোচিত কাব্য কিংবা নাটকের থেকে জয়ার 'দ্রৌপদী' গল্পের বিশেষত্ব হল দ্রৌপদী প্রসঙ্গের অনুল্লেখ। এই বিশেষত্বের কারণেই গল্পটির ভাবনা-রূপকল্প বিনির্মাণের মাত্রা পেয়েছে; ঘটেছে নবরূপায়ণ। জয়া মিত্রের 'দ্রৌপদী' মনে পড়ায় শামসুর রহমানের 'পুরাণ' ('বিধ্বস্ত নিলীমা' কাব্যগ্রন্থ) কবিতাটির কথা -

"...বিধ্বস্ত ভাঁড়ার ঘরে অতীতের সারসত্য, সব
ভাবনাকে অনায়াসে খুঁটে খায় ইঁদুর, আরশোলা।
...
আমাকে জড়ায় সত্য, অর্ধসত্য কিংবা প্রবচন,
তবু জানি কিছুতে মজে না মন বাতিল পুরাণে।"

সুত্র নির্দেশ :

১. মিত্র, জয়া, নিবেদন, বইমেলা ২০১৮, গল্পসমগ্র, পুনশ্চ, কলকাতা : ৭০০০১০, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৮, নিবেদন অংশে পৃষ্ঠাসংখ্যা অনির্দেশিত।
২. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, 'এ স্বরে রাজনীতি আছে, নাটুকেপনা নেই', প্রবন্ধ, এইসময়, অক্টোবর ২৮, ২০১৮।
৩. তদেব।
৪. পঞ্চকন্যা হলেন সীতা, সাবিত্রী, অহল্যা, দ্রৌপদী, অরুন্ধতী। অন্যমতে এঁরা হলেন অহল্যা, কুন্তি, দ্রৌপদী, তারা ও মন্দোদরী।
৫. পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকন্যার জন্মের পর আকাশবাণী হয় যে, তাঁর দ্বারা কুরু বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। শৈশবেই মাতৃহীনা পাঞ্চালী অযোনিসম্ভূতা কন্যা।
৬. অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটরাজার বাড়িতে এই নামে রানি সুদেষ্ণার চুলবাঁধা ও অন্যান্য কাজের দায়িত্ব নেন।
৭. বসু, পূরবী, 'পুরাণের পঞ্চকন্যা : বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নবরূপায়ণ', প্রবন্ধ, কালি ও কলম, প্রকাশক : আবুল খায়ের, ঢাকা : ১২০৯, ২৮ জুন, ২০১২। https://www.kaliokalam.com/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%, তারিখ : ০৭. ০৬. ২০২৩, সময় : সকাল ১০. ০০।
৮. বসু, প্রতিভা, মহাভারতের মহারণ্যে, বিকল্প প্রকাশনী, ১ বিধান সরণি, তিনতলা, কলকাতা : ৭০০০০৪, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৪৮, পৃ. ৯৫-৯৬।
৯. দ্রৌপদী, জয়া মিত্র, গল্পসমগ্র, পুনশ্চ, কলকাতা : ৭০০০১০, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২৯।
১০. তদেব, পৃ. ৩০।

১১. তদেব।
১২. তদেব, পৃ. ৩১-৩২।
১৩. তদেব, পৃ. ৩২।
১৪. তদেব, পৃ. ৩৪।
১৫. তদেব, পৃ. ৩৪-৩৫।
১৬. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৭. তদেব, পৃ. ৩৬।
১৮. তদেব, পৃ. ৩৭।
১৯. তদেব।
২০. তদেব, পৃ. ৩৬।
২১. তদেব।
২২. তদেব, পৃ. ৩৭।
২৩. তদেব, পৃ. ২৯।
২৪. তদেব, পৃ. ৩১।
২৫. বসু, প্রতিভা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।
২৬. বসু, পূরবী, 'পৌরাণিক নারীর নবরূপায়ণ : সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে', প্রবন্ধ, অপার বাংলা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর, ২০১৯। https://aparbangla.net/prabandho-pouranik-narir-naborupayan/, তারিখ : ০৭. ০৬. ২০২৩, সময় : সকাল ১০. ০০।
২৭. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, কিন্নর দেশে, অনু. প্রসূন মিত্র, রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা : ১১০০, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪১।

নিজস্বী: একটি সাংস্কৃতিক নির্মাণ ও পরিবর্তনের চালিকাশক্তি

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক
সমাজতত্ত্ব বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

সমকালীন সমাজে 'নিজস্বী'(সেলফি) গ্রহণ ও জনক্ষেত্রে তার উপস্থাপনা এক বিশেষমাত্রায় ঘটছে। সনাতনী চিত্রগ্রহণ এর পরিবর্তে নিজস্বী অন্য এক বার্তা বহন করে। নিজস্বী যেমন সংস্কৃতির কোন এক পর্যায়ের প্রতীক তেমনি নিজস্বী সংস্কৃতির এক বিশেষ রূপের নির্মাণ ঘটায়। সাংস্কৃতিক প্রবাহমানতায় নিজস্বীর এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই গবেষণা পাত্রে আমি নিজস্বী কে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক নির্মাণ ও আবহের সৃষ্টি হচ্ছে তার অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। গৌণ সাহিত্যের সাহায্যে সমকালীন সমাজের একটি বিশেষ পর্যায়ে নিজস্বী নির্ভর উপস্থাপনা কি করে এক নতুনতর সমাজের দিশারী হয়ে উঠছে এই গবেষণাপত্র তারই অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা করবে।

সূচকশব্দ: নিজস্বী (সেলফি), সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, নিজস্বী ও ব্যক্তি পরিসর, জনক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত পরিসর।

ভূমিকা

সংস্কৃতির ধারণা সমকলীন সমাজে আমাদের প্রাত্যহিকতার এক অবিচ্ছেদ্য ভাষ্য। বৌদ্ধিক চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষত সমাজতাত্ত্বি ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনার পরিসরে সংস্কৃতি বিভিন্ন ধরন ও প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের একক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যদিও এই শব্দের অর্থ বিবিধ এবং সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যে অর্থে সংস্কৃতিকে ব্যবহার করা হয় তার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি শব্দের ব্যঞ্জনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। সমাজতাত্ত্বিক কথোপকথনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি বলতে আমরা কিছু সাধারণভাবে বিধিবদ্ধ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চিন্তনের উপায় অনুভূতি এবং ক্রিয়াশীলতার প্রকাশকে বুঝে থাকি। এই অনুভূতি বা ক্রিয়াকলাপ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই মূল্যবোধ, প্রথা, বিশ্বাস, কার্যক্রম, আমাদের সমাজের সব সদস্যকে বিষয়গতভাবে, একই সঙ্গে প্রতীকী অর্থে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অধীনে একতাবদ্ধ করে রাখতে সাহায্য করে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ব্যাক্তি সত্তার উন্মেষ এবং বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও সংস্কৃতি বা কালচার অন্যতম প্রধান একটি উপাদান। এই যে সংস্কৃতি আমরা উপলব্ধি করি এবং আত্মস্থ করি তা প্রজন্মান্তরে পরিবাহিত হয়। আমাদের সময় এবং কালের বৈশিষ্ট্য, পরম্পরা, প্রথা, বিশ্বাস, নীতি, মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস প্রযুক্তির ব্যবহার সবই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সময়ের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ যোগ্য। তাই কোন

সামাজিক ধারণা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গুলিকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে আমরা আবিষ্ট হয়ে আছি এই দৃষ্টি লব্ধ জগতই বাস্তব। সমকালীন সমাজে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগের যে গতিশীলতা এই দৃষ্টিলব্ধতার মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে, কদাচিৎ তা আমরা অন্যন্য মাধ্যমের সাহায্যে পেতে পারি। তাত্ত্বিক ভাষ্য কে মাথায় রেখে আমরা সমকালীন সময় ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক, সামাজিক পরিবেশকে 'আধুনিক', 'বিলম্বিত আধুনিক' এবং 'উত্তর আধুনিক' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করলেও একথা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারবো না যে গণমাধ্যম বা সমাজ মাধ্যমে প্রযুক্তির ধরন, প্রবাহমানতা, এবং উপস্থাপনার যে পরিবর্তন এসেছে তা আমাদের সংস্কৃতির সনাতনী ভিত্তি, ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের সম্মুখীন করে তুলছে। প্রযুক্তির বিকাশ, পরিবর্তন, পরিমার্জন, স্বাভাবিক, এবং ব্যক্তির ইচ্ছা নিরপেক্ষ। সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ আধুনিকতার উন্মেষ ও বিকাশের জন্য প্রযুক্তিকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। আবার অনেক সমাজতাত্ত্বিক প্রযুক্তির উন্নতিকে স্বাভাবিক ধরে নিলেও আমাদের চেতনা, কর্যপ্রক্রিয়া, পারস্পরিক সম্পর্ক, পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়াকে প্রশ্ন করেছেন। বিজ্ঞানের আবির্ভাব সমাজের আভ্যন্তরীণ চিন্তাভাবনার ফসল, না কি বহিরাগত শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত তা নিয়ে বিতর্ক আছে। সমাজ তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু পুরস্কারের ব্যবস্থা স্থির করে রাখে যার মাধ্যমে বিজ্ঞান 'স্বীকৃত' জ্ঞানের জন্ম দেয়। আমাদের সমাজস্থ প্রতিষ্ঠানের একগুচ্ছ নীতি ও আদেশ বিজ্ঞানকে একটি বিশেষ চরিত্র প্রদান করেছে। বিজ্ঞানীর ভাবনা, বৈজ্ঞানিক নীতি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তির প্রয়োগ লিঙ্গ, ধর্ম, জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে স্বীকৃতি লাভ করে না। বিজ্ঞান চর্চা সাধারণ মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে আবর্তিত হয়। বৈজ্ঞানিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি, বক্তব্য বা বৈজ্ঞানিক ভাবনার প্রয়োগের দিকটিকে শুধুমাত্র তুলে ধরা হয়। এ কারণে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে বা বিজ্ঞানের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সাধারণ মানুষের থাকে না এবং তা কখনোই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চর্চার ভর কেন্দ্রে জায়গা করে নিতে পারেনা (Merton, 1970: 35)। এই বৈজ্ঞানিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রযুক্তিগত প্রয়োগ। বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক ভাবনা যেমন সুনির্দিষ্টভাবে বৈজ্ঞানিক ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের পরিসর কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জনগণ অনেক বিষমরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সাধারণ। বৈজ্ঞানিক ভাবনার ফসল হিসেবে প্রযুক্তিকে আমরা সাধারণ মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করি। এই প্রযুক্তি ও তার ব্যবহার সমাজ সংস্কৃতি ভেদে ব্যক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রযুক্তির প্রভাব ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে। তবে একথা এখানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ নিজে থেকে অমানবিক হয়ে ওঠে না। কিন্তু মানুষ যখন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তখন প্রযুক্তির এক স্বাধীন সত্তা উন্মোচিত হয় যা অমানবিক (Ellul: 1964)। প্রযুক্তি বিকাশের মূল কারণ শুধুমাত্র বিভিন্ন দেশের মধ্যে সামরিক এবং অর্থনৈতিক বিরোধীতা নয়, বরং প্রযুক্তি নিজস্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন চরিত্র অর্জন করে। প্রযুক্তির এই স্বাধীন অস্তিত্ব

অর্থনৈতিক উপাদান নিরপেক্ষভাবে বিকশিত হয় এবং তার নিজস্ব নীতিকে বা সহজাত প্রবণতাকে কার্যকরী করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। প্রযুক্তির এই কৌশল যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তি ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে বিকশিত হয় তা ব্যক্তি মানুষের জন্য এক নতুন পরিবেশের জন্ম দেয়। এই প্রযুক্তিনির্ভর সামাজিক পরিবেশ শুধুমাত্র আমাদের সংস্কৃতিকেই পরিবর্তন করে না এই প্রযুক্তি নির্ভরতা পূর্বেকার স্বাভাবিক পরিবেশকেও নতুন রূপ দেয়।

'নিজস্বী' কি ও তার প্রাসঙ্গিকতা

নিজস্বীর সংজ্ঞায় তিনটি আন্তসম্পর্কিত উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমটি হল দৃশ্যায়নের উৎপাদন ও দৃশ্যায়নকে নিজে থেকে ধরে রাখার চেষ্টা, দ্বিতীয়ত, মানুষের মুখমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি গঠন করা এবং তৃতীয়ত অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজস্বীর সৃষ্টি করা। তৃতীয় উপাদানটির কারণে নিজস্বী অন্যান্য দৃশ্যায়ত শিল্প যেমন চিত্রগ্রহণের থেকে অনেক বেশি কৌতুহল উৎপন্ন করে। চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে ডিজিটাল গণমাধ্যমে এক বিশেষ ধরনের যোগাযোগের ফলে সামাজিক ক্রিয়াকে ধরে রাখা যায় এবং তার একটি প্রযোজ্য ক্ষেত্র নির্মিত হয়। কিন্তু নিজস্বী সমসাময়িক সংস্কৃতিতে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক বিশেষ যোগাযোগের সৃষ্টি করে। এখানে বলে রাখা ভালো যে সনাতনী চিত্রগ্রহণ এর মাধ্যমে নিজস্ব মুখচ্ছবি তুলে ধরার যে প্রচেষ্টা তার থেকে নিজস্বীর উদ্দেশ্য আলাদা। তার কারণ নিজস্বী অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক প্রকৃতির বা দৈনন্দিনতার নিগড়ে গ্রথিত থাকে। (Saltz: 2014)
সাধারণভাবে চিত্র গ্রহন করার ক্ষেত্রে এতদিন যা অনুসরণ করা হতো তা হল যে বাস্তবকে আমরা আমাদের সামনে পর্যবেক্ষণ করতে পারছি সেই বাস্তবের কিছু অংশকেই চিত্রগ্রাহক 'তার ছবি' হিসেবে ক্যামেরায় বন্দী করে রাখতেন। চিত্রগ্রাহকের সামনে উপস্থিত বাস্তব এখন অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে চিত্রগ্রাহকের পেছনে দ্বিতীয় অস্তিত্বের স্তর হিসেবে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে; মুখ্য হয়ে উঠছেন যিনি চিত্রগ্রাহক তিনি নিজে। এটাই নিজস্বির বৈশিষ্ট্য। নিজস্বীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লক্ষ্য ও প্রেক্ষিতটাই পরিবর্তিত হচ্ছে তা নয় একইসঙ্গে প্রতিচ্ছবির পরিমাণগত ও গুণগত মানের ও পরিবর্তন হচ্ছে। নিজস্বীর ক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত সর্বশ্রেষ্ঠ ছবিটি রেখে অন্যগুলিকে বাতিল করা হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে নিজস্বী সংগ্রহ করার সময় ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার বোধ অনুভূত হয় কারণ যেহেতু সব নিজস্বী গ্রাহক চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে পারদর্শী নন অথবা প্রযুক্তিগতভাবে নিজস্বী তোলার কৌশল সবাই একইভাবে রপ্ত করতে পারে না। শুধু তাই নয় নিজস্বী গ্রাহকের অনেক সময়ে এক ধরনের স্নায়বিক বৈকল্যেরও সূচনা হয়। কারণ তিনি মনে করেন যে ইন্টারনেটের জগতে তিনি হয়তো তার এই নিজস্বী গ্রহণ করার অদক্ষতার কারণে উপহাসের শিকারও হতে পারেন তাই অনেকে এই ধরনের মানসিক বা স্নায়বিক সমস্যাটিকে 'সেলফিটিস' বলে চিহ্নিত করেছেন। (Nair:2015)

সময়কালীন সময়ে 'সেলফি' শব্দটি নিয়ে অক্সফোর্ড ডিক্শনারি জানায় যে এটি হচ্ছে ২০১৩ সালের সব থেকে বেশি বার উচ্চারিত হওয়া শব্দ। যদিও সেলফি শব্দটি

প্রথম অস্ট্রেলিয়া তে একটি অনলাইন স্বম্মেলনে প্রথমবার ব্যবহার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষায় কথা বলা মানুষের ব্যবহৃত সমাজমাধ্যমে এই শব্দটি বহুলভাবে প্রচারিত হতে শুরু করে। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নিজস্বী-সংস্কৃতিকে কি ঐতিহ্যবাহী চিত্রগ্রহণের ধারাবাহিক কোন শিল্প বলা চলে? না কি নিজস্বী বর্তমানে একটি সাংস্কৃতিক প্রবণতামাত্র?

Paraika (2017) এর মতে বিধিবদ্ধস্তরে সত্ত্বা বা আত্মর চিত্রের মূর্তি-নির্মাণ সহজে গঠন করা সম্ভব নয় এবং তা একই সঙ্গে অকার্যকর, অপাঠ্য ও বদ্ধ। কারণ একজন সাধারন মানুষের মুখচ্ছবি সর্বদা কখনোই অনুকরণযোগ্য বা নায়কোচিত বিষয় নয় অর্থাৎ তার মধ্যে থেকে কোন সাধারণ অর্থ চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না তাই এগুলি নান্দনিক দৃষ্টি থেকে কোন 'অর্থ' বহন করে না বা এর মধ্যে থেকে কোন ভাষ্য এবং বক্তব্য সবসময় প্রতিফলিত হয় না।

নিজস্বীর প্রচার ও প্রসার 'জনক্ষেত্রের' মাধ্যমে সংঘটিত হয়। সমাজতাত্ত্বিকভাবে জনক্ষেত্র হল বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কের একটি জায়গা, অন্যদিকে 'ব্যক্তিগত পরিসর' বলতে বোঝায় ব্যক্তির নিজস্ব এবং অপরিহার্য একটি ক্ষেত্র। নিজস্বীর দর্শক কোন একটি ক্ষেত্র ও বস্তুর পরিসরে অবস্থিত থাকেন এবং চিত্রগ্রাহক সেক্ষেত্রে 'অন্য' বা 'other' হিসেবে পরিচিত হন। এছাড়াও তৃতীয় একটি ক্ষেত্র সমাজতান্ত্রিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ তা হল জনক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত পরিসরের সংযোগস্থল। এ কারণে স্ব-প্রতিচ্ছবির ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পী ও তার দর্শকের মধ্যে একটি ভাগ করে নেওয়া ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রটি প্রকৃত চিত্রগ্রাহক ও তার দর্শকের মধ্যেকার বাস্তব ক্ষেত্র এবং তার মিলনের সংযোগের পরিসর বিশ্লেষণের প্রারম্ভিক শর্ত হিসেবে গৃহীত হয়। অর্থাৎ স্বত্ত্বা সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যাক্তি কিভাবে নিজেকে দেখছেন এবং তার পাশাপাশি একজন কল্পিত দর্শক ও দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিত্রগ্রাহকের মূল্যায়ন এই তিনটি ক্ষেত্র সমাজতাত্ত্বিক ভাষ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এক কথায় দর্শক এখানে একজন পৃথক জ্ঞানতাত্ত্বিক নিযুক্তক যিনি তার সঙ্গে চিত্রগ্রাহকের সম্পর্কের প্রাথমিক শর্তের বৈধতা প্রদানকারী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হন। এই তিনটি ক্ষেত্র একটি চিত্রের মধ্যে থেকে উঠে আসে-সাধারণভাবে চিত্রটি, দর্শকের চোখে চিত্রটি, এবং বস্তু এবং বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও তার সংযোগক্ষেত্র— একটি বার্তা বহন করে।

নিজস্বী গ্রহণ করা থেকে শুরু করে দর্শকের দৃষ্টিতে মূল্যায়িত হওয়া পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান এবং ওপরে আলোচিত ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে পার্থক্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু একটি বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল জনক্ষেত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সংযোগের মধ্যে নিজস্বীর ক্ষেত্রে কোন ব্যবধান নেই, অথচ নিজস্বী যখন জনক্ষেত্রে কাল্পনিক ব্যক্তিদের উপলব্ধির জন্য উপস্থাপিত হয় তখনই একমাত্র সাধারন জনগণ নিজস্বী গ্রাহকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। এই কারণে নিজস্বী, দর্শকের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও জনক্ষেত্রের মধ্যে একটি সাধারন পরিসর, একটি পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সনাতনী চিত্রগ্রহণ একধরনের সময়ের অন্তর তৈরি করে এবং এই ব্যবধান অন্য আরেক ধরনের সামাজিকতার জন্ম দেয়।

নিজস্বী একটি সাংস্কৃতিক গঠন: ব্যক্তিগত ও জনক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য ও ভাঙ্গনের সূচক

নিজস্বী গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যিনি নিজেই চিত্রটির বিষয় তিনি একটি দৃশ্যায়ত উৎপাদন প্রক্রিয়া সংগঠিত করেন একটি হাতে ধরা ডিজিটাল যন্ত্রের সাহায্যে। নিজস্বী অবশ্যই চিত্রগ্রহণের একটি পদ্ধতি যদিও সব চিত্র নিজস্বী নয়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে মুখচ্ছবির চিত্রগ্রহণের সাহায্যে কোন এক বিশেষ অভিব্যক্তি ধরে রাখার মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা নিজস্বী গ্রাহক করে থাকেন। Smith (2010) মনে করেন Goffman (1957) জনক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনায় চিত্রগ্রহণের মাধ্যমে দৃশ্যায়ত মিথস্ক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। Goffman, মুখমণ্ডলের ব্যবহার কে আক্ষরিক অর্থে এবং রূপকের মাধ্যমে যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে দেখিয়েছিলেন। মুখাবয়ব, Goffman-এর মতে শুধুমাত্র চাহনি ভঙ্গিমা বা অবস্থানকে চিহ্নিত করে না। বরং নিজস্বীর মধ্যে নিজস্বী গ্রাহকের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। ব্যক্তির মুখ একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তার অবস্থান এবং যৌথভাবে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মনির্মাণ প্রক্রিয়াকেও তুলে ধরে। Goffman (1959) মনে করেন মুখমণ্ডলের মাধ্যমে ব্যক্তি একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে এক বিশেষ অভিব্যক্তিকে বোঝাতে চান। অর্থাৎ ব্যক্তি তার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে মৌখিক প্রকৃতিকে একটি বিকল্প হিসেবে অন্যদের কাছে কোন বিশেষ বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। এই বার্তাও প্রতীকী। দ্বিতীয়ত, মৌখিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে নিজস্বী, গ্রাহকের প্রতীকী উদ্দেশ্যকে বুঝতে সাহায্য করে এবং পাশাপাশি এই প্রত্যাশাও থাকে যে কারকের ক্রিয়ার যুক্তি অন্যান্য দর্শকের কাছেও একই ধরনের বার্তা বহন করে নিয়ে যাবে। দুটি ক্ষেত্রে মৌখিক অভিব্যক্তি অন্যান্যদের ধারণা, মূল্যায়ন ও নির্ণয় করার চেষ্টা করে যে অভিব্যক্তি কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতির সংজ্ঞার সঙ্গে সমন্বিত বা মানানসই। গ্রাহক এবং দর্শক দুজনেই একসঙ্গে একটি পরিস্থিতির সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করেন এবং দুই দল যে পরিস্থিতির সংজ্ঞা দানে ঐক্যমত হন সবসময় তা কিন্তু ঘটে না। তবে ওই বিশেষ মুহূর্তে পরিস্থিতির সংজ্ঞা দান করতে গিয়ে কোন বিষয় গুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে তা কারক বা নিজস্বী-গ্রাহক এবং তার দর্শকরা উভয়ই স্থির করেন। পাশাপাশি Frosh (2015) দেখিয়েছেন নিজস্বী স্বতঃস্ফূর্ত ও নৈমিত্তিক হলেও এই নিজস্বী গ্রহণ করার পেছনে গ্রাহকের যথেষ্ট কুশলতা, ইচ্ছাকৃত কাঠামো নির্মাণ ও সাংস্কৃতিকভাবে মূর্ত ব্যবহার সংগঠিত হয়।

নিজস্বীর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিষয় জনক্ষেত্রের সামনে চলে আসে যার ফলে নিজস্বী গ্রাহকের ব্যক্তিগত জীবনের সুরক্ষা ও অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায় এবং জনক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করে (Goffman:1979)। নিজস্বী সাধারণভাবে গ্রাহকের নিজের গ্রহণ করা চিত্র এবং তার সম্মতি মূলক প্রচলন। একটি নতুনতর যোগাযোগের ধারা হিসেবে নিজস্বী যেমন একদিকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করে অন্যদিকে লিঙ্গায়ত অভিব্যক্তি, দৈহিক প্রদর্শনের উদ্দেশ্যও গৃহীত হয়। গণমাধ্যমে প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে নিজস্বী উৎপাদন ও ভোগ এই দুই প্রক্রিয়ায় এক বৃহত্তর অনিশ্চয়তাকে তুলে ধরে। এই অনিশ্চয়তা একটি নতুন স্তরের যোগাযোগের ফলাফল হিসাবে বর্তমান সমাজে এবং সংস্কৃতির আঙিনায় গৃহীত হচ্ছে। তার একটি বড় কারণ হলো নিজস্বী জনক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যেকার সনাতনী বিভাজনকে চ্যালেঞ্জ করে। এই জনক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে পার্থক্য কোন সাধারন বিষয় নয়। এই বিভাজন যা কিছু লুক্কায়িত বনাম যা কিছু প্রকাশযোগ্য

এবং একই সঙ্গে ব্যক্তি বনাম সম্প্রদায়ের বিভাজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বিভাজন একইসঙ্গে ছিদ্রযুক্ত এবং অস্পষ্ট। কিন্তু তবুও জনক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এই বিভাজন ব্যক্তিগত স্ব অভিব্যক্তি ও অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্রকে বৃহত্তর রাজনীতির জগত এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকার প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। নিজস্বী এই প্রেক্ষাপটে স্বঅভিব্যক্তির একটি উপায়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী ধরে ব্যক্তিগত ও জনক্ষেত্রের মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট থাকলেও সমকালীন সময়ে এই বিভাজন ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং সে ক্ষেত্রে নিজস্বী যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এক বিশেষ ধরনের দৃশ্যায়িত অভিব্যক্তি হিসেবে নিজস্বী সত্তার আদর্শ প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে যোগাযোগের স্পৃহার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোন ব্যক্তির স্থানিক অবস্থান যাই হোক না কেন অন্যদের সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছার জন্য জনক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে বিভাজন তার কাছে কম তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত জীবনকে জনক্ষেত্র থেকে পৃথক করে রাখার প্রচেষ্টার পরিবর্তে জনক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ফলে ব্যক্তিগত ও জনক্ষেত্রের মধ্যেকার বিভাজন ও অস্পষ্টতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজস্বীর মাধ্যমে কোন বার্তা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সনাতনী ভাবনাগুলো যেমন পরবর্তীত হচ্ছে, তেমন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেও এই বার্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একটি দৃশ্যের উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে কেবলমাত্র সম্পৃক্ত না থেকে নিজস্বী বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে অবস্থান করছে। নিজস্বীর মাধ্যমে গোপনীয়তার মিথস্ক্রিয়াগত প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নিজেকে উপস্থাপন করার তাৎপর্য কি তা বুঝতে হলে নিজস্বীকে বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে আলোচনা করতে হবে।

উপসংহার

তথ্য এবং যোগাযোগের প্রযুক্তির ধারাবাহিক উন্নতি এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থার প্রয়োগ আমাদের প্রাত্যহিকতার কাঠামোর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছে। নূতন ধরনের প্রযুক্তির উন্মেষ, বিকাশ ও প্রয়োগ পদ্ধতি গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে ভাষা, প্রতিচ্ছবি, বক্তব্য এবং ব্যবহারকে এই প্রযুক্তিনির্ভর সমাজের আঙ্গিকে এক ধরনের সমন্বয় সাধনের কাজ করেছে। প্রযুক্তি নির্ভর যৌক্তিকতা, এবং বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ আত্মীকরণ, সমকালীন সময়ে ব্যক্তি মানুষের চিন্তা, চেতনা, কার্য প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রযুক্তির এই আপাত অদৃশ্য দমন বর্তমানে সংস্কৃতি ও সভ্যতার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মৌলিক বিচার্য বিষয়। ব্যক্তিমানুষের মিথস্ক্রিয়াগত বিন্যাসের পরিবর্তন, ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, মুখোমুখি সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান অনুপস্থিতি, লিঙ্গ, শ্রেণী, বয়স ভেদে সামাজিক মাধ্যমের বহুল এবং বিবিধ ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রযুক্তির ব্যবহারকে প্রায় একরকম বাধ্যতামূলক করে তুলেছে। ব্যক্তি মানুষ তার সামাজিক অবস্থানকে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে মূল্যায়নে আগ্রহী হয়ে উঠছে। সাধারণ, পৌনঃপুনিক, পার্থিব, দৈনন্দিন কার্যক্রম এখন আর মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। 'আমি' মুখ্য; 'আমি'

আলোচ্য; 'আমি' দৃশ্যমান; এই দর্শন সামাজিক যুথবদ্ধতার যে সাংস্কৃতিক ভিত্তি তার রুপান্তরনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 'নিজস্বী' গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় নিজস্বী-গ্রাহক অভূতপূর্ব ঝুঁকি নিচ্ছেন। রেলপথ, দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশ, এমনকি অস্বাভাবিক বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে স্থাপন করে বিশেষত যুবসম্প্রদায় প্রচলিত নীতি, মূল্যবোধ, সযত্নে রক্ষিত বিশ্বাসকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এই ঘটনার অভিঘাত সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে সুদূরপ্রসারী প্রভাব আনছে। প্রযুক্তির প্রতি মোহগ্রস্থতা, জীবনের একাকীত্ব, মুখোমুখি সম্পর্কের অবনতি ব্যক্তি মানুষকে ক্রমশ সমষ্টি কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে চিত্রগ্রহণের বিষয়বস্তু অন্য ব্যক্তি, জীবজগৎ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, চলমান গতিময় জীবনের স্পন্দন, চিত্রগ্রাহকের গৃহীত চিত্রের আর বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচিত হচ্ছে না। পরিবর্তে, নিজস্বী এখন যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়ার এক অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। সে কারণেই প্রযুক্তি নির্ভরতা এমন এক 'একমাত্রিকতার' জন্ম দিচ্ছে যেখানে মানুষের তৈরি প্রযুক্তি মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে নিজেই নিয়ন্ত্রক এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

Ellul, Jacques, The Technological Society: A Dialogue, Vintage Books (translator, John Wilkinson), New York (1964)

Frosh, Paul, The Gestural Image: The Selfie, Photography theory Kinesthetic Sociability, International Journal of Communication, (2015), 9, 1607-1628.

Goffman, Erving, Gender Advertisements, Harper and Row, New York, (1979)

Merton, Robert King, 'Science Technology and Society in Seventeenth Century England', Columbia University Press, New York City, (1970), pp-35

Nair, Meghna, 'Selfitis: An Obsessive Compulsive Disorder of Taking Too Many Selfies' in Newsgram, 29, June (2015), (www.newsgram.com)

Paraika, Ana, Culture of the Selfie: Self Representation in Contemporary Visual Culture, Institute of Network Cultures, New York, (2017)

Saltz, Jerry, Art at Arm's Length: A History of the Selfie, Vulture, 26 January (2014), (www.vulture.com)

Smith, Greg, Reconsidering Gender Advertisements: Performativity, Framing and Display in Michael Jacobsen (ed), The Contemporary Goffman (pp. 165-184), Routledge, New York, (2010)

সংস্কৃতি ও সিনেমা- একটি লিঙ্গ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ঈপ্সিতা অধিকারী
গবেষক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

মানব সমাজের আলোচনায় অপরিহার্য বিষয় হিসেবে সংস্কৃতির আলোচনা করা হয়ে থাকে। সংস্কৃতি ও সমাজ সহগামী। যে কোন সমাজের সংস্কৃতির অধ্যয়ন ছাড়া সেই সমাজের কোন বিষয় নিয়েই সম্যক আলোচনা সম্ভব নয় । মানব সংস্কৃতি ও সিনেমা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত । সংস্কৃতি যেরকম সিনেমাকে সৃষ্টি করে থাকে ঠিক সেরকমভাবেই সিনেমাও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ যেভাবে সিনেমাকে দেখে থাকে এবং অন্যদিকে একটি সিনেমা যেভাবে নির্মাণ করা হয়ে থাকে তার সবটাই নির্ভর করে থাকে সেই সমাজের মুল কাঠামোর উপর। আলোচ্য ক্ষেত্রে এই কাঠামোটি হল পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো । পিতৃতন্ত্র এমন একটি বিষয় যাকে আমরা সাধারনভাবে দেখতে পাই না। বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে এর উপস্থিতি আমরা টের পেয়ে থাকি। বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সিনেমা একটি অন্যতম মাধ্যম। সংস্কৃতির সংগঠনে সিনেমা বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিচালক বিভিন্ন বিষয়কে সিনেমার মাধ্যমে পর্দায় তুলে ধরেছেন। এই ক্ষেত্রে বলা যায় যে ধরনের বিষয়কেই পর্দায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হোক না কেন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তা কখনই পিতৃতন্ত্রের প্রাচীরের বাইরে অবস্থান করবে বলে আশা করা যায় না। সিনেমার বিবর্তন ঘটলেও তার চিত্রায়নের রুপের কতখানি পরিবর্তন হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে প্রান্তিক লিঙ্গের ধারনার ক্ষেত্রে । নারীর উপস্থাপনা নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা করা হলেও , তৃতীয় লিঙ্গ বা রুপান্তরকামী নারী পুরুষের মানসিকতা ও সমস্যা বোঝার এবং তারপর তাকে সিনেমার পর্দায় চিত্রিত করার মাঝে আজও পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে । এই নিবন্ধে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা 'নগরকীর্তন' -এর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে সমকামী সম্পর্কের উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও কিভাবে পিতৃতান্ত্রিকতার নিয়মে বিসমকামী লিঙ্গ রাজনীতি প্রাধান্য বিস্তার করছে ।

সুচকশব্দ- সংস্কৃতি , সিনেমা, লিঙ্গ রাজনীতি

ভূমিকা

মানবসমাজের আলোচনায় অপরিহার্য বিষয় হিসেবে সংস্কৃতির আলোচনা করা হয়ে থাকে। সংস্কৃতি ও সমাজ সহগামী। যে কোন সমাজের সংস্কৃতির অধ্যয়ন ছাড়া সেই সমাজের কোন বিষয় নিয়েই সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়।সমাজবদ্ধ মানুষের বিশেষ

পরিচয় সংস্কৃতি। সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল যুগের এবং সকল স্থানের মানব সমাজেরই স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন সামাজিক নিয়ম এবং প্রযুক্তির সংমিশ্রন যার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগত , ভাষাগত বৈচিত্র্য সংযুক্ত। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন উপসংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম হল বঙ্গসংস্কৃতি বা বাংলার সংস্কৃতি। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির বা বঙ্গ সংস্কৃতির এক প্রকার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য বর্তমান, যেমন - সাহিত্য সঙ্গীত এবং নাট্য সাহিত্য (বাংলা কবিতা, পুরান সাহিত্য) । সুজিত কুমার মণ্ডল তাঁর লেখায় বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন ঘরানা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘরানায় প্রমুখ বিখ্যাত কিছু আন্দোলনের সুচনা হয় এই পশ্চিমবঙ্গে। বঙ্গ সংস্কৃতির আলোচনায় মুল প্রাধান্য পায় বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' আর এই পার্বণের সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে দুর্গাপুজা। দুর্গাপুজার কথা বললে বাঙালির খাবারের আলোচনার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী কলাপাতায় খাবার পরিবেশনের কথা বহু গবেষক এবং লেখক তাদের আলোচনায় তুলে ধরেছেন। বাঙালির প্রধান পোশাক হিসেবে শাড়ির উপস্থাপনা শুধুমাত্র বঙ্গ সংস্কৃতি নয় , এর পাশাপাশী সমস্ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে থাকে। এখানে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী আট পউরে শাড়ি পড়ার ধরনও বহুলভাবে আলোচিত । গবেষক সুজিত কুমার মণ্ডল বাংলার শিল্প সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় , মৃণাল সেন , ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ কিংবদন্তি শিল্পী থেকে ঋতুপর্ণ ঘোষ , অপর্ণা সেনের মতো পরিচালকের প্রসঙ্গ এনেছেন।[১]

মৈনাক বিশ্বাস তাঁর অপ্রকাশিত গবেষণামূলক কাজের মাধ্যমে Realism (বাস্তববাদ) এবং Melodrama (নাটকীয় অভিনয়) -এর মধ্যে একপ্রকার প্রচলিত বিপরীতের কথা বলেছেন। তিনি ১৯৪০ -১৯৫৫ -এর সময়কার বেশ কিছু সিনেমার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে Historical Realism বা 'ঐতিহাসিকবাস্তববাদের' -এর কথা বলেছেন যার মধ্যে নিমাই ঘোষ পরিচালিত ছিন্নমূল (The Uprooted) সিনেমাটিও সংযুক্ত। ১৯৫০ -১৯৬০ -এর ঘরানায় বাংলা সিনেমায় একপ্রকার Periodization বা পর্যায়ক্রমিক বিভক্তিকরণলক্ষ্য করা যায়। এই বিভক্তিকরণ -এর ঘরানাকে বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগ বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই ঘরানাতেই সত্যজিৎ রায় , মৃণাল সেন ঋত্বিক ঘটকের মতো কালজয়ী পরিচালকদের অনবদ্য অবদানের সাক্ষী থেকেছে বাংলা সিনেমা। এই ঘরানাতেই সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে পথের পাঁচালীর মতো জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমা বাংলা চলচিত্র জগতে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।[২]

মানব সংস্কৃতি এবং সিনেমা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। সংস্কৃতি যেভাবে সিনেমাকে সৃষ্টি করে, ঠিক সেরকম ভাবেই সিনেমাও সংস্কৃতির উপর বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মানব সংস্কৃতি কোন স্থিতিশীল একটি বিষয় নয়। সংস্কৃতির ধারা প্রবাহমান একটি বিষয় । কতকগুলি বিশেষ বাহক এই সংস্কৃতির প্রবাহকে অব্যাহত রাখে। সংস্কৃতি ও সমাজ সহগামী । Jonas Do Nascimento -এর মতানুসারে, সমাজকে বোঝার জন্য সিনেমাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারনত ধরে নেওয়া হয় যে সমস্ত বিষয় যেহেতু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে কাজ করে থাকে, সেহেতু চলচ্চিত্র আমাদের সামাজিক দিকগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে।

চলচ্চিত্র-এর Visual Power এবং বর্ণনার দক্ষতার দ্বারা অচেতন উপায়ে আমাদের প্রত্যাশাগুলিকে রুপ দিতে সক্ষম হয়।সিনেমায় সামাজিক জীবনকে আমাদের কাছে খুব সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে যেখানে ব্যক্তিরা নির্ধারিত ভুমিকা গ্রহন করে থাকে যা তাদের কাছে কখনও সন্তোষজনক বা অসন্তোষজনক হয়ে থাকে। এখানে কিছু প্রতিকৃতি বিছিন্নতা ও হতাশাজনক এবং সেই সাথে বিভিন্ন উপায়ের একটি ক্রমবিন্যাস সংগঠিত হয়ে থাকে যেখানে ব্যাক্তিরা তাদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকে। এই অর্থে একটি চলচ্চিত্রকে দেখা আমাদের কাছে সমাজতাত্ত্বিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হয়ে ওঠে কারন এই চলচ্চিত্র দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের মানসিকভাবে এবং শিক্ষাগতভাবে প্রভাবিত করে থাকে।[৩] লেখকের এই কথার উৎস টেনে বলা যেতে পারে যে, সমাজে বসবাসকারী মানুষ যে ভাবে সিনেমাকে দেখে বা বোঝে এবং অপরদিকে একটি সিনেমা যেই ভাবে নির্মিত হয়ে থাকে তার সবটাই নির্ভর করে থাকে সেই সমাজের মূল কাঠামোর উপর। উক্ত আলোচ্য ক্ষেত্রে এই মূল কাঠামোটি হল পিতৃতান্ত্রিকতার কাঠামো।

লিঙ্গগত অসাম্যতা এবং লিঙ্গগত ভূমিকা ছাড়া পিতৃতন্ত্রের আলোচনা করা সম্ভব নয়। সমাজতাত্ত্বিক Sylvia Walbi তাঁর লেখা " Theorizing Patriarchy" গ্রন্থে পিতৃতন্ত্র নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন পিতৃতন্ত্রের ধারনার বিভিন্ন পর্যায় থেকে স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। সমাজ কাঠামোর মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার Biological Determinism -এর (জৈবিক নিয়তিবাদ) তত্ত্বকে না মেনে করা হয়ে থাকে, যেখানে প্রত্যেক পুরুষ একটি ক্ষমতাশালী পর্যায় অবস্থান করেন এবং নারী সবসময়ই নিপীড়িত হয়ে থাকে। তিনি তাঁর আলোচনায় পিতৃতন্ত্রকে ৬টি কাঠামোর মধ্যে থেকে দেখেছেন। এই ৬ টি কাঠামোর মধ্যে তিনি পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে , পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি এমন একটি কাঠামো যা বিভিন্ন ধরনের পিতৃতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।[৪] এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পিতৃতন্ত্র এমন একটি বিষয় যাকে আমরা সাধারন ভাবে দেখতে পাই না। বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে এর উপস্থিতি আমরা টের পেয়ে থাকি। বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সিনেমা একটি অন্যতম মাধ্যম। সংস্কৃতির সংগঠনে সিনেমা বিভিন্ন বিষয় প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিচালক সিনেমার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়, যেমন পরিবার, প্রেম, ধর্ম ইত্যাদিকে, পর্দায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তবে যে ধরনের বিষয়ের উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হোক না কেন, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তা কখনই পিতৃতন্ত্রের কালো ছায়ার বাইরে অবস্থান করবে বলে আশা করা যায় না। মধুজা মুখার্জি ও কৌস্তভ বক্সী তাদের গবেষণামুলক আলোচনা - 'A Brief Introduction To Popular Cinema In Bengali : Genre , Stardom And Public Culture - তে বাংলা সিনেমার প্রবাহমান বিবর্তনের ধারাকে তুলে ধরেছেন।[৫] ১৯৩০ -এর পূর্ববর্তী সময়ে ভদ্রলোক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে Big Studios -এর স্থাপনার মধ্যে দিয়ে একপ্রকার Respective Cinematic ঘরানার আবির্ভাব ঘটে বলে তারা বলেন। তবে এ কথাও মেনে নেওয়া প্রয়োজন যে সিনেমার শ্রেণীকরণ রয়েছে। সব ধরনের সিনেমার দর্শক এক রকম হয় না বা হলেও সেখানে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

সিনেমা সাধারনত দুই ধরনের - প্রথম হল সেই ধরনের সিনেমা যা সাধারণত সবার জন্য অর্থাৎ সব ধরনের দর্শকের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়ে থাকে ,অন্যদিকে সেই ধরনের সিনেমা যা সব দর্শকদের জন্য নয়, যে সমস্ত সিনেমা কোন সামাজিক বিষয় বা এমন কিছু বিষয়কে পর্দায় তুলে আনা হয় যার মধ্যে দিয়ে সমাজে কিছু বিশেষ বার্তা প্রদান করার প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে। সিনেমার বিবর্তন ঘটলেও, তার চিত্রায়নের রূপের কত খানি পরিবর্তন হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে প্রান্তিক লিঙ্গের ধারণার ক্ষেত্রে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারীদের অধিকার নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন চলতে থাকে যতক্ষণ না তারা ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার, সম্পত্তির মালিকানার অধিকার, নিজেদের স্বামীকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার এবং পরিশেষে তারা যদি চায় পড়াশোনা এবং বাড়ির বাইরে কাজ করার অধিকার পায়।[৬] বিংশ শতাব্দীর নারীরা আর আগের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন , শিশুসুলভ ব্যবহার এবং দুর্বল হিসেবে বিবেচিত করা হত না। একবিংশ শতাব্দীতে নারীর জগৎ আরও উজ্জ্বল তবে লিঙ্গ ও যৌনতার ক্ষেত্রে খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি । নারী শরীর এখনও কল্পনার জগতে লিঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করে এবং যৌন কার্যকলাপের প্রতীক পুরুষালী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। নারীত্ব ও পুরুষত্বের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং এর প্রতীকী উপস্থাপনা বহির্জগতের যৌনায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে বর্তমান সময়ে।[৭] নারীর উপস্থাপনা নিয়ে খানিক ভাবনা চিন্তা করা হলেও, তৃতীয় লিঙ্গ বা রূপান্তরকামী নারী পুরুষের মানসিকতা ও সমস্যা বোঝার এবং তারপর তাকে সিনেমার পর্দায় সঠিকভাবে চিত্রিত করার মাঝে আজও পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রস্তাবিত আলোচনায় নারীবাদী তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে। সাধারণত সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিটি ক্ষেত্রকেই প্রাধান্যকারী ঘরানার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখা হয়ে থাকে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে বেশির ভাগ গবেষণায় সমকামী সম্পর্ককেও এক প্রকার আধিপত্য - অধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হয়ে থাকে। এই অবস্থান থেকে সরে আসার জন্যই এখানে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করা হয়েছে। এই নিবন্ধে নারীবাদী দৃষ্টিকোন থেকে জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা 'নগরকীর্তন' -এর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করা হবে যে কিভাবে একজন রুপান্তরকামী নারীর (যে শরীরের দিক থেকে পুরুষ হলেও মনে প্রানে একজন নারী) জীবন প্রবাহিত হতে থাকে। পরিচালকের দৃষ্টিকোন অনুযায়ী সিনেমার দুই মুখ্য চরিত্র, পুঁটি ও মধু -র সম্পর্ককে সমকামিতা হিসেবে মনে করা হলেও, সেই সমকামী সম্পর্কের চিত্রায়ন পরিচালক করেছেন সম্পূর্ণভাবে পিতৃতান্ত্রিক বিসমকামি আঙ্গিকে। এই অবস্থানে প্রশ্ন ওঠে যে কোথাও পর্দায় সমকামী সম্পর্কের উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও কি পিতৃতান্ত্রিকতার নিয়মে সেই বিসমকামি সম্পর্কের লিঙ্গ রাজনীতিই প্রাধান্য বিস্তার করছে না? সমকামী সম্পর্ক গুলোকে কি একরকম ভাবে সেই বেঁধে দেওয়া সমাজের ক্ষমতার নিয়মের মধ্যেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে না?

একটি জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত স্রবন্তি বন্দ্যোপাধ্যায় -এর কলমে[৮] বলা হয় যে

এই সিনেমায় পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলি ইতিহাসকে পুঁটির শরীরের মধ্যে দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে গিয়েছেন। প্রশ্ন না করেও তার এই গল্পের মধ্যে দিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্থাপন করেন পরিচালক যা সমাজকে ভাবিয়ে তোলে। লেখিকা এখানে দেখাবার চেষ্টা কুরেন যে এই সমগ্র গল্পটি যেন এক অপূর্ণ প্রেমের গল্পও বটে যা ইতিহাসে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তার চিহ্ন রেখে যায়। এই কথার উৎস টেনে বলা যেতেই পারে যে যদিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যম এই সিনেমাটিকে পরিচালকের চোখে লিঙ্গ ও শরীর নির্বিশেষে এক ভালবাসার উপাখ্যান বলে তুলে ধরতে চেয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতেই হয় যে সমাজ ব্যবস্থায় মুলস্রোতের নিয়মে লিঙ্গের রাজনীতিকে বুঝে ওঠা বা এড়িয়ে যাওয়া যে ওতটাও সহজ নয় তাই এই নিবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল আলোচনা -

মূল ধারার হিন্দি সিনেমা হোক বা বাংলা সিনেমা উভয় ক্ষেত্রেই সিনেমার বিবর্তনের সাথে সাথে সিনেমায় নারীর উপস্থাপনার ধারনা পরিবর্তিত হয়েছে। এই নিবন্ধে বাংলা সিনেমাই আলোচ্য বিষয়। উদাহরন স্বরূপ ১৯৬০ -এর বাংলা সিনেমার ঘরানা যাকে বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হত সেই সময়েরএকটি অন্যতম সিনেমার কথা বলা যেতে পারে যা হল সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা। সত্যজিৎ রায় চারুলতার মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক উচ্চবিত্ত নারীর উপস্থাপনা করেছিলেন। চারুলতা সিনেমাটি যদি আমরা গভীরভাবে দেখি সেখানে আমরা দেখব অমল ও চারুর মধ্যেকার সম্পর্কের দৃশ্যায়ন কিভাবে পিতৃতান্ত্রিক ঘেরাটোপে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক উচ্চবিত্ত নারী হিসেবে চারুকে তুলে ধরা হলেও অমলের সঙ্গে চারুর সম্পর্কের দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে পরিচালক পিতৃতান্ত্রিক রাজনৈতিক ভাবধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। বর্তমান সিনেমায় একবিংশ শতাব্দীর নারী অনেক বেশী স্বাধীন , আধুনিক, আগের তুলনায় অনেকটা বেশী নিজের জীবন নিয়ে ভাবতে সক্ষম। সিনেমায় সেই নারীর জীবনের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আসলেও সিনেমায় নারীর যৌনতার চিত্রণের ক্ষেত্রে খুব একটা বেশী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। এই আলোকে বলা যেতে পারে যে, যদি নারীর যৌনতার চিত্রনে পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে যৌনতার আরও প্রান্তিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন তেমন ভাবে আশা করাই যায় না। কিন্তু পরিবর্তন না আসলেও, যেটা আরও বেশি বিপদজনক তা হল পিতৃতন্ত্রের ঘেরাটোপে আরও বেশি করে আবদ্ধ হয়ে পড়া।

২০১৯ সালে মুক্তি প্রাপ্ত কৌশিক গাঙ্গুলি পরিচালিত ঋত্বিক চক্রবর্তী ও ঋদ্ধি সেন অভিনীত নগরকীর্তন ছবিটি সমকামিতার দৃশ্যপটে আসলে একজন Trans Women বা রূপান্তরকামী নারীর গল্প। সিনেমাতে গল্পের উপস্থাপনা সম্পূর্ণটাই পিতৃতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থেকেই সংগঠিত হয়েছে। বাংলার মানব জীবনে যে ভাবে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ঘটে সেখানে যেই ঘটনাগুলি সমাজের ‘নিয়মে’ বা বাঁধাধরা গতে সাজানো যায় না সেগুলিকে আমরা সাধারণত দৈবিক বা ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে ধরে নিই। এর ফলে সেই ঘটনার উদ্দ্যেশে মানুষ আর কোন ধরণের সন্দেহ বা প্রশ্নের অবকাশ রাখে না। বঙ্গ সংস্কৃতিতে সমকামিতা বা রুপান্তরকামিতার ধারনাও ঠিক সেরকম। যেহেতু

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো 'পুরুষ' এবং 'নারী' এই দুই লিঙ্গকেই স্বাভাবিক বলে স্বীকৃতি দেয়, সে ক্ষেত্রে তাঁর বাইরে কিছু হলেই তা ঈশ্বরের সৃষ্টি যাকে সাধারণ ব্যক্তি উপলব্ধ করতে অসক্ষম বলে শিখিয়ে দেয় আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। এই তথ্য নিয়ে বহু গবেষণা বর্তমান। Ruth Vanita তাঁর গ্রন্থ Love Rites -এর তৃতীয় অধ্যায় "Is The Spirit Gendered , Fluid Gender Sex Change And Same Sex Marriage " -এ বিভিন্ন দৈবিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে সমকামিতা ও দৈবিক প্রেমের যোগ সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৯] এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা সিনেমার দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব সম্পূর্ণ সিনেমাতেই একপ্রকার দৈবিক প্রেমের সাথে সমকামিতার সম্পর্কের যোগসূত্রের প্রতিফলন ঘটানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে যার প্রমানস্বরূপ পুরো সিনেমার মধ্যে বিভিন্ন দৃশ্যে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। এর মূল কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যদি সমকামী সম্পর্ককে ঐশ্বরিক প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া যায় তাহলে আর নতুন করে কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে এই দৈবিকতা প্রদানও প্রাধান্যকারী লিঙ্গ রাজনীতির একটি ধরণ বিশেষ।

যেকোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষত সমকামী সম্পর্কের ক্ষেত্রে, Mutual Commitment বা পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির প্রয়োজনীয়তা আছে। গল্পের প্রধান দুই চরিত্র পুঁটি (পরিমল থেকে পরী হয়ে পুঁটি) এবং মধুদার মধ্যেকার মৌখিক প্রতিশ্রুতিই ছিল যে মধুদা পুঁটিকে সম্পূর্ণভাবে নারী হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এখানে একটি জিনিস খুব ভাল ভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে এই নারী হয়ে ওঠা কিন্তু পুঁটির শারীরিক গঠনকে নির্দেশ করছে, তার মানসিক গঠনকে নয় কারন একজন রুপান্তরকামী নারী কিন্তু মানসিকভাবে নারীই।পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় নারীর মতাদর্শ কোন গুরুত্ব পায় না, গুরুত্ব পায় তাঁর শরীর। এই শরীর আবার কি রকম হলে একজন নারী সুন্দরী লাস্যময়ী হয়ে উঠবে তাও ছোট থেকেই আত্মস্থ করিয়ে দেয় এই সমাজ। ফর্সা, তন্বী, লম্বা চুল, উদ্ধত স্তন, সুডোল নিতম্ব, ইত্যাদি কথাগুলি একজন নারী শরীররে নিপুণ বর্ণনা হিসাবে বহুবার ব্যবহৃত। এই সিনেমাও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। পুঁটি একজন রুপান্তরকামী নারী হিসাবে এই সমাজ দ্বারা 'স্বীকৃত' নারী শরীরটাই চায় কারণ সেই শরীরটাই তাঁর জীবনের স্বপ্নের পুরুষ মধুদার প্রেয়সী করে তুলবে তাকে। সিনেমার একটি সংলাপে পুঁটির চুলের কথায় মধু বলে যে "যতদিন না তোমার নিজেরটা বড় হচ্ছে ততদিন তুমি এটা খুলবে না"। পুঁটি মনে প্রানে পোশাকে আচরণে মতাদর্শে একজন নারী কিন্তু সিনেমার নায়ক মধু সেটা মানতে চায় না। সে নারী শরীর বলতে ঠিক যা বোঝায় সেটাই দেখতে চায় তাতে যদি সেই রুপান্তরকামী নারীর শরীরটাকে সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে-মুচড়ে দিতে হয় তাতেও সে রাজি। একজন রুপান্তরকামী নারী কি রকম হওয়া উচিত তাঁর উদাহরণ হিসাবে এখানে পরিচালক মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় কে দেখিয়েছেন। পুঁটির সম্পূর্ণরুপে নারী হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করার মন্তব্য নিয়েই দৃশ্যপটে তাঁর উপস্থাপনা। এই দৃশ্যে তিনি যখন তাঁর জীবনের কথা বলছেন সেখানে তাঁর একটি সংলাপ আছে -"নারী দেহ তৈরি করা কি অতই সোজা, নারী দেহ অনেক যত্নে তৈরি করতে হয়"।এই সংলাপের মধ্যে দিয়ে যে নারী শরীরের কথা পরিচালক বলতে চাইছেন সেই নারী শরীর

কেবলমাত্র জৈবিকভাবে সৃষ্ট শরীর নয়। এখানে নারী শরীরকে পুরুষের চোখে আকর্ষিত হওয়ার জন্য তৈরি করার কথা বলা হচ্ছে যাতে পুরুষের চোখে নারীকে সুন্দর লাগে সেই জন্য নারী শরীরকে যত্নে তৈরি করার কথা বলা হয়েছে ।নারী শরীর ও নারীত্বের ধারনার গতানুগতিক ধারাকেই বারংবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সামাজিক পরিভাষায়, বিসমকামিতাই সমাজের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদিকে টিকিয়ে রাখার জন্য একমাত্র প্রযোজ্য মাধ্যম বলে মনে করা হয়ে থাকে। সমকামিতা হল সমাজের নিয়ম নীতির বিচ্যুতি। এই সমগ্র প্রক্রিয়াই পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের ফলাফল। যদি এই সমীকরণকেই মেনে নেওয়া হয় এবং সমকামিতাকে বিচ্যুতি বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ একজন নারী পুরুষের সম্পর্কের নিয়মাবলী সমকামিতার সম্পর্কে থাকা কোন মতেই উচিত নয়। কিন্তু বিপদ সঙ্কেত সেখানেই যখন দেখা যাচ্ছে যে বিসমকামি সম্পর্কের লিঙ্গ রাজনীতির ছায়া সমকামী সম্পরকেও বর্তমান। এই অবস্থান সিনেমায় পুঁটি ও মধুর সম্পর্কের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়ে থাকে। পুরো সিনেমাতে পুঁটি যে আসলে শারীরিকভাবে নারী নয় এই সত্য প্রকাশের আগের দৃশ্য পর্যন্ত পুঁটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর স্বপ্নের পুরুষ মধুদার উপর নির্ভরশীল। মধু ওকে যেভাবে থাকতে বলত, যেভাবে সাজতে বলত পুঁটি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতো যেভাবে একটা বিসমকামি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে একজন পতিব্রতাস্ত্রী তাঁর স্বামীর সমস্ত কথা মেনে চলে।রুপান্তরকামী হলেও পুঁটি মনে প্রানে একজন নারী কিন্তু তাঁর নিজস্ব কোন সত্ত্বা পরিচালক সিনেমার কোন ক্ষেত্রেই তৈরি হতে দেননি।

পরিমল থেকে পুঁটি হয়ে ওঠার যাত্রাপথকে পরিচালক প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপন করেননি। এই যাত্রাপথটিকে সিনেমায় Backstory বা পূর্ব কাহিনী হিসেবে দেখিয়েছেন। এই যাত্রাপথ চিত্রনের ক্ষেত্রে দুটো অন্যতম দৃশ্য আছে যার উপস্থাপনের ধরন লক্ষণীয়। প্রথম দৃশ্যে পরিমল ওরফে পুঁটির ছোটবেলার একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে যেখানে যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতায় পরিমল অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় পরিমল প্রথম পুরস্কার লাভ করে সারদা মায়ের ভুমিকায় সেজে। প্রথম পুরস্কার লাভের পর যখন পরিমল, তাঁর মা এবং দিদি তার বাবাকে সেই খবর দিতে আসে এবং পুরস্কার দেখায়। এই দৃশ্যে পরিচালক খুব নিপুণতার সাথে সমাজ ব্যবস্থার সামাজিকীকরণের সূক্ষ্ম অলিখিত নিয়মগুলিকে তুলে ধরেন এই যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দ্যেশ্য হল এমন কিছু সাজতে হবে যাকে দেখে অন্যেরা চিনতে পারবে না। পরিমলের মধ্যে ছোট বেলা থেকেই নারী সত্ত্বা বর্তমান এবং সেই কারণে খুব সন্দর করে সে সারদা মায়ের ভূমিকাটি ফুটিয়ে তোলে এবং প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। এর পরবর্তী বা দ্বিতীয় দৃশ্যে পরিমলের মা এবং বাবার একটি কথোপকথনের দৃশ্যপট আসে। এই কথোপকথন থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে পরিমলের এই নারী সুলভ আচরণকে একপ্রকার ব্যাধি হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং তার সমাধান স্বরুপ এই বিষয়টিকে কঠোর ভাবে দমন করার নিদান দেওয়া হচ্ছে। পরিমলের বাবার মুখের একটি সংলাপ "যদি এরপর কোনদিন ছেলেকে স্নো-পাউডার মাখিয়েছ তাহলে আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব" আবারও বুঝিয়ে দেয় যে সমাজে বসবাস করতে গেলে তাঁর তৈরি করে দেওয়া নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করা যাবে না বা প্রশ্ন

করা যাবে না। পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা লিঙ্গ সামাজিকীকরণ এমনভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে যার ফলে পুরুষ এবং নারীকে কিছু বিশেষ ভুমিকা ও কিছু বিশেষ কাজের মধ্যে দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়ে থাকে যা পুরুষ ও নারীর পরিচয়ের মাপকাঠি হয়ে থাকে। লিঙ্গ সামাজিকীকরণের এই ধারনা দিয়ে এই দৃশ্যে পরিমলের পুরুষ হয়ে নারীস্বরূপ সারদা মায়ের রূপ নেওয়াকে তার বাবা অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন।

সম্পূর্ণ সিনেমাতে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের উপস্থাপনা আছে এবং দুটিই বেশ লক্ষণীয়। প্রথম দৃশ্য যখন পুঁটি লুকিয়ে মধুর সাথে একটা বাড়িতে দেখা করছে এবং সেখানে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের উপস্থাপনা। আমরা জানি ব্যক্তিগতপরিসর নারীরও বহির্জগতকে পুরুষের বলে ধরা হয়ে থাকে।পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের মধ্যে দিয়ে নারীকে আবদ্ধ করে পুরুষ এবং ব্যক্তিগত পরিসরেও অজান্তে হোক বা নারীর সম্মতিতে আধিপত্য পুরুষেরই থাকে। এই ধারনার মধ্যে দিয়ে যদি সিনেমার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যটিকে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবেযে ব্যক্তিগত পরিসর নারীর জন্য নির্ধারিত হলেও এই পরিসরেও ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে পুঁটির সম্মতিতে একজন পুরুষ হিসেবে মধুর ইচ্ছেই প্রাধান্য পেয়েছে ।এই পরিপ্রেক্ষিতে অপর একটিদৃশ্যের কথা বলা যেতে পারে যেখানে মধুর বাড়িতে মধুর বউদির (নাম ভুমিকায় বিদিপ্তা চক্রবর্তী) পোশাক বদলানোর দৃশ্যটি যেখানে পুঁটি একভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। এখানে পরিচালক পুঁটির মধুর বউদির দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে দিয়ে তার নারী হওয়ার আকাঙ্খাকেই প্রকাশিত করছেন। পুঁটি নিজে এরকম একটি নারী শরীরের প্রত্যাশা করছে যাতে সে মধুর চোখে আরও বেশী সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। সাধারনত পর্দায় প্রতিষ্ঠিত ধারনায় নারীদের পিতৃতান্ত্রিক পুরুষালী আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয় যে উপস্থাপনে নারীদের যৌনতা এবং কোন এক পুরুষের ভোগ্যবস্তু হিসেবে প্রতিপন্ন হওয়ার জন্যই তাদের পর্দায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এই ধারনাই পুঁটির নারী শরীরের প্রত্যাশার পিছনে কাজ করছে।

পুঁটি এবং মধুর মধ্যেকার যৌন মিলনের দৃশ্যের উপস্থাপনা আপাতদৃষ্টিতে সমকামিতা মনে হলেও দৃশ্যটিকে বিসমকামিতার আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মানসিকভাবে পুঁটি একজন নারী হলেও, মধুর চোখে কিন্তু পুঁটির শারীরিক গঠনটাই আবশ্যিক। যৌন মিলনের দৃশ্যে পরিচালক পুঁটিকে সম্পূর্ণভাবে নারীর পোশাকে উপস্থাপিত করছেন তাই নয়, প্রাধান্যকারি ঘরানায় একজন নারী পুরুষের মিলনের দৃশ্যে যেরকম ভাব ভঙ্গি এবং ক্ষমতার প্রতিফলন থাকে এখানেও ঠিক একই চিত্রিত হয়েছে। পুঁটির নারী সত্ত্বার উপস্থাপনকে এখানে একজন পুরুষের দৃষ্টি দিয়েই দেখা হয়েছে।ছোট বেলা থেকেই পরিমল-এর মধ্যে নারী সত্ত্বা বর্তমান কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার চাপে সে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে না। সিনেমার কিছু দৃশ্যে দেখানো হয়েছে যে তাঁর গৃহ শিক্ষক সুভাষের সাথে তাঁর একটি সম্পর্ক তৈরি হয় কিন্তু পরবর্তীকালে আবার সেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিয়মের চাপে সুভাষ পরিমলের দিদিকেবিয়ে করতে রাজি হয়। সুভাষের সাথে তাঁর দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরিচালক খুব সুন্দর করে পরিমলের পুঁটি হয়ে ওঠার যাত্রাপথের সুত্রপাত করেন। এই ঘটনা পরিমলকে বুঝতে শেখায় সমাজে একজন নারীর সৌন্দর্য তাঁর দৈহিক গঠনে। সিনেমার একটি দৃশ্যে দেখা যায় পরিমলকে তাঁর দিদির বিয়ের রাতে আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজের দিদির সাজের জিনিসপত্র নিয়ে

সাজতে। একজন নারী হয়ে উঠতে। এরপরেই তাঁর কলকাতা চলে আসা এবং একজন রুপান্তরকামী নারী হিসাবে যাত্রা শুরু করা।

এরপর সিনেমা চলে যায় মধুর বাড়ির প্রেক্ষাপটে এবং এই পর্যায়টি সিনেমার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি হল সিনেমায় সত্য প্রকাশের দৃশ্য যেখানে জানাজানি হয় যে পুঁটি আদতে কোন নারী নয় একজন পুরুষ। লক্ষণীয় বিষয় ছিল যে প্রেক্ষাপটে সত্য প্রকাশ পাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণভাবে একটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের একটা দৈবিক দিক রয়েছে। পরিচালক নবদ্বীপের মতো জায়গাকে বেছেছেন যার একটা দৈবিক তাৎপর্য আছে। নবদ্বীপের সাথে সিনেমার নামের একটা যোগসূত্র রয়েছে। নবদ্বীপ কীর্তনের বা চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ যেখান থেকে নগরকীর্তন নামকরন। সিনেমায় সত্য প্রকাশের দৃশ্যটিকে যদি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যায়একটি মন্দির যেখানে চৈতন্যদেবের নামগান চলছে , শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তন চলছে এরকম একটা পরিবেশে মধুর বউদির (নাম ভুমিকায় বিদিপ্তা চক্রবর্তী) হাতে পুঁটির পরচুল খুলে যায় ও সত্য প্রকাশ পায়। Ruth Vanita তার গ্রন্থ Love's Rite -এর প্রথম অধ্যায়ের একটি অংশে তিনিপ্রশ্ন উথাপন করেছিলেন যে দৈবিক আশীর্বাদ কি শুধু বিসমকামি সম্পর্কের জন্যই ?[১০] এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন সমকামী সম্পর্কের বিভিন্ন উদাহরন তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে কিন্তু সিনেমায় উপস্থাপনে আমরা বিষয়টাকে ভিন্নভাবে দেখি এখানে কিন্তু সেটা মানা হইনি। এখানে সত্য প্রকাশ পাওয়া এবং প্রধান চরিত্রদের বেরিয়ে যাওয়ার সাথে এটা বোঝা যায় যে এই সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এখানে এক প্রকার মাপকাঠি বা মানদণ্ড হিসেবে কাজ করছে এটা বোঝানোর জন্য যে সাংস্কৃতিক পরিসরে কোন বিষয়টি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয় ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গল্পের নায়ক মধুর পরিবার ছিল কীর্তনিয়া পরিবার । এই পরিবারের মান সম্মানের সাথে একটা দৈবিক যোগসূত্র কাজ করছে যা সিনেমার একটি বিশেষ সংলাপে প্রকাশ পায় যেখানে বলা হচ্ছে যে "আজ পর্যন্ত এই কীর্তনিয়া পরিবারের দিকে কেউ কোনদিন আঙ্গুল তুলতে পারেনি কিন্তু আজ তোর জন্য তুলবে"।

পরিচালক সিনেমার শেষ দৃশ্যের উপস্থাপনা করেছেন বেশ চমকপ্রদ ভাবে। গল্পের শুরু এবং শেষের মধ্যে এক প্রকার দ্বন্দ্বমূলক ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সিনেমা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল অর্থাৎ যাদের সাথে পুঁটি থাকত তাদের হাতেই পুঁটির জীবন শেষ হচ্ছে। শেষ দৃশ্যে পুঁটির আত্মহত্যা এবং মধুর নারী স্বরূপে আবার সেই জায়গাতেই প্রবেশ যেখানে পুঁটির সাথে তার প্রথম আলাপ হয়, সম্পূর্ণ দৃশ্যটির মধ্যে বিশেষ অর্থ কাজ করছে। গ্রীক সাহিত্যের সাথে সাথে আমরা ভারতীয় পুরান সাহিত্যেও এই ধারা দেখতে পাই। Vanitaর আলোচনা অনুযায়ী তার গ্রন্থ Love's Rite -এর Second Self অধ্যায়ে "Dying Together One Soul In Two Bodies" পর্বে লেখক রামায়নের প্রসঙ্গ তুলেছেন যেখানে শ্রীরাম যখন স্বর্গে ফিরে যান তখন তার সাথে সবাই চলে গেলেও হনুমানকে তিনি থেকে যেতে বলেন এবং শ্রীরাম বলেন যে হনুমান পরবর্তীতে রামায়নের কথা পৃথিবীলোকে প্রচার করবেন।[১১] এখানে সিনেমার শেষ দৃশ্যের উপস্থাপন অনেকটা এইভাবেই দেখানো হয়েছে যেখানে আমরা দেখি পুঁটির মৃত্যুর পর মধু পুঁটির ব্যবহার করা পোশাক পরে সেই জায়গায় আসে যেখানে পুঁটি

থাকত ঠিক সেই রূপে আসে যে রূপে পুঁটি থাকত। এখানে এইভাবে বিষয়টি হচ্ছে যেন পুঁটি এবং মধু "এক আত্মা দুই শরীর"। পুঁটির মৃত্যুর পর পুঁটির হয়ে সেই ধারা বহন করবে মধু । সমাজ ও সংস্কৃতির কিছু ক্ষমতাশালী নিয়ম তাদের সেই পরিকাঠামোতে এক হতে দেয়নি, সেই কারণে হয়ত এই ভাবেই জীবনযাপন করার কথা ভাবে মধু। তাছাড়া রুপান্তরকামী পুরুষ হোক বা নারী, পিতৃতান্ত্রিক বেড়াজাল ভেঙ্গে বেরনো কখনই সম্ভব নয়। আর পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে গেলে বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে সিনেমায় কখনই ২জন পুরুষের বিবাহ দেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই এই শেষ দৃশ্যের রচনা।

উপসংহার -

সম্পূর্ণ নগরকীর্তন সিনেমার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে সমকামী সম্পর্ককে একপ্রকার পিতৃতান্ত্রিক আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন পরিচালক। পরিচালকের দৃষ্টিকোন অনুযায়ী আধুনিক সমাজব্যবস্থায় রুপান্তরকামীর মত বিষয়কে পর্দায় উপস্থাপন করা বেশ প্রশংসনীয় । পরিচালকের এই সাহসী পদক্ষেপ কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক ধারনা ভেঙ্গে নিতে পারেনি কারন পরিচালকের চিত্রায়নের দৃষ্টিকোনের সাথে অন্যান্য অনেকগুলি বিষয়ও এখানে কাজ করেছে যেমন সিনেমার ব্যবসায়িক দিক। এছাড়াও আরও একটি বিষয় বিদ্যমান। গতে বাঁধা সমাজের নিয়মের বাইরে গিয়ে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো এবং তাঁর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান গুলির আঙ্গিকের বাইরে গিয়ে পরিচালক নগরকীর্তনের চিত্রায়ন করতে চাইলেও, বাংলার দর্শকের কাছে তা কতখানি গ্রহনযোগ্য হত সে বিষয়ে আরও একটি গবেষণা প্রবন্ধের রচনা করা যেতে পারে।

তথ্যসুত্র:

Anderson, Bridget,'A Very Private Business: Migration and Domestic Work', Centre on Migration Policy and Society. Working Paper, 28, 2006, University of Oxford

Bakshi, Kaustav,& Madhuja Mukherjee,'A Brief Introduction to Popular Cinema in Bengal: Genre, Stardom and Public Cultures', South Asian History and Culture, 8, 2, 2017, Taylor and Francis Online

Hirdman, Anja,'Mirrored Masculinity: Turning the perspective of sexualization and representation around', Nikk Magazine, 3, 2004, p 8-12

Millett, Kate, Sexual Politics, Columbia: Columbia University Press, 2016

Mondal, K. Sujit,'A Study on Bengali Culture and Its Various Aspects', Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education,15,

9, 2018, India, 216-219
Mulvey, Laura, Visual and Other Pleasures (Language, Discourse, Society), London: Palgrave Macmillan, 2009
Nascimento, Do. Jonas, "Art, Cinema and Society: Sociological Perspectives, Global Journal of Human -Science: Sociology and Culture, 19, 5, November 2019, United States of America, 19-27
Oakley, Ann,Sex, Gender and Society,London: Temple Smith, 1972
Vanita, Ruth,Love's Rite: Same Sex Marriage in India and West, India: Penguin Books, 2005
Walbi, Sylvia,Theorizing Patriarchy,United States of America: John Wiley & Sons, 1990
মহাপাত্র, অনাদিকুমার, বিষয় সমাজতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, কলকাতাঃ সন্ধ্যা প্রকাশনী, ২০২২

১. Mondal, K, Sujit. 'A Study on Bengali Culture and Its Various Aspects', Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, 15, 9, 2018, India, pp 217-218
২. Bakshi, Kaustav, and Madhuja Mukherjee.'A Brief Introduction to Popular Cinema in Bengal: Genre, Stardom and Public Cultures', South Asian History and Culture, 8, 2, 2017, Taylor and Francis Online, p 114
৩. Nascimento, Do, Jonas. 'Art, Cinema and Society: Sociological Perspectives', Global Journal of Human -Science: Sociology and Culture, 19, 5, November 2019, United States of America, pp 19-20
৪. Walbi, Sylvia, Theorizing Patriarchy,United States of America: John Wiley & Sons, 1990, p 218
৫. Bakshi, Kaustav, and Madhuja Mukherjee.'A Brief Introduction to Popular Cinema in Bengal: Genre, Stardom and Public Cultures', South Asian History and Culture, 8, 2, 2017, Taylor and Francis Online, p 115
৬. Anderson, Bridget,'A Very Private Business: Migration and Domestic Work', Centre on Migration Policy and Society, Working Paper, 28. 2006, University of Oxford, p 13
৭. Hirdman, Anja,'Mirrored Masculinity: Turning the perspective of sexualization and representation around', Nikk Magazine, 3, 2004, p 11
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, স্রবন্তি, 'নগরকীর্তনঃ উলঙ্গ এক রাজার গল্প',আনন্দ বাজার অনলাইন,

১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

৯. Vanita, Ruth, Love's Rite: Same Sex Marriage in India and West,India: Penguin Books, 2005, pp 97-123

১০. Vanita, Ruth, Love's Rite: Same Sex Marriage in India and West,India: Penguin Books, 2005, pp 50-51

১১. Vanita, Ruth, Love's Rite: Same Sex Marriage in India and West,India: Penguin Books, 2005, pp 171-173

মুর্শিদাবাদে নবাবী স্থাপত্যের গোড়াপত্তন

ড. সংহিতা সেন
গবেষিকা
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ

কোম্পানির শাসন শুরু হবার আগে মুর্শিদাবাদ ছিল বাঙলার শেষ স্বাধীন রাজধানী। এই অঞ্চলে কিছু বিখ্যাত ও প্রচুর অজানা স্থাপত্য কীর্তি রয়েছে যা নিয়ে খুব সামান্য গবেষণা ধর্মী আলোচনা হয়েছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে সেই সকল স্থাপত্যের গোড়াপত্তনের ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই ঐতিহ্যের শৈল্পিক ও আলংকারিক এক অধ্যয়ন এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

সূচক শব্দ – মুর্শিদাবাদ, নাসিরী , মসজিদ, রাজপ্রাসাদ, ইসলামিয়া, শিয়া স্থাপত্য ।

মুর্শিদাবাদে নবাবী স্থাপত্যের গোড়াপত্তন

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পালাবদলের জন্য চিরস্মরণীয়। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যকলাপ এই সময় ঘটে যা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বেশ কিছুটা বদলে দিয়েছিল। যখন ক্রমে ক্রমে মুঘল শাসনের অবনতি ঘটেছিল, তখন বাংলা সাক্ষী ছিল নিজামত উত্থান পতনের এবং ব্রিটেনে ইস্ট ইন্দিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্থানের, যেটি ছিল আঠারো শতকের মধ্যভাগের সমসাময়িক ঘটনা। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে কিছু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর ভূমিকা ছিল। সারা বাংলা , অওধ (অযোধ্যা) ও হায়দ্রাবাদের মত প্রাদেশিক সাম্রাজ্যের বিকাশে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলা একটি স্বাধীন আঞ্চলিক প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল মুরশিদকুলী খানের তত্ত্বাবধানে। মুরশিদকুলী খান প্রথম জীবনে ছিলেন বাংলা সুবার দেওয়ান, পরবর্তীকালে তিনি সুবেদার পদে উন্নীত হন। তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা বাংলার বুকে একটি স্বাধঈন নিজামত প্রতিষ্ঠা করেন , যার রাজধানী ছিল মুখসুদাবাদ, পরবর্তীকালে তা মুর্শিদাবাদ নামে বহুল প্রচলিত হয়। বাংলার নিজামতের বিবর্তন প্রতীয়মান হয়েছিলে একটি স্বাভাবিক উন্নয়ন হিসেবে।কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে নিজামতের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইন্দিয়া কোম্পানি প্রাথমিকভাবে সুবা বাংলার সর্বেসর্বা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে তারা সারা ভারতবর্ষের উপর অধিকার স্থাপন করে ফেলে।

মুর্শিদাবাদ তাঁর গৌরবময় দিন গুলিতে একটি অত্যন্ত সম্পদশালী শহর হিসেবে পরিগণিত হত এবং লর্ড ক্লাইভ একে লন্ডন শরের সাথে তুলনা করেছেন। মুর্শিদাবাদ সেই সময়ই সুবা বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যকেন্দ্র এবং একই সঙ্গে প্রশাসনিক সদর

দপ্তর ছিল। এই কারণেঈ শহর তাঁর গৌরবান্বিত মহিমা ধরে রাখতে পেরেছিল।সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে কাশিমবাজারের (মুর্শিদাবাদের ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) এর সাথে মুর্শিদাবাদ শরের ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক উন্নতির পিছনে এর ভৌগোলিক অবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল বলে সহজেই অনুমান করা যায়। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দের ফরাসী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, কাশিমবাজারে একটি টাঁকশাল অক্টোবর মাসে স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাপ্ত মূদ্রা থেকে এটি পরিস্কার বোঝা যায় যে, কাশিমবাজার ও মুখসুদাবাদ প্রায় সম সাময়িক দুটি বানিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠলেও মুখসুদাবাদ অচিরেই একটি সমৃদ্ধশালী , বিশ্বজনীন রাজধানী শহরে পরিণত হয়েছিল। যেখানে কাশিমবাজার বিদেশি ব্যবসায়ীদের একটি শক্তিশালী ব্যবসা বানিজ্য কেন্দ্র হিসেবে রয়ে গিয়েছিল। পূর্বে একাধিক গবেষণাধর্মী লেখায় মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক , সামাজিক ও অর্থনৈতিক আঙ্গিক গুলি বহুধারায় আলোচনা হয়েছে । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুর্শিদাবাদের স্থাপত্যরীতির একটি সর্বাঙ্গিক গবেষণা এখনও পর্যন্ত খুবই অপর্যাপ্ত। বেশির ভাগ লেখাই পরিচিত স্থাপত্য গুলিকেই তুলে ধরেছে। এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে সেই সব লেখা মুর্শিদাবাদের রাজবংশ ভিত্তিক কিংবা স্থাপত্য গুলিতে কি ধরণের প্রভাব দেখা যায় সেই আলোচনা থেকে বিরত থেকেছে। এই প্রবন্ধে মুর্শিদাবাদের প্রথম রাজবংশ নাসিরিদের সময় কি ধরণের স্থাপত্যকীর্তি রচনা হয়েছিল এবং কিভাবে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক স্থাপত্যের ঘরাণা সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মুখসুদাবাদ পূর্ব ভারতের কেন্দ্রস্থল রূপে প্রতিপত্তি লাভ করতে শুরু করে। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই- আকবরী-তে জনৈক মখসুখ খান নামের এক অভিজাত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। যিনি ষোড়শ শতকের অন্তিম দশকে বাংলা ও বিহারের প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্থানীয় বাজারে ব্যবসায়ী ও পথিকদের উদ্দেশ্যে একটি বিশ্রামাগারের নির্মাণ করেছিলেন। যেটিকে কেন্দ্র করে সেই বাজারের বিস্তার ঘটে। তিনি নিজের নামানুসারে সেই অঞ্চলটিকে মুখসুসাবাদ নামে অভিহিত করেন। গুলাম হুসেন সলিম উল্লেখ করেছেন যে মুখসুস খান নামের এক ব্যবসায়ী একটি সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন এবং স্থানটিকে মুখসুদাবাদ নামে অভিহিত করেন। ১৬৯০ সালের পর ফরাসিদের অপ্রকাশিত চিঠি থেকে থেকে জানা যায় যে, দেওয়ান কাফায়েৎ খানের মুর্শিদাবাদের থাকতেন এবং সুবাদার ইব্রাহিম খানের মুর্শিদাবাদে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরাসী তথ্য সূত্র থেকজীটি পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই বহু চর্চিত মুর্শিদাবাদ শরে মুর্শিদকুলী খান আসার অন্তত দশ বছর আগে থেকে দেওয়ান ও সুবাদাররা এই স্থানে থাকতেন। জেমস ফোর্বস-এর লিখিত তথ্য থেকে আমরা এই শরের কিছুটা অস্পষ্ট ধারণা পেয়ে থাকি। অতএব এটি স্পষ্ট যে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে মুর্শিদাবাদ একটি প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গিরনগর (ঢাকা) থেকে মুখসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদ শুধুমাত্র সুবাহ বাঙলার রাজধানীতে সীমাবদ্ধ না থেকে পূর্ব ভারতের ব্যবসা , শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হিসেবে গণ্য হতে থাকে। মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে বাংলা, আওধ ও হায়দ্রাবাদের মতো প্রাদেশিক সার্বভৌম সাম্রাজ্যগুলির উত্থান ঘটে। মুর্শিদকুলী খান ছিলেন সুবাহ বাঙলার প্রথম নবাব নজিম,

যিনি নাসিরি বংশ এবং মুর্শিদাবাদের নিজামতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলী খানের কোন উত্তরাধিকার না থাকার জন্য ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিন মহম্মদ খান সিংহাসনে বসেন। এরপর সরফরাজ খান, নবাব মুর্শিদকুলী খানের (দৌহিত্র) । ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সরফরাজ গিরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দী খানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। বহু সুন্দর রাজপ্রাসাদ, আমত্যবর্গের আবাসস্থল, ভাগীরথীর দুই পাড়ে অবস্থিত বাগান , খানকা, মসজিদ, মাদ্রাসা, ইমামবাড়া, হাসপাতাল, অস্তাবল, চওড়া সড়ক, হামাম মুর্শিদাবাদের নগরায়ণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দুর্ভাগ্যবশত এই স্থাপত্য কীর্তি গুলির অধিকাংশেরই আজ কোন অস্তিত্ব নেই। ভারতবর্ষের এই অংশের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু-এর প্রধান কারণ। এছাড়া এই অঞ্চলে পাথরের অভাবের জন্য পড়া ইটের ব্যবহার এই স্থাপত্য গুলিকে আরও ক্ষণস্থায়ী করে দিয়েছিল। বর্তমানে নাসিরি বংশের সময়কালে (১৭০৪ - ১৭৪০ খ্রিঃ) নির্মিত এগারোটি স্থাপত্য কীর্তি আজ দেখা যায়। এর মধ্যে সাতটি মসজিদ, একটি সমাধি সৌধ এবং তোরণ, একটি রাজপ্রাসাদ ও একটি তিনতোরণের সমষ্টি।

মুর্শিদকুলী খান ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শহরটির নির্মাণ শুরু করেন। একটি বড় সংখ্যক শিয়া মুসলমান গোষ্ঠী , জৈন মহাজন এবং হিন্দুরা তাঁর সঙ্গে এই নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্রে আসেন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের কিছু পূর্বে মুর্শিদকুলী আনুষ্ঠানিক ভাবে বাঙলার সুবাদার পদে নিয়োজিত হন এবং এই শহরের নাম মুখসুশিদাবাদ থেকে মুর্শিদাবাদে পরিবর্তন করেন। ক্রমে মুর্শিদাবাদ একটি বিশ্বজনীন শহর হয়ে উঠতে শুরু করে। মুর্শিদকুলী খান নিজামত কেল্লা ও সবজি কাটরা নামক স্থানে জামা মসজিদটি নির্মাণ করেন ১৭২৪-২৫ খ্রিষ্টাব্দে। এই অঞ্চলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থাপত্য নিদর্শনটি ছিল চেহেলসেতুন বা চল্লিশ স্তম্ভের প্রাসাদ। দুর্ভাগ্যবশত, কেল্লা ও প্রাসাদটি ভাগীরথীর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। মুর্শিদকুলী খান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কাটরা মসজিদ এই নবাবী রাজধানী শহরের পূর্ব দিকের সীমানা নির্ধারণ করত। এই মসজিদের পূর্বদিকের তোরণের সিঁড়ির নিচে মুর্শিদকুলী খানের সমাধি ওনার স্ত্রী ও কন্যার পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি মসজিদের সিঁড়ির নীচে তাঁদের স্ব-ইচ্ছানুসারে সমাধি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

সুজাউদ্দিন মহম্মদ খান, মুর্শিদকুলী খানের জামাতা তাঁর পরে সিঙ্হাসনে আরোহণ করেন। তিনি ত্রিপলিয়া দ্বার, নহবত খানা, বিশ্রামাগার, আস্তাবল প্রভৃতির মত স্থাপত্য কীর্তি নির্মাণ করেন। তিনি বেশ কিছু পুরনো ভবন ভেঙে ফেলে কয়েকটি চমটকার স্থাপত্য নির্মাণ করেন। এক্ষেত্রে একটি প্রাসাদ, একটি অস্ত্রাগার, রাজস্ব আদালত (দিওয়ান খানা) , সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শনার জন্য হল ঘর, একটি ব্যক্তিগত কার্যালয় (খিলাওয়াৎ খানা), ফরমান বাড়ি, কোষাগার (খালসা কাছারি), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের সন্নিকটে নবাব সুজাউদ্দিন নাকটাখালি বা নাগিনাবাগ অঞ্চলে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করেন। এর সময়কাল নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও আজ প্রায় সর্বতো ভাবে নবনির্মিত কিন্তু এওকদা এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকা শিলালিপি এর প্রাচীনত্বের দাবি রাখত। মুর্শিদকুলী খানের কন্যা আজিম উন নিসা বেগমের মসজিদটি মুর্শিদাবাদ শহরের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শণ। এই মসজিদটির শুধুমাত্র পূর্ব

দিকের দেওয়াল, সুউচ্চ বেদী এবংমসজিদে ওঠার সিঁড়ির নীচে বেগমের সমাধিটি আজ বর্তমান। মসজিদটি নির্মাণের সময়কাল ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দ বলে ধরা হয়। এই মসজিদটির সঙ্গে এক অদ্ভূত জন শ্রুতি প্রচলিত আছে। বলা হয় আজিম উন নিসা বেগম নাকি নিজের যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ছোট শিশুদের ফুসফুস খেতেন। সেই কারণে নবাব তাঁকে শাস্তি দেন এবং তাঁর সমাধি তারই তৈরি করানো মসজিদের সিঁড়ির নীচে স্থিত করা হয়। কিন্তু এই প্রচলিত গল্পের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। তাছাড়া বেগমের মাতা ও পিতার সমাধিও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি মসজিদের নীচে থাকায় একথা সহজেই অনুমেয় যে এটি তাঁদের একটি পারিবারিক রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও একটি মসজিদ যা মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের সন্নিকটে আরেকটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ অবস্থিত রয়েছে।এই মসজিদটির পূর্ব দেওয়ালে যে শিলালিপিটি আজও পাওয়া যায় তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী মসজিদটি তবস্মুম নাম্নী কোন এক মহিলার দ্বারা ১৭৩৪-৩৫ খ্রিষ্টাব্দ নির্মিত। এই নারীর বিষয়ে বিশদে কিছুই জানা যায় না। তবে আন্দাজ করা যায় যে তিনি সেই সময়ের কোন অভিজাত পরিবারের মানুষ ছিলেন, কারণ সরফরাজ খানের প্রাসাদ এই অঞ্চলে অনতিদূরেই অবস্থিত ছিল। এই সময়ে আরেকজন নবাবী পরিবারের বেগম একটি অপূর্ব মসজিদ স্থাপন করেন। মুর্শিদকুলী খানের একমাত্র পত্নী নৌসরী বানু বেগম কিল্লা নিজামতের অঞ্চলে একটি অভূতপূর্ব স্থাপত্য কীর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মসজিদটি তিনটি গম্বুজ ও দুটি খিলান যুক্ত, যা নবাবী স্থাপত্যে আর দেখা যায় না। মসজিদে খিলানের ব্যবহার প্রথম এই মসজিদেই দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে এটি বলে রাখা প্রয়োজন যে এই মসজিদটি সৈয়দ সাদিক আলি নামক রাজসভার এক নামী ব্যক্তিত্বের দ্বারা পরবর্তীকালে ১৮৮১ সালে নির্মিত হয়। খিলান দুটি সেই সময় যুক্ত করা হয়েছে কিনা তা শিলালিপি থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় না। ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে রোশনীবাগ অঞ্চলে নবাব সুজাউদ্দিনের সমাধি অবস্থিত। এটি অত্যন্ত সাধারণ একটি চৌকো স্থাপত্য, এর চারিদিকে চারটি মিনার রয়েছে এবং ভেতরে সুজাউদ্দিনের সমাধি রয়েছে।

আজিম উন নিসা বেগম মসজিদ ও সৌধ

আগেই আলোচিত হয়েছে যে, সরফরাজ খান মুর্শিদাবাদের তৃতীয় নবাব যিনি ১৭৩৯-৪০ খ্রিষ্টাব্দে রাজত্ব করেন (সুজাউদ্দিন মহম্মদ খানের পর) এবং তাঁর প্রাসাদ

ছিল নাকটাখালি অঞ্চলে । যেখানে তাঁর সমাধি আজও বর্তমান। এই সমাধি টি অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে এক সময় ছিল, খুব সম্প্রতি সেটির সংস্কার হয়েছে বলে জানা গেলেও গবেষিকার এখনও সেটি দেখার সুযোগ হয় নি। তাঁর সমাধির খুব নিকটে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট বেগম মসজিদ নামে আরেকটি মসজিদ তাঁর মা কিংবা স্ত্রীর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। কাটরা মসজিদ মুর্শিদাবাদের সমধিক পরিচিত মসজিদ্গুলির একটি হলেও এই মসজিদটি সময়কালের নিরিখে কাটরার সমসাময়িক কিংবা কিছু পূর্বে বলে বিবেচিত হতে পারে। এটিতে এক সময়ে যে শিলালিপিটি লাগানো ছিল তাতে এর সময়কাল ১৭২৩ -২৪ খ্রিষ্টাব্দ বলে পূর্বেই বলা হয়েছে। অপরদিকে কাটরার সময়কাল ১৭২৪-২৫ খ্রিষ্টাব্দ বলে পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানে এটি আলোচনা করা প্রয়োজন যে সরফরাজ খান নাকটাখালির কাছে কুমড়াপুর নামক অঞ্চলে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করতে শুরু করেছিলেন, যা ফুটি মসজিদ নামে বিখ্যাত। এই মসজিদটি পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট এবং অভূতপূর্ব স্থাপত্য দ্বারা সজ্জিত।

সরফরাজ খানের সমাধি সৌধ

বিখ্যাত জৈন মহাজন জগত শেঠের পরিবার বেশ কয়েকটি সুবিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করে মুর্শিদাবাদের উত্তরে মহিমাপুর নামক অঞ্চলে। এই বাড়ি গুলির একটি এখন জগতশেঠদের পারিবারিক সংগ্রহশালা হিসেবে পরজটকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। একটি মন্দির যা এই বাড়িটির মধ্যেই অবস্থিত সেটি মুর্শিদাবাদের মন্দির স্থাপত্যের একটি অনন্য নিদর্শন। প্রাসাদটি অপরদিকে এই অঞ্চলের অন্যান্য প্রাসাদ গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ খালি আকারে কিছুটা ছোট। জগতশেঠদের পূর্বের প্রাসাদটি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর পরে একটি সম্পূর্ণ ইউরোপীয় অঞ্চলে এই নতুন প্রাসাদটি নির্মিত হয়।

জগত শেঠের বাড়ি

নাসিরী রাজবংশের আমলে প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্য কীর্তি গুলি মুর্শিদাবাদের স্থাপত্য ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যেহেতু এই রাজবংশ মটে বত্রিশ বছর রাজত্ব করেছে তাই এঁদের সময়ে তৈরি স্থাপত্যের সংখ্যাও কম। এছাড়া ভাগীরথী নদীর পরিবর্তনশীল গতিপথের জন্য বেশ কিছু স্থাপত্য আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ ভাবে আজ বিলুপ্ত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের স্থাপত্য কীর্তি নবাব মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকেই বড় আকারে শুরু হয়। তাঁর বানানো সবচেয়ে বিস্ময়কর কীর্তি চেহেল সেতুন বা চল্লিশ স্তম্ভের প্রাসাদ আজ বর্তমানে না থাকলেও কাটরা মসজিদের আকার ও গঠন থেকে অনুমান করা যায় যে প্রাসাদটি কতটা বিশাল ছিল। আজকে মুর্শিদাবাদ ও কাটরা মসজিদ প্রায় সমার্থক। এই মসজিদ মুর্শিদকুলী খান শুক্রবারের নামাজ পড়ার জন্য তৈরি করেন। এর একক দালান বিশিষ্ট মুঘল ঘরানার অনুকরণ হলেও এর গম্বুজ সুলতানী রীতির অনুকরণে গঠিত। কাটরা মসজিদের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতীয় মসজিদ স্থাপত্যের প্রভাবও লক্ষ্যনীয়। মুর্শিদকুলী খানের প্রথম জীবন দক্ষিণ ভারতে কাটার ফলেই হয়তো মসজিদের বলিষ্ট গঠন , কাতরা মসজিদের সামনের প্রশস্ত দালানে এই প্রভাব আমরা দেখতে পাই। মুর্শিদকুলী খান তাঁর কাটরা মসজিদের দু'দিকে মাদ্রাসা ছাত্রদের থাকার জায়গা ও কোরান পাঠ করার জন্য কক্ষ নির্মাণ করেন। কিন্তু মুঘল শাসনের অধীনে থাকা সত্বেও সুলতানী স্থাপত্যের এই প্রভাব অবাক করার মতো। এই প্রভাব শুধু কাটরা মসজিদে নয়, এই সময়কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি মসজিদেই দেখা যায়। এই সময়কালের সব মসজিদেই (কেবলমাত্র নৌসরী বানু বেগমের মসজিদ ব্যতিরেকে) সাধারণ চ্যাপ্টা গোলাকার গম্বুজ দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেকটি মসজিদের পূব দেওয়ালেই চৌকো আকারের অলঙ্করণ লক্ষ্যনীয়। মসজিদের মিনার গুলির নীচে উল্টানো ফুলদানীর অলংকরণ এই আমলে তথা মুর্শিদাবাদের প্রায় সমস্ত মসজিদে দেখা যায়। ফুটি মসজিদের অলঙ্করণ মুর্শিদাবাদের সমস্ত স্থাপত্য গুলির মধ্যে একেবারেই অনন্য। এই মসজিদটি অসম্পূর্ণ। কিন্তু এটির পরিকল্পনা যে অত্যন্ত যত্নের সাথে করা হয়েছিল তার ছাপ এর দেওয়ালে

সুস্পষ্ট । এছাড়া এর কিবলার (মসজিদের পশ্চিমদিকের দেওয়াল) বাইরে দিকে বাঙলার দো-চালা বাড়ি ও শিয়া ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 'তাজিয়া'-র অলঙ্করণ দেখা যায়। সুলতানী সময়ে দোচালা ছাদ গঠনে ব্যবহৃত হলেও এখানে তা মসজিদ গাত্রে শোভিত হয়।

ভারতবর্ষে কোম্পানী আমল শুরু হওয়ার আগে মুর্শিদাবাদ ছিল শেষ ইসলামী স্বাধীন রাজধানী। এখানকার শিয়া ইস্লামের ধর্মাবলম্বী নবাবরা যে স্থাপত্য ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তা একটি উপ-সাম্রাজ্যিক শৈল্পিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা যায়। লক্ষ্মৌ বা হায়দ্রাবাদের মতো আজ এই অঞ্চলের স্থাপত্য পৃথিবী বিখ্যাত হয় নি। কিন্তু এই নাসিরী রাজবংশ যে ঐতিহ্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল তার ওপরেই পরের দুই রাজবংশ - অফসর ও নজাফি বিভিন্ন শিল্প স্থাপত্যের রচনা করে গেছেন। পূর্ববর্তী সুলতানী অ মুঘল ধারার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে আঞ্চলিক অলঙ্করণকেও এই পারসিক ভাবধারার শাসকরা সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তাঁদের ধর্মীয়, স্মারক ও ধর্ম নিরপেক্ষ স্থাপত্য গুলির জন্য। ভারতবর্ষের বহু ধারার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই মুর্শিদাবাদের স্থাপত্য রীতি।

সূত্র নির্দেশিকা

১. পি সি মজুমদার, দ্য মসনদ অফ মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ, ১৯০৫, পৃঃ ৭
২. অনিরুদ্ধ রায়, মধ্য যুগের ভারতীয় শহর, কলকাতা, ১৯৯৯ , পৃঃ ৩৫২
৩. মনমোহন চক্রবর্তী, নোটস অন দ্য জিওগ্রাফি অফ ওল্ড বেঙ্গল', জারনি অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, জুলাই, ১৯০৯ , পৃঃ ২৩৩
৪. গুলাম হুসেইন সেলিম, রিয়াজ উস সালাতিন, ক্যালকাটা, ১৯০২, পৃঃ ২৮
৫. অনিরুদ্ধ রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৫
৬. জেমস ফোর্বস, ওরিয়েন্টাল মেমোয়ার্সঃ আ ন্যারেটিভ অফ সেভেন্টিন ইয়ার্স অফ রেসিডেন্টস ইন ইন্ডিয়া, ২য় খন্ড, লন্ডন, ১৮৩৪, পৃঃ ৪৪৯-৪৫১
৭. সুশীল চৌধুরী, 'ফ্রম প্রস্পারিটি টু ডিক্লাইনঃ এইটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল', নিউ দিল্লি, ১৯৯৬, পৃঃ ১১
৮. যদুনাথ সরকার, 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' , ২য় খন্ড, পাটনা, ১৯৭৭ পৃঃ ৪২২
৯. তদেব, পৃঃ ৪৩৪
১০. অনিরুদ্ধ রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৬
১১. তদেব,পৃঃ ৩৫৬
১২. ক্যাথরিন বি এশার, , 'ইন্ডেন্টরি অফ কি মনুমেন্টস' , দ্যা ইসলামিক হেরিটেজ অফ বেঙ্গল , জর্জ মিশেল এডিটেড, প্যারিস, ১৯৮৪, পৃঃ ৯১
১৩. এ এইচ দানি, মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল , ঢাকা, পৃঃ ২১০-১১
১৪. তদেব,পৃঃ ২১৪ -২১৫
১৫. তদেব
১৬. প্রভাত কুমার সাহা, মুর্শিদাবাদ জেলার মসজিদ (১৩ - ১৮ শতক) , কলকাতা,

২০০২,পৃঃ ৯৩ এই বইতে সুজাউদ্দিন মহম্মদ খানের প্রতিষ্ঠিত মসজিদটির তারিখ ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সাথে একদাস্থিত শিলালিপি অনুযায়ী সেই তারিখ আসলে ১৭৩১ খ্রিঃ)

১৭. ক্যাথরিন বি এশার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮

১৮. সংহিতা সেন, বেগম মস্ক অফ মুর্শিদাবাদ , জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, সংখ্যা ২০, ঢাকা, পৃঃ ২৪৩

১৯. চিন্ময় দত্ত, ক্যাটালগ অফ আরবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান ইনস্ক্রিপশন ইন দ্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃঃ ৪৩

২০. রোসি ল্যালিভান জোন্স, 'মুর্শিদাবাদ দ্য প্যালেসেস, রাজবাড়িস অ্যান্ড ম্যান্সনসঃ ফরগটন ক্যাপিটাল অফ বেঙ্গল' , মুম্বাই, ২০১৩, পৃঃ ৬১

পুস্তক পরিচয়

নদী, সমাজ এবং সংস্কৃতি: আসাম এবং বাংলার নদীগুলিতে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি ।

লেখক - রূপ কুমার বর্মন
প্রকাশক - প্রাইমাস বুক্স
প্রকাশকাল ২০২৩
পৃষ্ঠা xix + ৯৮। ৩৭৫ টাকা ।

সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস চর্চায় পরিবেশের প্রভাব একটি নতুন অধ্যায়। বর্তমানে যখন আমাদের সচেতনতার অভাবে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তখন মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে বহুমাত্রিক ও জটিল সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা একটি সময়োপযোগী বিষয়। পৃথিবীর পরিবেশের এই দীর্ঘ রূপান্তর এবং তার ফলে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানুষের মানিয়ে নেওয়া সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বদলের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তাই অতীত সম্পর্কে জানার এই পদ্ধতিটা একেবারেই নবতম উদ্ভাবন যেখানে ইতিহাস রচনার ওপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ এবং তা থেকে কোন সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষতঃ ভারতের উত্তরবঙ্গ, আসাম, ভুটান ও বাংলাদেশের নদী অববাহিকাগুলির বৈচিত্রময় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, জনসংখ্যার পরিবর্তন ও পরিযায়ী চরিত্রের ওপর কি ঐতিহাসিক প্রভাব রয়েছে তার ওপর একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ হল রূপকুমার বর্মণের এই বইটি। প্রাইমাস বুকস থেকে এবছর প্রকাশিত "নদী, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিঃ আসাম ও বাংলার নদীগুলির পরিবেশ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ"(River, Society and Culture: Environmental Perspectives on the Rivers of Assam and Bengal) বইটিতে অধ্যাপক বর্মণ তিতাস, তিস্তা, কলহি এবং রায়ডাক নদীগুলির অববাহিকা নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন।

ঐ অববাহিকার মানবগোষ্ঠীগুলির ওপর নদী ও তার উপনদী বা শাখানদী কি পরিবর্তন করতে পেরেছিল সেটিই এই প্রবন্ধটির উপপাদ্য। এছাড়াও নদীর গতিপথ ও অন্যান্য পরিবর্তনের ফলে বন্যা, ভূমিক্ষয় ও পলি জমে নদীখাত ভরাট হওয়ার মত অবস্থা হলে মানুষ যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাদের বাসস্থান ও জীবিকা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল এবং তার ফলে ভূমি অধিকার ও বণ্টনের সমস্যায় ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসী ও বাইরে থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এবং যেটা পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতাবাদের রূপ নিয়েছে এবং বিশেষ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক দাবীদাওয়া ও অধিকারের জন্ম দিয়েছে এবং নদীকে কেন্দ্র করে এধরণের নানা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সৃষ্টি হয়েছে, সেটিও এই প্রবন্ধের আলোচনার একটি কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং পরিবেশ ব্যতিরেকে যে মানবসভ্যতার আঞ্চলিক, রাজনৈতিক,

সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখা যায় না এবং নদী অববাহিকার প্রভাব যে ইতিহাস চর্চায় প্রাসঙ্গিক হওয়া একান্ত জরুরী এবং কোন অঞ্চলের ইতিহাস সম্যকভাবে বুঝতে গেলে ঐ অঞ্চলের নদী ও তার অববাহিকার ভূমিকা যে অন্যতম একটি বিষয়, সেটাই এই প্রবন্ধটি আলোকপাত করতে চেয়েছে।

প্রথাগত ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি অতিক্রম করেও এই প্রবন্ধগুলি আসাম ও বাংলার লোকসাহিত্যের সাহায্য নিয়েছে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে। যে লোকসাহিত্য এই অঞ্চলের মানুষ ও নদনদী ও তার অববাহিকার প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয়েছে। সম্পর্কিত বিষয়ের অর্থাৎ সাহিত্য ও ইতিহাসের যোগসূত্র ছাড়াও অধ্যাপক বর্মণ তার পুরানো কাজের সাহায্যও নিয়েছেন, তার ঐস্থানগুলিতে গিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাও তিনি প্রবন্ধগুলি রচনায় ব্যবহার করেছেন। তিনটি প্রবন্ধগুচ্ছের মধ্যে প্রথম দুটি অধ্যায়ে তিনি অসমীয়া বা বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিত যুক্ত করেছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর অনুপ্রেরণায় তিনি প্রথম অধ্যায় লিখেছেন। উপন্যাসটিতে মালো উপজাতিদের জীবিকা, তাদের মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের জীবনধারণের ওপর নদীর প্রভাব তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে বাঙ্গালী সাহিত্যিক দেবেশ রায় ও অসমীয়া সাহিত্যিক জিতেন্দ্র দাসের দুটি উপন্যাস তাঁকে অনুপ্রণিত করেছে। দুটি উপন্যাসেই ভূমি থেকে উচ্ছেদের ফলে পরিযায়ী জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে এবং তার ফলে রাজনৈতিকভাবে জমি বাঁচাও আন্দোলনের কি করে সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যাপক বর্মণ দেখাতে চেয়েছেন তিস্তা ও কলহি নদী অববাহিকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাধীন ভারতের অন্যান্য স্থানে একইরকম রাজনীতির আবহ তৈরী করেছিল। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের গল্প বলেছেন দেবেশ রায় তাঁর 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে। আর বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসের গল্প বলেছেন জিতেন্দ্র দাস তাঁর 'কলহি নদীঃ ইকুল হিকুল' উপন্যাসে। এভাবেই অধ্যাপক বর্মণ প্রথম দুটি অধ্যায়ে আন্তঃবিষয়ক অধ্যয়ন পদ্ধতির পাশাপাশি আদিবাসী জাতিসত্ত্বার উদ্ভবেরও তত্ত্ব সাজিয়েছেন জনজাতির স্থানান্তরণ, পরিবেশের বিবর্তন এবং তার উন্নয়নের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। সুতরাং, বলাই বাহুল্য, ইতিহাসের প্রথাগত চর্চার সীমারেখা অতিক্রম করে তাঁর এই প্রবন্ধগুলি মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের গবেষণার নতুন পথের সন্ধান দেবে।

তিস্তা নদীর উপর নির্ভরশীল মালো জেলে আদিবাসীদের সমস্যা নিয়ে প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা। অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসটি পড়লে বোঝা যায় মালো জনগোষ্ঠীদের নদীর সঙ্গে যোগসূত্রটি। শুধুমাত্র তিতাস নদীতে মৎস্যশিকারের মাধ্যমে জীবনধারণই নয়, উপন্যাসটিতে রয়েছে ঐ গোষ্ঠীর মধ্যেই সামাজিক বিভেদ যা মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল। অধ্যাপক বর্মণ দেখিয়েছেন বিংশ শতকে ঔপনিবেশিক বঙ্গভূমিতে মালোদের নদীর সঙ্গে জীবিকার যোগসূত্র ছাড়াও উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজে 'ক্ষত্রিয়' হিসাবে স্থান পাওয়ার জন্য তাদের একতা এবং জাতিসত্ত্বার আত্মাভিমানে তাদের স্থান পরিবর্তনের প্রবণতা। তিতাস নদীর যোগসূত্র ছাড়া এই মালো সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস তাই অসম্পূর্ণ। এটাই প্রথম অধ্যায়ের উপজীব্য।
জাতিসত্ত্বা এবং আঞ্চলিকতাবাদের আরও একটি দিক দ্বিতীয় অধ্যায়ে উন্মোচিত হয়েছে।

দেবেশ রায় ও জিতেন্দ্র দাসের লেখা থেকে প্রবন্ধকার দেখিয়েছেন যে পরিযায়ী মানুষদের জন্য সম্পদের অধিকারের প্রতিযোগিতার ফলে কি হয়েছে, বিশেষতঃ জমির অধিকার নিয়ে লড়াইয়ের ফল। প্রথম অধ্যায়ে যেখানে আমরা দেখেছি পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তনের ফলে মানুষ তার স্থান মানুষ তার স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে, সেখানে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই এই স্থানান্তরের ফলে পরিবেশের কি পরিবর্তন ঘটেছে, যেটা হয়ত পরিবেশগত কারণে হত না। স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও পরম্পরার অস্থিরতার একটা মূল কারণ হল জমি সংক্রান্ত বিবাদ এবং স্থানীয় ও স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জমির বণ্টন সংক্রান্ত সঠিক নীতির অভাব। দেবেশ রায়ের এবং জিতেন্দ্র দাসের উপন্যাস দুটিতে লক্ষ্য করার বিষয় হল, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বহিরাগতদের বিবাদের প্রেক্ষাপট হচ্ছে তিস্তা ও কলহি নদী দুটির অববাহিকা। দেবেশ রায়ের উপন্যাসে দেখা যায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনজাতি কিভাবে তিনদফার জমি বণ্টন নীতি এবং বহিরাগতদের চাপে জমির মালিকানা হারিয়ে ফেলল। পরবর্তীকালে রাজবংশীরা তাদের স্বকীয়তা আন্দোলন জমির ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছিল। একইভাবে জিতেন্দ্র দাসের উপন্যাসেও সত্তরের দশকের আসাম আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই স্থানীয় ও বহিরাগতদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং অর্থনৈতিক কারণে দ্বন্দ্ব কিভাবে রূপ নিয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা রায়ডাক নদী যেটি ভারত ছাড়াও অন্য দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে, তার দুইপারে কিভাবে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তার কথা শুনতে পাই। রায়ডাক নদী ভুটানে ওয়াংচু নামে প্রবাহিত। অধ্যাপক বর্মন দেখিয়েছেন, এই রায়ডাক নদী ভুটানের অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, বিশেষতঃ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং নদীতে বয়ে আনা পাথর এবং ডলোমাইট দ্বারা সিমেণ্ট শিল্পের প্রসার ও বাংলাদেশে সিমেণ্টের রপ্তানির ফলে বিদেশীমুদ্রা অর্জনে নদীর ভূমিকা। ভুটানের ধর্মীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠাতেও ওয়াংচু নদীর গুরুত্ব অনেক এবং অধ্যাপক বর্মণ উল্লেখ করেছেন ভুটানের জাতীয়তাবাদ ও তার সংস্কৃতি প্রসারে নদীটির ভূমিকা। ভারতে আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রবেশের পর ওয়াংচু নদী নাম পরিবর্তন করে হয়ে যায় রায়ডাক এবং নদীটি আরও দুটি শাখানদীতে ভাগ হয়ে যায়। ঐ দুটি শাখানদী সম্পর্কে অধ্যাপক বর্মণ গবেষণা করেছেন এবং ঔপনিবেশিক পূর্ব সময়ের তথ্যও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর লেখা থেকে রায়ডাক অববাহিকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। উনবিংশ শতকে চা শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা, শ্রীমন্ত শংকরদেব-এর বৈষ্ণবধর্ম প্রসার এবং ভাষা ও ধর্মের বৈচিত্র কিভাবে রায়ডাক নদীর অববাহিকাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে তার একটা বিস্তৃত বিবরণ তাঁর লেখায় রয়েছে।
প্রবন্ধের তিনটি অধ্যায়ই নদী অববাহিকা কিভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে তার একটা রূপরেখা বর্ণনা করেছে। প্রশ্নাতীত ভাবেই প্রবন্ধটির যে লক্ষ্য ইতিহাসের সঙ্গে কোন অঞ্চলের পরিবেশের যোগসূত্র, তা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অধ্যাপক বর্মণের গবেষণাপত্রের যে আকর্ষণীয় বিষয় তা হল ভারতীয় ভূখণ্ডের পরিবেশগত বৈচিত্রের ফলে ইতিহাসের চর্চায় পরিবেশের প্রভাব একটা উল্লেখযোগ্য গবেষণার দৃকপাত করতে পারে। এবং তার ফলে ভারতীয়

ইতিহাস রচনায় নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে। রঞ্জন চক্রবর্তীর অর্থপূর্ণ এবং সঠিক মুখবন্ধটি প্রবন্ধ সংকলনটিকে আকর্ষণীয় করেছে। মহুয়া সরকার, অনুরাধা রায় এবং নুপুর দাশগুপ্তের প্রবন্ধগুলিও ঐ সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

সংকলনটির নাম - "প্রকৃতির সঙ্গে পুনর্মিলনের নব ইতিহাস"।

ঋতপ্রতিম মুখার্জী